নিজস্ব রমণী

আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৩৯

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫১ বামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯ হইতে আর. রায় কর্তৃক মুদ্রিত

নিজস্ব রমণী

স্বচায়ার করার পরও যে মহিম হালদার এই পচা পটলডাঙ্গার মেসে পড়ে থাকবেন, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কেউ ভাবতেই পারেনি। বোধহয় স্বপ্নেও না।

মেস ম্যানেজার সতীশ ঘোষ অবাক হয়ে বলল, আবার সামনের মাসের 'অ্যাড-ভান্স' দিচ্ছেন?

মহিম হালদার বললেন, কেন এতে আপনার কোন অসুবিধে আছে?

সতীশ ঘোষ তার এই চিরদিনই খদ্দেরের এই সূক্ষ্ম উষ্মায় তদ্‌ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, সে কী, সে কী। অসুবিধের কথা আসছে কোথা থেকে? শুধু বলছিলুম যে, এখন তো আপনার মুক্তিস্নান হয়ে গেল, এরপর আর মেসের ভাত খেতে যাবেন কী দুঃখে?

মহিম হালদার বললেন, 'খেতে যাচ্ছি' কেন? খেতে থাকছি। ব্যাপারটা তো এই। তো আপনার এখানে, খুব দুঃখেই খাচ্ছিলাম, এমন কথা বলেছি কোনদিন?

সতীশ ঘোষের এই 'পটলডাঙ্গা নবদুর্গা মেস'-এর আজীবন সদস্য এই মহিম হালদারটির মেজাজ বরাবরই রাজকীয় এবং বাক্‌ভঙ্গী অনেক সময়ই বেশ নাটকীয়। কোন্ কথায় যে কোন্ উত্তর মিলতে পারে, সেটা বোঝা শক্ত।

তবে লোকটার ওই রাজকীয় মেজাজের জন্যেই রীতিমত সমীহ সম্ভ্রম করে চলে সতীশ ঘোষ।

অন্য অনেক মেম্বারের মত দেয় টাকাটা 'দিচ্ছি দেব' করে দেরী করা, অথবা 'এবারে হাতটা একটু টাইট যাচ্ছে' বলে বাকিটাকি রাখা, মহিম হালদারের ধাতে নেই।

প্রথম চাকরিতে ঢুকেই প্রথম এই 'নবদুর্গা মেসে' এসে ভর্তি হয়েছিলেন মহিম, আর এখন চাকরিতে অবসর নিলেন, টানা কাটিয়ে গেলেন। 'গেলেন' বলা চলে না আর, বলা যায় কাটিয়ে এলেন।

এই দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে কেউ কোনদিন মহিমকে খাওয়া নিয়ে খুঁতখুঁত করতে বা বিরূপ সমালোচনা করতে শোনেনি, সতীশকে 'ঘুঘু' 'ঘোড়েল' 'পয়সা পিশাচ' ইত্যাদি সুললিত বিশেষণে ভূষিত করতেও শোনেনি। কোন ব্যাপারে কোন অভিযোগ বা আবেদন মহিম হালদারের কাছ থেকে এসেছে, একথা সতীশ ঘোষ তো দূরের কথা, তার বাবা শিরিষ ঘোষও কোনদিন বলতে পারেনি।

এখন অবশ্য শিরিষ ঘোষ বলা-কওয়ার ঊর্ধ্বে চলে গেছে। বাপের খিদমদগার 'সহকারী ম্যানেজার' সতীশ সর্বেসর্বা হয়েছে, এবং বাপের ব্যবসাটা বেশ কব্জা করেই ফেলেছে। অতএব অনেক দুর্মুখ বোর্ডারের কাছ থেকে অনেক সব ভাল ভাল বিশেষণও লাভ করেছে। তাতে অবশ্য সতীশ ঘোষ বিচলিত হয় না। বিচলিত হয় শুধু তার এই রাজাই মেজাজের বোর্ডারের এই রকম নাটকীয় ভঙ্গীর কথাবার্তায়। তা সে ভঙ্গীতে যে ব্যঙ্গের হুল থাকে না তা নয়, কিন্তু সেটা এত সূক্ষ্ম যে সহজে ধরা-ছোঁওয়া যায় না!

এই নবদুর্গা মেসের সবচেয়ে ভাল ঘরখানি চিরকাল দখল করে রেখেছেন এবং থেকেছেন মহিম, আর সেই থাকাটা নিজের রুচি-পছন্দ অনুযায়ী। দক্ষিণে এক চিলতে বারান্দাদার ঘরটাকে মহিম বছরে দু'বার হোয়াইট ওয়াশ করান, বছরে এক-বার জানলায়-দরজায় রং দেওয়ান। সবই নিজের খরচে, তবু সতীশ ঘোষের অনু-মতি নেওয়াটি চাই—'আপনার কোন আপত্তি নেই তো ঘোষমশাই? থাকে তো বলুন।'

সতীশ মরমে মরে বলে, সে কী! সে কী! আপনি নিজে ব্যয়ভার বহন করছেন, আমার 'কীসে'র আপত্তি থাকতে পারে?

তা হোক, বাড়ি আপনার। এর দেওয়ালে একটা পেরেক পুঁতলেও আপনার অনুমতি নেওয়া উচিত। আর মিস্ত্রী ঢোকানো? সে তো অনুমতি ছাড়া বেআইনী।

মহিম হালদারের ধবধবে ঘর, তাঁর ফিটফাট সাজসজ্জা, নবদুর্গার আর বাসিন্দা-দের রীতিমত গায়ে জ্বালা ধরায়। কিন্তু বলার কিছু নেই।

বড়জোর তলে তলে কুটুস কামড় বলা যায়। আপনার বাড়িতে উনি ইচ্ছেমত কারুকার্য ফলান, এতে আপনার এমন ঢালাও সায় থাকা উচিত নয় সতীশবাবু। এটা একটা ব্যাড এক্সজাম্পল সৃষ্টি করে।

সতীশবাবুও উল্টো কুটুস দেন। ঠিক আছে, আপনারাও করুন না কারুকার্য। সকলের ওপরই আমার ঢালাও সায় দেওয়া থাকল।

এই সতীশ ঘোষই কিন্তু ওই দীর্ঘোন্নত চেহারা, উজ্জ্বল গৌর বর্ণের (শরীর চর্চার বহরে বোধহয় আরো গৌর।) মানুষটার সামনে দাঁড়ালেই যেন বাসি মুড়ির মত মিইয়ে যায়। কেন যায়, সেটাই রহস্য!

মিয়োনো মুডি সতীশ ঘোষ অন্যভাবে উজ্জীবিত হয়ে বলে ওঠে, এ কী বলছেন দাদা! আপনার মত এমন 'নিরুপদ্রব' সোনার বোর্ডার এই 'নবদুর্গা'র জীবনকালে আর থেকেছে না কি? যেদিন যেমন পেরেছি, দিয়েছি, সোনা হেন মুখ করে

খেয়েছেন। কখনো কোনও কমপ্লেন—

ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে অ্যাডভান্সটা নিতে আপত্তি নেই আপনার?

সতীশ ঘোষ আর কথা না বাড়িয়ে জিভ কাটল। ওতেই সব প্রকাশ।

আচ্ছা! রসিদটা বটুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন কোন একসময়। তাড়া কিছু নেই। শনিবার দুপুর পর্যন্ত তো আছি।

তার মানে যথারীতি শনিবারের লাঞ্চটা সেরেই ট্রেন ধরতে যাবেন মহিম হালদার।

সতীশ আর কোন কথা ভেবে না পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠল। পরে কেন, এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তাড়ার কিছু ছিল না—

মহিম চলে যেতে গিয়ে একটু দাঁড়ালেন। বললেন, আপনি বোধহয় একটু হতাশ হলেন।

হতাশ!

কী বাবদ!

মাথা গুলিয়ে গেল সতীশ ঘোষের

অবাক হয়ে বলল, মানে?

মানে, এই হালদার বুড়ো বিদায় হলে, ঘরটা আপনি বেশী দামে তুলতে পারতেন। নবদুর্গার সেরা ঘর ওটা।

আঃ ছি ছি! এ আপনি কী বলছেন!

বলছি ঠিকই। ইতিমধ্যেই তলে তলে কেউ অফার দিয়েও থাকতে পারে—

সতীশ ঘোষের বুকটা হিম হয়ে যায়। লোকটা অন্তর্যামী না কি!

কিন্তু মুখে মরমে মরে ব্যাকুল গলায় বলল, আপনার স্যার মুখের কিছু আটঘাট নেই।

খুব বিচলিত অবস্থায় সতীশ ঘোষ 'স্যার' বলে ফেলে।

মহিম তাঁর গিলে-করা চুড়িদার পাঞ্জাবির পকেট থেকে ফর্সা রুমাল বার করে ঘাড়টা একটু মুছে নিয়ে বললেন, এর মধ্যে আটঘাটের কিছু নেই। এটাই তো স্বাভাবিক। মহিম হালদার ব্যাটার রিটায়ারের আশায় কেউ কেউ যে ওত পেতে বসে ছিল না, এ তো হতে পারে না। আর থাকাই স্বাভাবিক। ঘরটা ভাল। আপনার সেরা ঘর। তা যাক, কী আর করা যাবে। আমি হচ্ছি—লাইফ মেম্বার। আপনার বাবার আমলের খাতা-পত্তর দেখতে পারেন। ঘরটা দেখেই আমার পছন্দ

হয়ে গিয়েছিল, বলেছিলাম আমায় লাইফ মেম্বার করে নিন। অর্থাৎ আমি স্বেচ্ছায় চলে না গেলে আমায় তাড়াতে পারেন না। তার জন্যে অবশ্য একস্ট্রা কিছু খসেও ছিল।

সতীশ ঘোষের বোধহয় তার বাবার গোঁফ জোড়াটা স্মরণে এল। মরিয়া হয়ে বলে উঠল, বাবা রাজী হলো?

এককথায় হননি অবশ্য। বেশ স্ট্রেট ফরোয়ার্ড লোক ছিলেন তো। বললেন, আপনার এই ইয়ং বয়েস, এমন রাজপুত্তুর হেন চেহারা, মতিগতি কী রকম হবে না বুঝে প্রমিস করি কা করে?

হ্যাঁ, কথাটা বলেছিল শিরিষ ঘোষ। তা তার আর ভয়টয় কী? সে হলো গিয়ে একটা ঝুনো ব্যবসাদার, মৃতা মায়ের নামে মেস খুলে কম দিন তো চালাচ্ছে না। আর মহিম হালদার তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছে, বিয়ে-থা হয়নি, বাইশ বছর মাত্র বয়েস!

কিন্তু ওই বাইশ বছরই বাহান্নকে থতমত খাইয়ে দিয়েছিল। বলে উঠেছিল, আপনার এখানে ঝি থাকে? বাঙালী ঝি?

ঝি!

হ্যাঁ। ঝি। সুন্দরী, কমবয়সী, যাদের জন্যে মতিগতি বিগড়োতে পারার ভয়।

শিরিষ ঘোষ দুই কানে হাত দিয়ে বলে উঠেছিল, আমার এখানে ওসব ব্যাপার নেই-টেই। মেয়েছেলের পাটই নেই।

তবে তো হয়েই গেল। চিন্তার কিছু নেই।

বলে ঘরের চাবিটা নিয়ে দোতলায় উঠে এসেছিল সদ্য যুবক মাহম হালদার।

এত কথা অবশ্য এখন আর বললেন না মহিম, শুধু বললেন, তারপরেই অবশ্য রাজী হয়ে গেছলেন।

সতীশ ঘোষ মনে মনে বললে, আমার মাথা কিনেছিলেন। আমাকেও অতএব হোল লাইফ গরুচোরের ভূমিকায় কাটাতে হবে। বাপের কালে শুনিনি রিটায়ার করে কেউ মেসবাড়িতে পড়ে থাকে। কপাল আমার। তবে সুবিধে যে কিছু নেই তা নয়। এই ভাঙা পুরনো বাড়ির বারো মাস সকল যন্তরপাতি ফুটোফাটা হচ্ছে, তুমি তা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান না করে নিজেই প্লাম্বার ডেকে এনে সারিয়ে নিচ্ছ, পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছ, দিতে গেলে, ঠিক আছে ঠিক আছে করে উড়িয়ে দিচ্ছ, জমাদার এলে তুমি নিত্যদিন তাকে ভীম, ব্লিচিং পাউডার, সানি ফ্রেশ সাপ্লাই করছ, সে কথা দিয়ে গাওনা-বাজনা করছ না, (অন্যরা দৈবাৎ একদিন করলেও গাওনা বাজনা করে।)

এতে অবিশ্যিই আমার সাশ্রয় হচ্ছে, তবে ওই। সর্বদাই কেমন নিজেকে মালিকের নীচে অধস্তন কর্মচারীর মত লাগে।

মুখে একটু দাঁত দেখিয়ে বলল, তবে তো কথাই নেই। আমিও রইলুম, 'নবদুর্গা'ও রইল, আপনিও রইলেন। চা-টা তাহলে পাঠিয়ে দিই স্যার।

দেবেন? তা দিন।

বলে বাহান্ন ইঞ্চি ধুতির কোঁচা লুটিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

এটাই মহিমের সাধারণ সাজ।

বাহান্ন ইঞ্চি কাঁচি ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, চুলে এখনো রাতিমত কেয়ারি। বাড়িতে সর্বদা হাওয়াই চটি, অফিসে 'নিউকাট'। অফিস বেরিয়ে যান, সিঁড়ির বাতাস সেন্টের গন্ধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে।

অন্যরা যারা মেসে থাকে, তারা অবশ্য কেউই এর ধারেকাছে যায় না। তাই ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে দেখে, লোকটা চৌকাঠ পার হলে ব্যঙ্গ মন্তব্য করে, অফিস যাচ্ছে, না, নতুন জামাই জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে বোঝা দায়। বয়েস তো কম হলো না। ওদিকে তো শুনি একঘর ছেলেপুলে, জাঁদরেল গিন্নী—

হবে। এরপর যখন ওই জাঁদরেল গিন্নীটির কবলে গিয়ে পড়তে হবে, তখন এত বাবুয়ানা বেরিয়ে যাবে। আসছে তো সেদিন।

'এরপর' মানে রিটায়ারের পর। সেই আশাতেই দিন গুণছিল সবাই। কেন গুণবে না? কে চায় অপরের কাছে ছোট হয়ে থাকতে? মহিম হালদার লোকটা যে তেড়েফুঁড়ে এসে কাউকে 'ছোট' করছে তা নয়, তবু ছোট হওয়া। আসলে লোকটা যেন সর্বদাই অনেকখানি উঁচু দিয়ে হাঁটে। তাহলে? যারা নীচের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, তারা ভুগবে হীনমন্যতায়।

এ থেকে উদ্ধার পাবার আশায় দিন গুণছিল ওরা। শশাঙ্ক বোস, মুরারি মুস্তফী, সুদাম জানা, নীলরতন পাড়ুই, নিশিকান্ত ঘোষাল।

এবং ঘরটা নিয়ে কালনেমির লঙ্কা ভাগ চলছিল।

ঘরটি যেমন সর্বোত্তম, রেটটিও তাই। সমস্যা ওইখানেই। এরা সকলেই প্রায় এক পয়সায় মরে বাঁচে।

মহিমের চালচলন দেখে দেখে নিমপাতার পাঁচন গেলা গলায় বলে, নবাবী! লাটসাহেবী! বড়মানুষী! আর রিটায়ার করার পর গিন্নীর হাতে কী হাল হবে, কল্পনায় সে ছবি দেখে হাসাহাসি করে।

'চিরকাল আমার হাত পিছলে পালিয়ে বেড়িয়েছ মানিক, এবার এসো!

জোয়ালে জোতো নিজেকে।'

কথায়বার্তায় মনে হয় গিন্নীটি বেশ দজ্জাল, এত নপ্‌চপ্‌ সহ্য করবে ?

এই হাস্যপরিহাস এবং নিমের পাঁচনের অন্তরালে তলে তলে জোট বেঁধেছে মুরারি মুস্তফী আর নিশিকান্ত ঘোষাল। ঘরখানা তারা দু'জনে থাকবে শেয়ার করে। বাড়তি ভাড়াটা গায়ে লাগবে না।

বুড়ো মস্তান ওনার আসবাবপত্র সরিয়ে নিয়ে গেলেই, ঘরে দু'খানা সরু চৌকী পাতার মত জায়গা যথেষ্ট হবে। আসবাবপত্র তো ভালই জমিয়েছেন বাবু। ছত্রি দেওয়া খাট, নীচের দিকে জুতোর দেরাজ সমেত আলনা, বেতের চেয়ার টেবিল. স্টীলের বুক-র‍্যাক, ক্যাম্বিসের ইজি-চেয়ার। তাছাড়া টেবিলফ্যান, টেবিলল্যাম্প, আর হারমোনিয়ম এবং বেহালা।

কম জায়গা জুড়েছে এতো সবে ?

উঠিয়ে নিয়ে গেলেই অগাধ জায়গা। মনে মনেই ঘরটাকে সাফ করে ফেলে. নিজেদের জিনিসপত্র সাজাচ্ছিল মুরারি আর নিশিকান্ত। হঠাৎ বিনা মেঘে বাজ।

ঘরটা ছাড়বে না মহিম হালদার। 'চিরকাল' এই 'নবদুর্গা মেসে'ই থাকবে। এর থেকে অসহনীয় আর অবাস্তব ঘটনা আর কী থাকতে পারে ?

রাগে ফুঁসছে দু'জন। মানে কী এর ?

অথচ মুশকিল এই—লোকটার নামে কোনভাবেই কালি ছিটানো যায় না। গেলে বরং এই অপরের সুখের হন্তারককারী বদ মতলবটার বিরুদ্ধে একটা জেহাদই ঘোষণা করা যেত। কিন্তু কোনদিক থেকেই তো কিছু বলার নেই।

কলকাতায় গেড়ে বসে থাকার একটা মাত্রই উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব হতে পারতো, যদি এখানে লোকটার একটা 'ডুপ্লিকেট' সংসার আবিষ্কার করা যেত। কিন্তু কোথায় কী ? নিত্য নিয়মে সকালে কিঞ্চিৎ বেলায় উঠে ব্যায়াম শুরু করেন মহিম। ঘড়ির কাঁটা ধরে তা শেষ করে চা খান। চায়ের আগে সতীশ ঘোষের দাক্ষিণ্যের দানের ওপর একটি ডিম সেদ্ধ ও দুটি কলা খান নিজের পয়সায় এবং খানিকটা ছোলাভিজে আর আদারকুচি।

ব্যস, একটু পরেই নেমে পড়েন নীচের তলায় উঠোনের ধারে রোয়াকে, সর্ষের তেলের শিশিটি নিয়ে। এই তেল না কি তাঁর 'স্পেশাল'। দেশের কোন ঘানি থেকে আনানো।

আধঘণ্টা ধরে 'সোনার অঙ্গ'টি আরো সোনার করে তুলতে সেই খাঁটি ঘানির তেলটি ডলে ডলে গায়ে মেখে চান করতে যান সাবান তোয়ালে নিয়ে।

আশ্চর্য ! সতীশ ঘোষের তদারকীতে এই সময়টা স্নানের ঘরটি খালি থাকবেই।

দৈবাৎ কোনদিন একটু দাঁড়াতে হলে রাগও নেই, মেজাজ দেখানোও নেই মহিমের। দালানের টুলে কাঁধে তোয়ালে ফেলে বসে থেকে ঝক্‌ঝকে দাঁতের পাটি বার করে হেসে হেসে বলবেন, নাঃ, আজ আর বোধহয় বীরেশ্বর বাবাজীর ভালমন্দ রান্নাটি কপালে নেই। এরপর চান করে আর কি খাবার সময় হবে ? ও ঠাকুর কী রান্না করেছ ? একটু শুনেই নিই।

হয়তো বা বেশ গলা ঝেড়ে বলেন, ঘ্রাণেন যদি 'অর্ধভোজন' তো শ্রবণে সিকি ভোজনও। কী বলেন ?

যেন কত কী অপূর্ব রান্নাই রাঁধছে ঠাকুর।

তবে এমন ঘটনা দৈবাৎই ঘটে। যে যতই রাগে জ্বলুক, সামনে একদম 'মাখন'। আর যতই হীনমন্যতায় ভুগুক, জোর করে তা থেকে মুক্ত হতেও পারে না। অবচেতনেই কেমন যেন তটস্থভাবে, এই সওয়া আটটা থেকে পৌনে ন'টা পর্যন্ত টাইমটা মহিম হালদারের জন্যে বাথরুমটা উৎসর্গ রাখে।

স্নান সেরে এসে গৌরকান্তি পিঠের ওপর ভিজে তোয়ালে চাপা দিয়ে টেবিলে এসে বসেন মহিম। টেবিল অবশ্যই 'নবদুর্গা মেসে'রই ঐতিহ্যবাহী।

শিরিষ ঘোষের আমলের প্রথম দিকে কেনা হয়েছিল একগোছা কুশাসন। মাটিতে বিছিয়ে বসে খেতে বসার পদ্ধতি। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল টেবিলের চাহিদা। ধুতি পরে অফিস যাওয়ার রীতিটা কমতে লাগল, বাড়ল প্যান্ট পরার প্রবণতা। সেই চাপে এই টানা লম্বা দু'খানা টেবিল আর খান ষোল লোহার চেয়ার।

মহিম হালদার নেহাৎ শীতকালটা বাদে ওই ভিজে তোয়ালে পিঠে জড়িয়েই খেতে বসেন। আর পাঁচজনে যখন রান্নার ব্যাখ্যানায় 'পঞ্চমুখ' হয়, তখন তিনি অম্লান বদনে বলেন, ঝোলটা খারাপ হয়েছে বলছেন ? কই বুঝতে পারছি না তো ! ভালই তো লাগছে। 'ডালের বাটির মধ্যে গামছা পরে নেমে যেতে হয় ?' হা-হা-হা। জানেনও বা আপনারা এত। ডাল তো একটু পাতলা টাইপের খাওয়াই ভাল। তাড়াতাড়ি পরিপাক হয়ে যায়।··· কী বলছেন ? মাছের পীস মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখতে হয় ? না মশাই, আপনারা একটু বেশী বলছেন। আমি তো এই সাদা চোখেই দেখতে পাচ্ছি। বাজার দরটা দিন দিন কোথায় উঠছে সে তো খবরের কাগজেই দেখছেন। কত ধানে কত চাল বোঝেন তো ?

'নবদুর্গা'য় দু'খানা কাগজ রাখেন সতীশ ঘোষ, একখানা বাংলা, একখানা ইংরিজি। মাসের শেষে তার দামটা চাপিয়ে দেন সমস্ত বোর্ডারের মধ্যে। কাজেই

সকলে মিলে কাগজ দু'খানাকে নিজ অধিকারবলে কাড়াকাড়ি করতে থাকেন। মহিম হালদার সেদিকে তাকিয়েও দেখেন না। তিনি নিজে একখানা কাগজ রাখেন, সেটা সকালে ভাঁজও খোলেন না, খোলেন একেবারে অফিস যাবার কালে বাসে চেপে। আর সেই বাবদই খুঁটিয়ে পড়ার সময় পান।

সতীশ ঘোষ এরকম ক্ষেত্রে মহিম হালদারের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করে, আর বামুন ঠাকুর বারেশ্বর তার প্রদেশগত পার্থক্য ত্যাগ করে নিখুঁত বাংলায় বলে, হ্যাঁ, এই নবদুর্গায় একজন মাত্র বুঝমান ব্যক্তি আছেন। বারেশ্বর কি রান্নার মত রান্না জানে না? কলকাতার পাকা হালুইকর বংশী ঠাকুর তার আপন মামা। কিন্তু মালমশলা যেমন রান্নাও তেমন। উচিতমত জিনিস পেলে দেখিয়ে দিত বারেশ্বর।

না না, রান্না কিছু খারাপ হয়নি। বলে মহিম হালদার সেই 'মেসজনোচিত' আহার বিনা অভিযোগে চেটেপুটে খেয়ে নিয়ে দোতলায় উঠে যান, মিনিট চল্লিশ পরে সাজসজ্জা সেরে নেমে এসে আরো পাঁচজনার সঙ্গে বাসে গিয়ে ওঠেন।

ফেরাও ঘড়ির কাঁটায়।

অফিস ফেরত কোথাও না, সোজা এই 'নবদুর্গা'য়।

আর কোথাও বেরোনোর নাম-গন্ধ নেই। এসে চা খেয়ে হয় ওঁর ওই সাধের বেহালাখানা নিয়ে পিঁড়িং পিঁড়িং করেন, নয়, হারমোনিয়ামটার ওপর খানিক আঙুল চালায়, আর নয়তো ওর সেই খাতাপত্তর, কাগজ, ডট পেন নিয়ে ঘাড় গুঁজে মাথা-মুণ্ডু কী ছাই লিখে যান।

কী লেখেন?

জিগ্যেস করলে হাসে।

আপনারাও যেমন। লিখি আবার কী। কিছু না।

তবে কাগজ-কলম নিয়ে করেনটা কা?

হাতের লেখা পাকাই মশাই, বাংলা লেখা তো ভুলেই যাবার যোগাড় আমাদের!

ঘরটা দক্ষিণমুখো এবং দক্ষিণে একটা বারান্দা আছে বলে কেউ কেউ লোড-শেডিং-এর সময় গল্প করার ছলে একটু হাওয়া খেতে আসে। কিন্তু জুৎ পায় না। মোমবাতি জেলে লিখতে থাকে মহিম হালদার।

এই লোকের ঘাড়ে একখানা 'ডুপ্লিকেট' সংসার চাপিয়ে অপবাদ দেবার জুতটা কোথায়?

মোদো মাতাল বলবে?

সে গুড়েও বালি।

মেসে থাকার সুযোগে বা স্বাধীনতায় এখানে অল্পবিস্তর মদ্যপান করে থাকেন অনেকেই। বেহেড হবার মত নয়, কার বা কত পয়সা? কিন্তু মহিম হালদার ওর ছোঁয়াও মাড়ান না।

কখনো ও-প্রসঙ্গ উঠলে হেসে হেসে বলেন, লোকে যে কী করে শখ-সাধে ওই আগুনের শরবৎটা খায় মশাই বুঝি না। কম বয়েসে একবার শখ হয়েছিল, দেখি তো খেয়ে জিনিসটা কেমন। এত লোক যার জন্য পাগল। ওরে বাবা, খাওয়া-মাত্তর মনে হলো যেন গলা দিয়ে বুক দিয়ে আসোনক নামছে! ব্যস, ওইখানেই ইতি। এছাড়া সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি যাওয়া আছে নিয়মিত।

অটুট স্বাস্থ্য। নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। তো এই লোকের নামে কোন্ অপবাদ দিয়ে ওর এই নবদুর্গা মেসে গেড়ে বসে থাকবার মতলব আবিষ্কার করবে!

ক্যানসারের ভয়ে সিগারেট খায় না। দাঁত খারাপ হবার ভয়ে পান খায় না। নেশার ভেতর আশির মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখা। ওই দেখার জন্যে কবে যেন একখানা লম্বা আয়না কিনে এনে ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়েছে। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বলেই মনে হয়। দামী জিনিস।

ভেবে দেখলে মহিম হালদার নামের মানুষটা কারুর সাতে-পাঁচে নেই। নিজেকে নিয়েই মশগুল। কিন্তু সেটাই তো এই পাঁচজনের সমাজে সব থেকে অসঙ্গত। এ যেন সকলকে টেক্কা দিয়ে পিটের তাস তুলে নেওয়া।

পাঁচজনের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো তুমি, সাতজনের ঘরে উঁকি দিয়ে বেড়াও, তবে না বুঝি তুমি আমাদেরই একজন।

ধ্যান-জ্ঞান হচ্ছে ওই দেহটি।

ষাট বছরের কাছে পৌঁছতে যাচ্ছ তুমি, ভাবখানা যেন তাজা যুবক। ভগবান না হয় 'চেহারা'খানা দিয়েছেন একটু, তো তাতেই মত্ত থাকতে হবে?

তাসের আড্ডায় যোগ দিতে বল, অমনি হেসে গা পাতলা। ওসব তেমন আসে না মশাই। দাবাটা জানে স্বীকার করে, কিন্তু নীলরতনবাবুর শত ডাকাডাকিতেও গা ভেড়ায় না। বলে, 'বড্ড সময় খরচ যায় মশাই।'

বলি মেসবাড়িতে 'সময়' নিয়ে তুই করবিটা কী? আর এই যে রোজ একখানা করে বই পাল্টে আনছিস লাইব্রেরি থেকে, তাতে সময় যায় না? ছুতো। ছুতো। নাক-উঁচু লোক, পাঁচজনের সঙ্গে মিশবে না।

অবিরত এই বিরূপ সমালোচনার চাষ চালাতে চালাতে ক্রমেই সে ফসলের ভারে ভারী হয়ে ওঠে। হিসেব করে দেখা যায়, মহিম হালদারের মত এমন নাক-

উঁচু, আত্মসর্বস্ব, চেহারার অহঙ্কারে মটমট, দেবদ্বিজে ভক্তিহীন একটা লোক এই নবদুর্গায় আর দ্বিতীয় নেই। নিজের রূপ 'যৌবন' নিয়ে বিদেয় হচ্ছিল, বাঁচা যাচ্ছিল, এখন কিনা শত্রুতা করতে বসে থাকল।

খবরটা বাতাসে ভাসছিল, সতীশ ঘোষ পাকা খবর দিলো।

শেষমেশ একবার ভেবিকাই করতে এলো ক'জন। তার মধ্যে মুরারি আর নিশিকান্ত প্রধান।

কী মহিমবাবু? আপনার অবস্থা যে দেখছি সেই মেছুনীর আঁশচুপড়ির মত হচ্ছে।

সবে বেহালাটা তাক থেকে নামিয়েছিলেন মহিম, সেটাকে বিছানাব ওপর শুইয়ে রেখে মহিম অবাক হয়ে বললেন, 'আঁশচুপড়ি'। মানে?

হয়তো ওই মানেটা মহিমের একেবারে অজানা জগতের নয়। বাজারচলতি এই গল্পটা তিনি শুনে থাকবেন হয়তো কোন সময়। কিন্তু এখন মনটা ছিল অন্য সুরে বাঁধা। ওই আঁশচুপড়ি শব্দটা যেন ধাঁই করে এসে সেই সুরের ওপর লাগল।

নিশিকান্ত বলে উঠল, আহা জানেন না এ গল্প? এক মেছুনীব সঙ্গে রাজবাড়ির বাগানের মালিনীর ভাব। মালিনী একদিন মেছুনীকে নেমন্তন্ন করে বলল, সই আমার বাড়ি আজ তোমার নেমন্তন্ন, খাও শোও থাকো। রাজবাগানের মধ্যেই মালিনার বাড়ি। মেছনী তো দেখে মোহিত। বলে, সই মনে হচ্ছে যেন স্বর্গে এসেছি। কিন্তু হলে কি হবে, রাতে ভুরিভোজ খেয়ে শুয়েও ঘুম আর আসে না। উঠে বসে, নড়ে চড়ে। মালিনী বলল, কা হলো সই? ঘুম আসছে না? সই বলল, কা বলি সই, এই এতো এতো ফুলের গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করছে, গা পাক দিচ্ছে। আমার ছোট্ট ঘর, রাতে ঘুমুই, মাথার কাছে আশচুপড়িগুলো থাকে, পড়ি আর ঘুমোই।

অতঃপর রাস্তার ধারে রেখে দেওয়া আশচুপড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাথার কাছে রেখে তবে ঘুমিয়ে বাঁচে।

মহিম ভুরু কুঁচকোলেন, হঠাৎ এ-কাহিনী? তাৎপযটা কী?

অহো বুঝছেন না?

মুরারি বলে ওঠে, আপনারও ওই মেছুনার অবস্থা। এই অভাগা 'নবদুর্গা'র রান্নাঘরে খেয়ে খেয়ে এমন অব্যেস হয়ে গেছে যে, নিজের সংসারে কর্তার মান্য নিয়ে আরামে থাকার সুখটা মনে লাগছে না। এই পচা মেস বাড়িতেই পড়ে থাকতে সাধ যাচ্ছে।

অ !

মহিম বললেন, তাৎপর্যটা বুঝলাম। তা জগতে যখন এমন ঘটনা ঘটেই থাকে, তো আবার ঘটবে। আশ্চর্যের কিছু নেই। যাক ও নিয়ে আপনারা আর মাথা ঘামিয়ে সারা হবেন না। বেহালা শুনবেন ? বলে যন্ত্রটা আবার কাছে টেনে নেন।

অবাঞ্ছিতদের ভাগাবার এটা একটা মহৌষধ। মহিমের জানা। পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে।

সন্ধ্যাকালে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসা যায় না, সম্বলের মধ্যে দরজায় ঝোলানো মোটা পর্দাটা। কিন্তু পর্দা যতই মোটা হোক তাকে অনায়াসে ঠেলে সরিয়ে, হুট করে ঘরে ঢুকে পড়বার মত মোটা রুচির লোকের অভাব নেই সংসারে।

অতএব এই বেহালা শোনাবার অফার।

তা অফার পাওয়ামাত্রই একযোগে সবাই উঠে পড়ল। বলল, নাঃ, আপনি নিজ-মনে বাজান, ডিসটার্ব করব না।

আচ্ছা। নমস্কার। রয়েই যখন গেলাম আপনাদের সঙ্গে, এ সুযোগ পাবোই কোন সময়।

হুঁ।···চলে গেল সবাই।

পর্দাটা দুলতে লাগল অনেকক্ষণ।

ওরা যেতে যেতে থমকালো।

ওঃ ! ওই যে শুরু হয়ে গেছে বেড়াল কান্না ! আমার তো দাদা, মহিমবাবুর ওই ব্যায়লার সুর, স্রেফ বেড়াল কান্নার মত লাগে।

এই পরিবেশ মহিম হালদারের।

অথচ আশ্চর্য, আজীবন এখানেই টিকে আছেন। এবং এখনও 'বিশ্বসংসার'কে চমকিত করে এখানেই টিকে থাকবার সংকল্প ঘোষণা করেছেন।

মহিম হালদারের এই সিদ্ধান্তের খবরটা যখন তাঁর গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছল, মনে হল যেন সংসারের ওপর একটা বাজ পড়ল।

মেসের ঘর ছাড়েননি উনি, ছাড়বেনও না। যেমন ছিলেন এবং যেমন পদ্ধতিতে

চালাচ্ছিলেন, তেমনি থাকবেন আর তেমনি চালাবেন।

প্রথমটা বিশ্বাস করেনি দেবযানী, ভেবেছিল ইয়ারমার্কা ননদাইটির এ এক ঘোরালো ঠাট্টা। তাই তাকে বলেছিল, শুনে বাঁচলাম ভাই। বিয়াটার বুড়ো মানেই তো হাড়জ্বালানে। ও মেসে থাকাই মঙ্গল! নাও, এখন চা খাও। সুখবর এনেছো, দু'কাপ পাবে।

কিন্তু স্বদেশরঞ্জন তাতে হেসে ফেলল না। বরং মুখ খুব বিষণ্ণ করেই বলল, বড়-বৌদি, আমার কথা বিশ্বাস করলেন না? কথাটা কিন্তু সত্যিই। নিজেই বড়দা বলেছেন আমাকে।

বলবার সুযোগ আছে। মহিমের অফিসেই কাজ করে স্বদেশ। অথবা বলতে পারা যায় ছোট ভগ্নিপতিটিকে নিজের অফিসে একটা চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন মহিম।

তা মহিমকে অবশ্য 'বড়দা' বলে খুব সমীহ করে স্বদেশ। তবে প্রায় সমবয়সী দেবযানীর সঙ্গে কথা বলতে, 'শালাজ' সম্পর্কের সুযোগটি না নিয়ে ছাড়ে না। বিশেষ করে মহিম হালদারের এই চিরকাল মেসে পড়ে থাকা নিয়ে তার যত বাক্‌চাতুরী। বলে, লোকে বলবে 'পড়ে থাকা'। আমি তো বলি 'বসবাস'! দিব্যি ঘরদোর সাজিয়ে-গুছিয়ে বাস করছেন। আরও বলে, বড়দার আমাদের নববিবাহিতের রোলটা আর সারাজীবনে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না বড়বৌদি। কী বলেন? আহা আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে, ফুল কোঁচা লুটিয়ে, রুমালে সেন্ট লাগিয়ে শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসা—তার রোমান্সই আলাদা! আর নিজের বাড়িতে হপ্তায় দেড়দিন জামাই আদর! আহা!

দেবযানীর কি বুড়ো বয়েস পর্যন্ত এই ঠাট্টাতামাশা ভাল লাগে? ভেতরে ভেতরে একটা অপমানের জ্বালা ধরে না? হাড় জ্বলে যায় না? কখনো কখনো এমনও মনে হয়, লোকটা তাকে অপমান অপদস্থ করবার জন্য কেবলই এ প্রসঙ্গ তোলে।

কিন্তু সব সময় তা মনে হয় না অবশ্য। দেখে লোকটা ঠিক সে প্যাটার্নের নয়, এমনিই বেশী হালকা বেশী আড্ডাবাজ আর ছ্যাবলা।

তা আর কেউ হলে তাকে সব সময় ছ্যাবলামি করতে অবশ্যই প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব হত না, হয়তো দরজা দেখিয়েই দেওয়া হতো। কিন্তু ননদাই বলে কথা। গেরস্থ ঘরে মেয়েদের জীবনে এইসব সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার দায় যে কী দায়, তা ভুক্তভোগীরাই জানে।

অফিসে অবশ্য স্বদেশের মহিমের সঙ্গে সর্বদা দেখা হয় না, ডিপার্টমেন্ট আলাদা।

আর স্বদেশরঞ্জনের রীতিনীতিও সেখানে আলাদা। সাধ্যপক্ষে গায়ে পড়ে মহিমের কাছাকাছি হতে চেষ্টা করে না। কেউ কেউ যদি প্রশ্ন করে মহিমবাবু আপনার কিরকম যেন আত্মীয় হন শুনলাম। স্বদেশ হেসে বলে, তা ঠিকই শুনেছেন। পরমাত্মীয়ই। এর বেশী ভাঙে না।

গায়ে পড়তে আসে না, এই ভব্যতাটুকুকে মহিম বেশ প্রীতির চোখে দেখেন এবং নিজে থেকে ছোট ভগ্নিপতির খোঁজ-খবর নেন। মাঝে মধ্যে অফিস থেকে বেরিয়ে, 'চল হে একটু চা খাওয়া যাক' বলে স্বদেশকে নিয়ে কোন ভবিষ্যুক্ত রেস্তোরাঁয় ঢুকে চা-টা খাওয়ান।

স্বদেশরঞ্জন এতে বিগলিতই হয়। এবং মহিমকে শুধু সমীহই করে না, ভালও বাসে। কিন্তু মহিমের আড়ালে তাঁকে নিয়ে মজা করতেও ছাড়ে না।

বুঝলেন ছোড়দা, বড়দার সঙ্গে চা খেতে ঢুকলে মালুম হয় দরাজ হাত কাকে বলে। ভাগ্যিস বড়দা বাড়িতে এসে বসে ডেলি পাষণ্ডগিরি করে না। এই আপনাদের গোপীচন্দনপুরের হাওয়া গায়ে মাখতে শুরু করলেই, ব্যস আর দেখতে হতো না। স্রেফ লম্বা হাত বেঁটে হয়ে যেতো। এখন? চা খাওয়ানো মানেই তো সে রাত্তিরের মতন 'খাই-খরচ' সেফ। তার ওপর আবার বয়কে হয়তো পাঁচ-পাঁচটা টাকাই টিপস্ দিয়ে বসলেন। বেয়ারা ব্যাটার হাতে ধরা মৌরির রেকাবিতে নোট-খানা ফেলে দিয়ে এমন রাজার চালে বেরিয়ে এলেন, যেন সিনেমার হীরো। চলন-বলনে আর্টটা বড়দা রপ্ত করেছে ভালো। আর চেহারাখানাও যা রেখেছে মাইরি! মারকাটারি! কে বলবে আপনার থেকে সাত-আট বছরের বড়!

'ছোড়দা' অর্থে মহিমের ছোট ভাই প্রতাপ। প্রতাপ হালদার। তা নামের সঙ্গে তার প্রকৃতির মিল আছে। সংসারে তিনি এক দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী ব্যক্তি। আর দাদার সঙ্গে কোথায় বাল্যে আকৃতির বেশ কিছু মিল থাকলেও এখন প্রকৃতির ছাপ আকৃতিতে বর্তেছে।

প্রতাপের একদার 'সোনার বরণ' এখন তামার বরণে পরিণত, দীর্ঘ শরীরটাতে মেদের বিশেষ ঘাটতি, ঢ্যাঙা থেকে কোলকুঁজোয় দাঁড় করিয়েছে। মাথার সামনের চুল কটা টাকের ছাউনিমাত্র, মুখের সামনের দুটো দাঁতই একটা শূন্য গহ্বরের সৃষ্টি করে রেখে নিজেরা বিদায় নিয়েছে।

মহিম বাড়ি এলেই ভাইকে গঞ্জনা দেন, মুখটাকে এমন 'সিন্ধুঘোটকে'র মত করে রেখেছিস কেন রে প্রতাপ! দাঁত দুটো বাঁধিয়ে নিতে পারিস না?

প্রতাপের ডাকনাম 'পতা'। মা, পিসি যখন বেঁচেছিল, পতাটাই বলত। মামা

এখনো পতা বলে। এমন কি পাড়ার গিন্নীরাও। কিন্তু মহিম কদাচ না। বরাবর 'প্রতাপ' বলেন।

আগে আগে দেবযানা হেসে হেসে বলতো, সর্বক্ষণ 'প্রতাপ প্রতাপ' করেই ভাইয়ের এই এতো প্রতাপটি বাড়িয়েছ!

মহিম বলতেন, প্রতাপ থাকা খারাপ কী? ভাই-ই তো?

দেবযানা তখন উদাস হয়ে যেত। বলতো, না, খারাপ আর কি। তবে তুমি আর কোনদিনই বাড়ির কর্তার পোস্টটা পাবে না।

হাসতেন মহিম, সে পোস্টটা পেলেই কি আর ঠিকভাবে চালাতে পারব? সকলের ধাতে ওটা সয় না।

তবে আর কি। তুমি চিরকাল নিজের সংসারে জামাই আদরে থাকো, আর আমি বেচারার পোস্টে কাটিয়ে যাই।

বেচারী আবার কী!

মহিম অবাক হয়েছেন। বলেছেন, প্রতাপ তো তোমায় যথেষ্ট মান্য ভক্তি করে।

তা করে বটে।

তবে? বোঝাও আমায় বেচারা মানে কী?

কিছু না। বোঝাবার চেষ্টায় লাভ নেই। যদি বুঝতে, তবে চিরকাল সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিতে না।

এ অভিযোগ দেবযানার নতুন নয়। ক্রমশই এই গোপীচন্দনপুরের প্যাটার্ন বদলেছে, পাড়াসুদ্ধু কেন, গাঁসুদ্ধু লোক ডেলি প্যাসেঞ্জারী করছে, ছেলে-বুড়ো, এমন কি মেয়ে-বৌগুলোও পযন্ত ডেলি প্যাসেঞ্জার। কেউ পড়ে, কেউ চাকরিবাকরি করে

এখন স্টেশনের ধারে জমজমাট দোকান-বাজার, কিছুদিন হল একটা সিনেম হলও ভূমিষ্ঠ হয়েছে। অধিকাংশই হিন্দী ছবি আসে, তাতে কারো কোন আক্ষেপ নেই। একটা ছবির বিদায়পর্বের পর নতুন একটা এলেই টিকিটঘরে মারামারি লেগে যায়। অন্য গণ্ডগ্রাম থেকে লোক আসে বাসে চেপে। অতএব যে অজুহাতে মহিম হালদার মেসে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিল সে অজুহাত অনেকদিনই লুপ্ত।

তখন তো গোপীচন্দনপুরে রেল স্টেশনই ছিল না। এত বাসের ব্যবস্থাও ছিল না। সাইকেল-রিকশাও ক'টাই বা? সাইকেলে চেপে অনেকখানি গিয়ে তবে ট্রেন ধরতে হত। 'পোয়ালগাদা' ইস্টিশান ছিল সব থেকে নিকটবর্তী। চাহিদা উন্নয়নের শপথ!

এ অঞ্চলের চাহিদার চাপেই এখন গোপীচন্দনপুরের এমন উন্নতি ঘটেছে।

তা ঘটলে কী হবে। হালদার বাড়ির বড়গিন্নী দেবযানী হালদারের জীবন-ছন্দে কোন উন্নতি ঘটেনি। দেবযানীর এখনো পর্যন্ত শনিবার সকাল থেকে স্পন্দিত হওয়া শনিবার রাত আর রবিবারের দিন-রাতটা কেমন একটা রাগ, দুঃখ, অভিমান আর আহ্লাদের ঘোরে কাটানো এবং সোমবার ভোর থেকে আবার ঘানি টেনে চলা।

তাও এই রবিবারের রাতটা এ যুগের পাওনা। স্টেশন হওয়া এবং রাশি রাশি লোকের ছ'টা চল্লিশ, সাতটা কুড়ি, আটটা দশের অভিযানের মাত্রা দেখে দেখে। আটটা দশের গাড়ি ধরেও গোপালকাকার ছেলে দশটায় রাইটার্সে হাজরে দেয়।

মহিম অবশ্য বলেন, হাতী দেয়। রাইটার্সের হাজরে তো এগারোটার পর থেকে শুরু। দশটায় গেলে, হাজরে খাতাটায় সই করাবে কে।

তবে ইদানিং মহিম সোমবার সকালেই যাচ্ছিলেন। যদিও 'স্নানটা জুতমত হল না' বলে খুঁতখুঁত করেন।

দেবযানী আহত হয়, ক্রুদ্ধ হয়, সংসারের সামনে অপদস্থ হয় এবং পাঁচজনের সামনে আত্মসম্মান বজায় রাখতে, ওই আত্মসুখী স্বার্থপর লোকটার আসা-যাওয়ায় ঔদাসীন্যের ভঙ্গী রাখতে চেষ্টা করে। এবং প্রতিবারই মনে করে, 'আর হ্যাংলার মত দেখে কৃতার্থ হবো না।'

তবু শনিবার সকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা আত্মসম্মানজ্ঞানহীন কিশোরী ঘোরাফেরা করতে থাকে। আর সে এই পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই গিন্নীটাকে ঘাড় ধরে বার-বার ছলছুতো খুঁজিয়ে বাইরের দকের জানালায় চোখ ফেলায়।

দেবযানী অবশ্য ভাবে কেউ বুঝতে পারে না। কারণ দেবযানী তার ছোটজা আর বিধবা ভাগ্নীটির মধ্যে চোখ টেপাটেপি আর মুখ টিপে হাসির মধুর আহ্লাদের ছবিটি তো দেখতে পায় না।

বারবার জানলার ধারে যাওয়ার কারণ কিছু আবিষ্কার করে ফেলে বলেই দেবযানী ওদিকে নিশ্চিন্ত। তবে বহিরঙ্গের দিকও তো আছে একটা। সেখানে দেবযানী বড়ই জব্দ।

দেবযানী তো জানে তার স্বামী কত শৌখিন, বাড়ি এসে ঢোকেন যেন ছটা ছড়িয়ে। দেবযানীর কি ইচ্ছে করে না ওর আসার দিন একখানা ভাল পাড়ের ফর্সা শাড়ি পরে? নেহাত ঢলঢলে খলখলে নিত্যদিনের ব্লাউজটা গায়ে না দিয়ে একটা পাটভাঙা ব্লাউজ গায়ে দেয়। চুলটা একটু পরিপাটি করে। তা সুযোগ হয় কই? অথচ খুব যে একটা অভাব আছে তা তো নয়।

স্টেশনের ধারে ধারে সিনেমাহলের আশপাশে অনেক দোকান গজিয়ে, নিত্য-

প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোকে মেয়েদের হাতের মধ্যে এনে দিয়েছে। আগের মত আর ডেলিপ্যাসেঞ্জার পুরুষদের, আর 'কলকাতার জিনিসে'র ভরসায় পড়ে থাকতে হয় না।

তাছাড়া—এই হালদার বাড়িতে কখনোই আর্থিক অনটন বিশেষ নেই। মহিম হালদার, প্রতাপ হালদারের বাপ দেশের এই বাড়িখানাকে 'ঢেলে সেজে' বেশ এক-খানা 'বাড়ির মত বাড়ি' করে দিয়ে গিয়েছিল। আর অনেক জমিজমা করে রেখে গিয়েছিল। তাছাড়া--সংসারে বাসন-কোশন সিন্দুক-চৌকি, আলনা-আলমারী, গিন্নীর গায়ে সোনাদানা অঢেল। বিছানাপত্র, লেপ, কম্বল এসব এতো বেশী বেশী করিয়েছিল লোকটা যে এখনো বোধহয় দু-পুরুষ নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে লেপ কম্বল বিছানা বালিশের চিন্তা না করে। গরুও ছিল গোয়ালে। তবে তারা গেছে। শূন্য গোয়ালটায় কয়লা, কাঠ, সারা বছরের ঘুঁটে মজুত থাকে। আর থাকে—ইলেকট্রিক আসার পর বাতিল হয়ে যাওয়া হ্যারিকেনের গাদা। প্লাস্টিকের বালতির আবির্ভাব ঘটার পর থেকে বাতিল হয়ে যাওয়া আগেকার কিছু ফুটোফাটা হ্যাণ্ডেল ভাঙা গ্যালভানাইজড্ বালতি, ভাঙা ট্রাঙ্ক, মরচে ধরা লোহার পিপে।

এই বাতিল বস্তুগুলোও তো প্রাণ ধরে ফেলে দেওয়া যায় না: গেরস্থের সংসার বলে কথা! কখন কোন্‌টা দরকার ঘটে বলা যায় না। গোটা কয়েক হ্যারিকেন আলো তো লাগেই লোডশেডিংয়ের সময়। এই সমস্ত মালপত্তর তদারকির ভার সবই দেবযানীর ওপর। দেবযানী তার শ্বশুরকে দেখেছে, দেখেছে এইসব সম্ভারের আহরণ পবের কিছু কিছু। তাই দেবযানীর কাছে এগুলো কিছুটা মূল্যবান। এগুলোর সঙ্গে তার ভালবাসা জড়িত।

মহিমের সামনে সংসারের এই 'গোলাগঞ্জর' দিকটা কোনোদিনই উদ্‌ঘাটিত হয় না। মহিম শুধু যেন নকশিকাঁথার ওপর পিঠটাই দেখতে পান, ওপিঠের সুতোর গিঁট আর জট তাঁর অজানা। তাই কেবলই দেবযানীকে বলেন, এতো কী কাজ তোমাদের বুঝি না!

তবে বরের ওই সাপ্তাহিক আসার পরমক্ষণটিতে কি আর দেবযানী তার এইসব মোটা কাজের বোঝা নামিয়ে হাল্‌কা হয়ে থাকতে পারে না? কিন্তু ওই এক চক্ষু-লজ্জা। পাছে এরা বুঝে ফেলে। নাঃ, বুড়ো বয়সে বরের জন্যে হানটান, এটা ভারী লজ্জার কথা। লজ্জার কথা, তার জন্যে কিছু বিশেষ প্রস্তুতির চিহ্ন ধরা পড়া।

তাই দেবযানীকে শনিবার বিকেলে বেছে বেছে আধময়লা শাড়িখানাই টেনে পরতে হয়। আর বেছে বেছে ওই ট্রেনে আসার সময়টা বুঝে সংসারের যত আলাই-

কালাই কাজ নিয়ে বসতে হয়।

বুড়ো বয়সে ছোটদের সামনে হৃদয়াবেগ প্রকাশে বড় লজ্জা।

কিন্তু শুধু কি বুড়ো বয়সেই ?

কেবলমাত্র ছোটদের সামনেই ? বড়দের সামনে নয় ? একদা দেবযানী যখন নিজে ছোট ছিল ?

'ছেলে বাড়ি আসছে' বলে শনিবারের বিকেলে শ্বশুর রাস্তায় বেরিয়ে পায়চারি করতেন, শাশুড়ি বাইরের দিকের ঘরে চলে গিয়ে খোলা দরজার সামনে বসে থাকতেন। বিধবা দিদি 'মহিম আসবে' বলে তাড়াতাড়ি পুজো সেরে নিতে বসতেন, আর দেবযানী একনিষ্ঠচিত্তে রান্নাঘরের মধ্যে নিমজ্জিত থাকতো। যেন তার কেউ আসছে-টাসছে না। যেন মহিম নামে লোকটা তার চেনা জগতের কেউ নয়। এলে তার সামনে প্রয়োজন পড়লে একগলা ঘোমটা দিয়ে ঘোরাঘুরি।

শ্বশুর অবশ্য বেশী দিন ছিলেন না। প্রতাপের বৌ ললিতা শ্বশুরকে দেখেনি। তাই তার প্রথম থেকেই আব্রুর কড়াকড়ি কম। তাছাড়া প্রতাপ চিরকেলে রগচটা, পান থেকে চুন খসলেই রসাতল। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলবে।

অতএব বাঘের মুখে হরিণ ধরে দিয়ে তোয়াজ করার মত প্রতাপের গলার সাড়া পেলেই তার দিকে এগিয়ে দেওয়া হতো নতুনবৌ ললিতাকে।

"অ ছোট বৌমা দেখগে পতা কী বলছে।"

"অ ছোটবৌ দেখগে যা পতা কিছু চাইছে কিনা।"

"থাক থাক ছোট বৌমা, তোমায় আর এখন রুটি বেলতে বসতে হবে না, পতার জামাকাপড় গোছানো আছে কিনা দেখগে। পতা যতক্ষণ বাড়ি থাকে তুমি আর রান্না ভাঁড়ার ঘরে ঘুরঘুর কোরো না বাছা, ঘরেই থেকো। যা রগচটা, গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে আমার, কখন কী দরকার হবে, হাতের কাছে না পেলে রেগে কুরুক্ষেত্তর করবে।"

নিন্দের মোড়কে পুরিয়ে ছোট ছেলেটিকে এই এক আশ্চর্য তোয়াজ। মা দিদি দু'জনেরই।

আড়ালে দু'জনেই বলেছেন, যা কাজের ছিরি ছোট বৌয়ের। কাজ করতে আসা, বিড়ম্বনায় ফেলা। বলতে তো পারা যায় না 'তোমার কাজ' জুতের নয়, অকর্ম বৈ উপকার নেই।

তাই ছুতো করে সরিয়ে দেওয়া বাবা।

দেবযানী কি এই ছলনা বুঝতে পারত না ?

কিন্তু বুঝে করবে কী ?

ভদ্র-সভ্য হওয়ার জ্বালা অনেক।

মুখের ওপর স্পষ্ট সত্যটা বলার ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা নেই নিজের দাবি সম্পর্কে সোচ্চার হবার। বুঝেসুঝে অবোধের ভানে কাটানো ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই ভদ্র-মার্জিতদের।

অতএব শুধু অদৃশ্য দেওয়ালে নিষ্ফল মাথা কোটা। আর তারপর নিঃশব্দে কলহ, সব দোষ তোমার ! সব দোষ। কেন তুমি আমায় অবহেলিতের পর্যায়ে ফেলে রেখে, নিজে মুক্তির সুখ উপভোগ করছ ? তুমি যদি এখানে থাকতে, কার সাধ্য ছিল আমায় এমন বোকা বানিয়ে রেখে দেবার ?

কিন্তু মুখোমুখি ঝগড়া করার মুখও তো ছিল না তখন দেবযানীর।

যুবক মহিম তো তখন বলেছিল দেবযানীকে, 'ডেলি-প্যাসেঞ্জারী'র চাকায় নিজেকে জুততে চাইনি কেন জানো দেবী ? জীবনে আর তাহলে এই অন্ধকূপ থেকে মুক্তি হবে না। দেখছি তো সবাইকে। এ বেশ ভোরে উঠতে না পারার ছুতো করে মেসে বসবাস। এইবার আবার 'মেসের ভাত সহ্য হচ্ছে না' ছুতো করে বৌ নিয়ে কলকাতায় পলায়ন। হা-হা-হা। ছেলের লিভারের বারোটা বেজে যাচ্ছে শুনলে কোন্ মা-বাপ বৌকে আটকে রাখতে চাইবে বল ?

কিন্তু দেবযানী তো তখন সেই হাস্যোদ্ভাসিত উৎসাহের ওপর জল ঢেলে দিয়েছিল।

দেবযানী বরকে ধিক্কার দিয়েছিল।

বলেছিল, তুমি এমন ? এই মতলব এঁটেছ তুমি গোড়া থেকে ? ছি ছি। বাবা-মার মুখের ওপর তুমি বৌ নিয়ে কলকাতায় যাবার কথা বলতে পারবে ?

মহিম তার উজ্জ্বল চোখ দুটো তুলে বলেছিল, কী আশ্চর্য। এতে এতো ঘেন্না দেওয়ার কী আছে ? নিজের বৌ তো ? নাকি পরের বৌ ভাগিয়ে নিয়ে যাবার মতলব এঁটেছি ? তোমায় নিয়ে কলকাতায় ছোট্ট একটি বাসায় সংসার পাতব, এ স্বপ্ন আমার গোড়া থেকে।

দেবযানীর বুকের মধ্যে কি এক ঝলক রক্ত ছলাৎ করে ওঠেনি ? এমন স্বর্গীয় স্বপ্ন কি বিয়ের আগে তার মধ্যেও ছিল না ? দেবযানী একটা মফস্বল শহরের মেয়ে, বাবা-মা, ছোট ভাই নিয়ে ছোট্ট সংসারটিতে মানুষ হয়েছে। মার সংসারটি ছিল তার সংসারের আদর্শ। সেখানে সংসারে বাহুল্যবস্তুর আধিক্য ছিল না, ছিল না এমন চব্বিশ ঘণ্টা সরগরম অবস্থা।

বরের প্রস্তাব তার বুকের ভিতরের সেই নরম জায়গাটিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এইসব বাহুল্যের ভার থেকে দূরে সরে গিয়ে দেবযানী তার মার মত ছোট্ট সুন্দর একটি সংসার পাততে পারবে। কী রোমাঞ্চ!

কিন্তু সে রোমাঞ্চকে প্রশ্রয় দেবে কী করে দেবযানী নামের সেই মেয়েটা? সে যে ভদ্র সভ্য! তার চোখের চামড়াটা যে বড্ড পাতলা!

অতএব বলেছিল, তা হয় না।

আচ্ছা কেন হয় না? কলকাতায় বৌ নিয়ে গিয়ে বাসা করছে না লোকে? আমাদের আগের জেনারেশানেই এমন কত হয়েছে। কেন ছোট্ট ঠাকুর্দা? বাবার কাকা? বদলী চাকরি ছিল, বৌ নিয়ে কোথায় না কোথায় ঘুরেছেন। একবার বক্সারে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে তিন চারদিনের জন্যে। কী ভাল লেগেছিল!

দেবযানী অবাক।

সেটা আর এটা এক হল?

কেন, তফাতটাই বা কী!

বাঃ! বিদেশে চাকরি হলে লোকে বৌ নিয়ে যাবে না? সংসার করবে কী করে তাহলে?

বাঃ! আমিও তো তাই বলছি গো দেবীরাণী! সংসার করব তাহলে কী করে? যদি দু'জনে দু জায়গায় থাকি!

দেবযানী বলেছিল, দুটো এক নয়। সেটা নিরুপায় হয়ে করা। আর এটা ইচ্ছে করে।

বাঃ! কলকাতাটাও কি এখান থেকে বিদেশ নয়?

গায়ের জোরে বিদেশ বানানো। বাড়িতে বাস করেও যদি অফিস করা যায়, তবে বিদেশ বলা হবে কোন্ মুখে শুনি? তোমার না হয় চক্ষুলজ্জা নেই, আমার আছে।

তবু তারপরও বলেছে মহিম, ভাল করে ভেবে দেখ দেবী। একটু চক্ষুলজ্জার জন্যে কতটা খোয়াব আমরা। কত শখ ছিল সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে ব্যায়লা বাজাব, তুমি ফর্সা ভাল শাড়ি পরে বসে শুনবে। রান্না-খাওয়ার জন্যে এই এখানের মত রাত দিন খেটে না মরে স্রেফ স্টোভ জেলে দু'জনের মত রান্না করে নেব দু'জনে মিলে।

চমৎকার! তুমি বাড়ির বড ছেলে তোমার একটা দায়িত্ব নেই?

উঃ দেবী! তুমি এইটুকু ফুলের মত একটা মেয়ে। এত ভারী ভারী কথা শিখলে কী করে? 'দায়িত্ব'! 'কর্তব্য'! যেন এক-একখানা পাথরের চাঁই!

তার মানে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে কাটাতে চায় সে। কিন্তু এমনি ভাগ্য মহিমের, তার ফুলের মত বৌটা কিনা ইচ্ছে করে বুকে পাষাণভার চাপিয়ে বসে থাকতে চায়।

কেন রে বাবা! কর্তা-গিন্নী তাদের নিজস্ব পাতানো সংসারটি নিয়ে সুখে থাকুন। খিদমদ্গার হিসেবে আরো অনেকে থাকছে যখন, আমরা আমাদের জীবন নিয়ে খোলা হাওয়ায় সরে পড়ি। দোষ কোথায়? পাপ কোথায়?

কিন্তু তরুণী দেবযানী তাতে দোষ দেখেছিল। তার ভেবে গা শিউরে উঠছে, ছি ছি, মা-বাবা এ কথা শুনলে কী ভাববেন!

অতএব সে প্রস্তাব কার্যকরী হল না।

দেবযানী যেহেতু তখন 'ফুলের মত' (যদিও এখন সে-কথা কেউ বললে লোকে হি হি করে হেসে উঠবে) তাই বলেছিল, ছাই ভালবাসো তুমি আমায়। বাসলে নিশ্চয় মেস-বাড়ি ছেড়ে বাড়িতে চলে আসতে। দু'জনে একসঙ্গে থাকতুম।

মহিম বলেছিল, এখানে যা 'দুজনে একসঙ্গে' তা আর জানতে বাকি নেই আমার, দেখছি তো আজন্ম চারদিক। 'বর না পরপুরুষ।' একটু কথা কইলে নিন্দে, কাছে বসলে নিন্দে। তাছাড়া—তুমি যদি আমার জন্যে তোমার চক্ষুলজ্জাটা ছাড়তে না পারো আমিই বা কেন বলব না, ছাই ভালবাসো তুমি আমায়।

জীবনের প্রারম্ভে তো এইসব নিভৃত নাটক ঘটে গেছে। কাজেই দেবযানীর মধ্যে ঝগড়া করার মত তেমন জোর নেই।

তারপর অবশ্য সংসারের একটা পটপরিবর্তন হয়ে গেল। সতীশ হালদার মারা গেলেন। আর তার পর পরই—সতীশগিন্নী দীর্ঘদিনের জন্যে রোগশয্যায় আশ্রয় নিলেন। হা বৌমা, যো বৌমা। বিধবা মেয়ে তার মস্ত বড় মেয়েটা তার কোনো কর্মের নয়।

দেবযানী বলল, দেখলে তো? আমরা বাসায় চলে গেলে কী হতো?

মহিম বলল, কী আবার হতো? বাসাটা তো বিলেতে করতাম না? দরকারের সময় আসা যেত।

বাবা চলে গেলেন। মাকে একলা রেখে আবার চলে যাওয়া যেত?

মহিমেরই মা, তবু মহিম বলেছিল, একলা আবার কী, দিদি রয়েছেন, দিদির ছেলেমেয়ে, প্রতাপ যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। একা মানে? চোর এলে তুমি তাড়াবে? যাক গে, ও ইচ্ছে আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমার মেসই ভাল।

দেবযানীর তখন রাগ হয়ে গেছে। বলেছে, যার 'নিজের বাড়ি'টা ভাল লাগে না, তার মেসই ভাল ছাড়া আর কী হবে? আশ্চর্য! তোমারই ঘরবাড়ি, চেনাজানা

সবাই। আমি তো বহিরাগত।

কী করব বল। আমার এই নিজস্ব জায়গাটাই আমার খুব বাজে লাগে। মানুষগুলো যেন কূপমণ্ডুক। নতুন কোনো কথা জানে না। তাছাড়া—সত্যি বলব কলকাতাটা যেন আমায় দশ হাতে বেঁধে রেখেছে।

দেবযানী পাড়া-পড়শী, ননদ-ভাগ্নী, এমন কি শাশুড়ীর কাছ থেকেও অনেক কুটিল মন্তব্য শোনে, শুনেছে। যদিও নিজে সে বিশ্বাস করে না। তবু বলল, কলকাতার ইটকাঠ না রক্তমাংসের কেউ!

মহিম রেগেও ওঠেনি, প্রতিবাদেও মুখর হয়নি। শুধু বলেছিল, ভাবতে ইচ্ছে করলে ভাবতে পারো।

দেবযানী তখন তাড়াতাড়ি বলেছে, আহা আমি যেন তাই ভাবতে বসেছি।

অবশ্য স্বরাজ আছে সংবাদদাতা। সে অফিসের খবর এবং মেসের খবর সবই মাঝে মাঝে সাপ্লাই করে এবং বলে, বাবুয়ানাই ককক আর ফিঙে পাখির মত পিছলেই বেড়াক বড়দা একদিকে আর গঙ্গাজল একদিকে। চাঁদে কলঙ্ক আছে তো বড়দার মধ্যে নেই।

শেষ পর্যন্ত ঘরেপরে সবাই দেবযানীকেই কাঠগড়ায় দাড় করায়। একটা ছেলে-পুলে না হলে কখনো 'আঠা' থাকে? 'বাড়ি' বলে টান হয়? সংসার মানে কী? ছানাপোনাই তো? বাঁজা বৌকে আর কতদিন ভাল লাগে পুরুষ মানুষের?

কিন্তু আশ্চর্য! শ্বশুর যখন মারা গেলেন, তখন তো দেবযানীর মাত্র চব্বিশ বছর বয়েস! তখন যে কেন 'বন্ধ্যা' নাম রটে গেছল! শাশুড়ী-ননদের হা-হুতাশেই হয়তো।

দেবযানীর মনে হতো, রটিয়ে রটিয়েই সেটাই ঘটিয়ে ছাড়লেন এঁরা। বাইশ বছর বয়েস থেকেই মাদুলী-কবচ, ষষ্ঠীতলায় ঢিল বাঁধা, এ সব ঘটনা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কিছুই লাভ হয়নি।

তারপর তো গঙ্গায় অনেক জল গড়াল।

ভাগ্নীর বিয়ে হল এবং চটপট বিধবা হয়ে ফিরেও এল। প্রতাপের বিয়ে হল এবং বৌ চটপট বছরে বছরে আঁতুড়ঘরে যাওয়ার গৌরবটা দেখিয়ে বড় জাকে টেক্কা দিল। নিষ্প্রভ দেবযানী, শুধু খেটে খেটে আর সবাইয়ের পরিচর্যা করে করে বাইরঙ্গে প্রভা বিকীর্ণ করতে লাগল।

তবে প্রতাপ এই অক্লান্ত মহিমার স্বীকৃতি দেয়। দিদি কিংবা দিদির মেয়ে কারুর ওপরই আস্থা রাখতে পারে না সে। নিজের বৌয়ের ওপর তো নয়ই। একমাত্র

নির্ভরস্থল তার 'বৌদি'।

সেই দেখেই মহিম বলেছেন, কেন, প্রতাপ তো তোমায় যথেষ্ট মান্য-ভক্তি করে।

অনেকদিন পরে আরো একবার মান খুইয়েছিলেন মহিম। মা মারা যাবার পর। তখনো ন্যাড়া মাথায় চুল গজায়নি। ন্যাড়া মাথার কুশ্রিতা ঢাকতে সবসময় মাথায় একটা সাদা টুপি চাপিয়ে থাকেন। সবটাই সখ নয়, সৌখিনতা নয়, কুশ্রীতাটা সহ্য করতে পারেন না মহিম হালদার।

এখনো ওঁর মাঝে মাঝে মনে হয়, এই পরিবেশ থেকে টেনে বার করে নিয়ে গিয়ে অকাল বার্ধক্য ধরে আসা মানুষটাকে কি আবার তার হারিয়ে যাওয়া চেহারাটার খানিকটা ফিরিয়ে আনা যায় না? চেহারার সঙ্গে মানুষটারও?

ওই হাতভর্তি লোহা, শাঁখা, লাল কলি হ্যানোত্যানো থেকে হাতটাকে মুক্ত করে নিয়ে শুধু কয়েকটা সোনার চুড়ি অথবা একটা সোনার বালা। কপালে এতোখানি একটা সিঁদুর ধ্যাবড়ানো টিপ মুছে ফেলে দিয়ে ছোট্ট একটু টিপ পরা। ঢলঢলে একটা সেমিজ কি ব্লাউজ (ভগবান জানেন ওটা কী।) ছেড়ে ফেলে টিপটপ একটা ব্লাউজ আর খুব চওড়া পাড় একখানা শাড়ি পরিপাটি করে পরা। এমন একটি ছবি দেবযানীর জন্যে ভাবেন মহিম। এইগুলোর খাঁজে ভরে থেকেই এতো বুড়োটি লাগে দেবযানীকে। অথচ আগে কী লাবণ্যময়ী ছিল!

এইগুলো থেকে মুক্ত করতে হবে ওকে।

মনে মনে বলে উঠলেন মহিম।

আর তারপরই বলে উঠলেন, এখন আর তোমার যেতে বাধা কী?

অবাক হয়েছিল দেবযানী, কোথায় যেতে?

কেন, কলকাতায়। বাসায়।

কলকাতায়! এখনও তুমি বাসার স্বপ্ন দেখছ? হেসেই ফেলেছিল দেবযানী, তোমার মত পাগলই এ কথা বলতে পারে

মহিম বলে উঠেছিলেন, নিজের স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার ইচ্ছেটা পাগলামি?

এ ক্ষেত্রে তাই।

আচ্ছা এখন আর তোমার কী বাধা দেবযানী? প্রতাপের স্ত্রী যথেষ্ট বড় হয়েছে, দিদি রয়েছেন, দিদির মেয়ে রয়েছে। চল না আমরা আমাদের একটা সংসার তৈরী করি।

কিন্তু এ কথা কি এখন দেবযানীর গায়ে মাখবার? যে মেয়ে হৃদয় আছড়ানো

ব্যাকুল বিহ্বল যৌবনের দিনগুলিকে কর্তব্য আর চক্ষুলজ্জার দায়ে বিকিয়ে দিয়েছে, সে মেয়ে এখন এই প্রাক্ প্রৌঢ়কালে সেই জিনিস দুটো অহেতুক বিসর্জন দিয়ে বসবে ?

অহেতুক ছাড়া আর কী ? আর ক'টা বছর পরেই তো রিটায়ার করে বাড়ি এসে বসতে হবে মহিমকে। এতদিনই যদি কেটে গেল, আর ক'টা বছরের জন্যে ! পাগল !

তাছাড়া ক্রমশই তো এই জমজমাটি বৃহৎ সংসারের রসাস্বাদ দেবযানীর মজ্জার মধ্যে মিশে গিয়ে তাকে পাকে পাকে বেঁধে ফেলেছে।

এই ওপর-নীচের দশখানা ঘর আর দু'তলায় দু'খানা টানা লম্বা ঢাকা দালানওলা বাড়ি। তার সর্বত্র বোঝাই বস্তুপুঞ্জ, এই উঠোন-পাটান, বাগান, পুকুর, নারকেল গাছ, সুপারি গাছ এবং প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীপ্রতাপ হালদারের গুটি তিনেক সন্তান-সন্ততি আর নিতি৷ রুগী বৌ, যাদের সমস্ত দায়িত্ব দেবযানীর ওপরই ন্যস্ত, এই দায়ভার ফেলে দিয়ে কলকাতায় দু'খানা ঘরের খাঁচার মধ্যে বাস করতে যাবে দেবযানী ? কী হাস্যকর প্রস্তাব !

সপ্তাহে সপ্তাহে দেখাও তো হচ্ছে !

দেবযানী বলল, তুমি এখনো 'ইয়ংম্যান' তাই তোমার মধ্যে এখনো স্বপ্ন গজগজ করছে। তোমার কথায় হাসবো, না কাঁদবো ?

মহিম হালদার হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, কেন, তোমার মধ্যে কোন স্বপ্ন গজগজ করছে না ?

আমার মধ্যে ? আমার মধ্যে আবার কিসের স্বপ্ন ?

কেন, এ স্বপ্ন দেখ না, গোয়ালটা আবার জাঁকিয়ে তুলে দু-চারটে গরু পুষি, সংসারে খাঁটি দুধ দই ক্ষীর ছানার বন্যা বয়ে যাক। দেয়াল ভর্তি করে ঘুঁটে দিয়ে দিয়ে সারা বছরের ঘুঁটের সংস্থান করি। দেখ না এমন স্বপ্ন ?

হা হা করে হেসে উঠেছিলেন মহিম, ঘর ফাটিয়ে।

রাগ করে উঠে গিয়েছিল দেবযানী।

অথচ রাগ দেখিয়ে তেমন জোর গলায় প্রতিবাদ করতেও পারেনি।

এমন একটি ইচ্ছের অঙ্কুর কি সত্যিই মাথা তুলছিল না মনের মধ্যে ?

ক'দিন আগেই প্রতাপ একদিন বলেছিল, সস্তায় দুটো গরু পাওয়া যাচ্ছিল, তো আজকাল গরুর কাজ করবার মত লোকের যা আকাল, তাই তেমন গা করলুম না।

প্রতাপের যা কিছু পরামর্শ বৌদির সঙ্গেই। প্রায় একই বয়েস দু'জনার। দেবযানী যখন বিয়ে হয়ে এসেছিল বছর সতেরো বয়েস, প্রতাপ ষোলো, কিন্তু গ্রামের ছেলে বলেই অন্য অনেক বিষয়ে দু'দে হলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিতান্তই নাবালক ছিল।

দেবযানী যখন অবাক হয়ে বলেছিল, পড়ার বই ছাড়া আর কোন বই পড়নি তুমি? গল্পের বই পড় না?

তখন প্রতাপ 'গল্পের বই পড়া'র অনিষ্টকারী দিকটা নিয়ে তর্ক করতে না বসে প্রায় মরমে মরে গিয়েছিল। ম্লান মুখে বলেছিল, পাচ্ছি কোথায় গল্পের বই?

আচ্ছা আমার কাছে বিয়ের পাওয়া অনেকগুলো বই আছে, দেব তোমায় পড়তে।

বেশ কিছু চকচকে ঝকঝকে বই ছ্যাণ্ডারের সামনে ধরে দিয়েছিল দেবযানী।

প্রতাপ বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বলেছিল, এ সব তুমি পড়ে বুঝতে পারো?

ও মা! বুঝতে পারব না? হি হি হি।

হেসে গড়িয়ে পড়েছিল দেবযানী।

তদবধি বৌদি সম্পর্কে একটি প্রগাঢ় আস্থা জন্মে গিয়েছিল প্রতাপের। এতাবৎ-কাল রয়েই গেছে। বিশেষ করে যে কোন বিষয়ে পরামর্শের ব্যাপারে।

এই যে বাপের রেখে যাওয়া জমিটমিগুলোয় সব্জির চাষবাস করিয়ে দৈনিক কলকাতায় চালান দেওয়ার ব্যবসাটা চালায় প্রতাপ তার স্কুলমাস্টারি বাদে, তার সব পরামর্শই তো বৌদির সঙ্গে।

দিদি অবশ্য এতে ক্রুদ্ধ। বৌ বেজার। কিন্তু প্রতাপ তাতে কেয়ার করে না। বলে, তোমরা কা বোঝো ছাই? মগজে কিছু আছে?

অতএব মগজওয়ালা বৌদির ওপরই ক্রমেই এসে চেপেছে সর্ববিধ দায়। বাড়িতে মিস্ত্রী লাগলে, কে প্রখর দৃষ্টি হেনে দেখবে ফাঁকি দিচ্ছে কি না দেবযানী ছাড়া? সংসারের কোথায় কি ঘুণ ধরছে, ছাতা ধরছে, পোকা ধরছে, নষ্ট হচ্ছে—এসব কে ধরবে দেবযানী ব্যতীত?

এই সর্বময়ীর ভূমিকা অবশ্য প্রতাপই দিয়েছে দেবযানীকে নির্ভরযোগ্য ভেবেই।

এই ভূমিকার একটা মর্যাদা নেই?

অতএব সেই মর্যাদা রাখতেই দেবযানীকে সেদিন কথাটা উড়িয়ে না দিয়ে বলতে হয়েছিল, তা হঠাৎ তোমার মতন এমন একটি মুর্গীখেকো সৎ ব্রাহ্মণকে সস্তায় গোদান করছে কে?

প্রতাপ বলল, দান না, তবে সত্যিই সস্তা। আমাদের স্কুলের এক ছাত্রের ঠাকুর্দা, এতদিন দেশের বাড়ি-ফাড়ি, গরু-বাছুর আর নাতি আগলে পড়ে ছিলেন। এবার নাতি নিয়ে ছেলের কাছে দিল্লীতে চলে যাচ্ছেন। নাতি ওখানেই পড়বে। তাই বলছিলেন গরু দুটো যদি কেউ নেয়, যা হোক দামে ছেড়ে দেবেন।

দেবযানী অবশ্যই বুঝেছিল, আজকালকার দিনে গরু রাখা চারটিখানি কথা নয়, তবু ছাওয়ের ইচ্ছুকমুখ দেখে বলেই ফেলেছিল, তা দেখই না খোঁজ-খবর করে, কেমন গরু। দুধ দেয়, না শুধুই খায় ?

হেসে উঠেছিল দু'জনেই। যার ধ্বনিটা ললিতা নাম্নী মহিলাটির গায়ে বিষ ছড়িয়েছিল।

কিন্তু মহিমের ওই হা-হা হাসি !

দেবযানীর গায়ে এবং প্রাণে দাহ ছড়িয়ে দিয়েছিল নাকি সেদিন ? দেবযানী এতই তুচ্ছ ? ইস, তোমারই মা-বাপের গড়া সংসার, তাকে টেনে মরছি, আবার ঠাট্টা বাঙ্গ। আচ্ছা, বাড়ি এসে বোসো একবার, দেখবে এসবের দাম আছে কিনা। আর এই খোলা আকাশ-বাতাস, দরকারের অতিরিক্ত জায়গাদার বাড়ি, গাছপালা, পুকুরের মাছ ভাল লাগে কি না লাগে। মন বসে কি না বসে।

এই মন্ত্র জপে জপেই দিন, মাস, বছরগুলোকে যেন ঠেলে ঠেলে পার করে চলেছে দেবযানী। আর ইদানীং তো দিন গুণতে শুরু করেছিল।

আর সপ্তাহান্তে চলে যাবার সময় চোখে আলো ঝলসে বলেছে, আচ্ছা, আরও ক'দিন উড়ে নাও। তারপর হচ্ছে তোমার জব্বর ব্যবস্থা। আমার সব দায়িত্ব চাপাচ্ছি তোমার ঘাড়ে। ঢের দিন ফাঁকি দিয়েছ।

তা প্রতাপও বলেছে, দাদা তুমি এবার বাড়ি এসে বস তো, আমি একটু আসান পাবো। যা দিনকাল হয়েছে ! লোকজন সব বেয়াড়া, একা সামলানো দুষ্কর।

এই পটভূমির ওপর অপ্রত্যাশিত বাজটা এসে পড়ল।

মহিম হালদার মেসের ঘর ছাড়বেন না। বাড়িতে এসে বসবেন এমন মতলব নেই।

স্টেশনে নামতেই চিরপরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হওয়াটা অবধারিতই। প্রতিটি শনিবারেই হয়। এরা কিন্তু মহিমের সহযাত্রী নয়, সহযাত্রীরা তো টপাটপ নেমে পড়ে, নিজ নিজ লক্ষ্যে ছোটে। তাছাড়া মহিম হালদার নামের লোকটা ডেলি প্যাসেঞ্জারদের স্পেশাল কামরা, যেখানে ট্রেনের এইটুকু সময়েও তাস

পড়ে, নয়তো রাজনীতি ভাষ্যের বন্যা বইতে থাকে, সে কামরার সদস্য নন। মহিম প্রায়শই একটা আলাদা কামরায় ওঠেন, এবং সেটাও নিত্য একই কামরা নয়।

মহিমের এই সপ্তাহান্তিক বাড়ি আসাটার চেহারাটি এই যেন, আজই দৈবাৎ এলেন। অর্থাৎ এটাই মহিম দেখাতে চান। তবু এদের হাত এড়ানো যায় না, এই স্টেশনের ধারের চায়ের দোকানের মালিক গোকুল, পান-সিগারেটের দোকানের বিনোদ, জুতো পালিশ করিয়ে নাম না-জানা ছোট ছেলেটা, এরা ঠিক নজর রাখে আর কথা কয়ে ওঠে।

গোকুল বলে উঠল, হালদারবাবু এলেন?

মহিম দাড়িয়ে পড়ে একটু হাসলেন, এলাম।

এবারে তো পাকাপাকিই আসতে হবে, কী বলেন?

মহিম আবারও হাসলেন, মানুষের জীবনে পাকাপাকি বলে কিছু আছে না কি গোকুল?

আর কথার অপেক্ষা করলেন না, এগিয়ে গেলেন।

জুতো-পালিশ ছেলেটার সামনে দাড়ালেন, তার জুতোর স্ট্যাণ্ডে পা রেখে। ছেলেটা কৃতার্থম্মন্যের হাসি হেসে পালিশে হাত লাগালো। ছেলেটা কোন কথা বলে না, শুধু ওই হাসিটুকু হাসে। মহিম হালদারের মনে হয়, যেন 'বাড়তি কিছু পেলাম'। মহিম তাই ছেলেটার হাতে তার মজুরির অতিরিক্ত বাড়তি কিছু দিয়ে দেন। আজ বলে নয়, দিয়েই থাকেন।

বিনোদ মাঝে মাঝে হেসে বলে, এখন তো বাড়ির পথে, ডবল দাম দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে কী হবে মহিমদা?

বিনোদ পাড়ার লোক, বিনোদের দাদা নীরদ অতাতে একদা মহিমের সহপাঠী ছিল, সেই সূত্রে ছেলেবেলা থেকেই দাদা বলে ডাকে।

নীরদ ভাল চাকরি করে কলকাতায় বাসা করে থাকে, মাথামোটা গণ্ডমুখ্যু ছোট ভাইটাকে একটা পান-সিগারেটের দোকান করে দিয়েছে। কিছু কিছু স্টেশনারি জিনিসও রাখে বিনোদ তার দোকানে। ব্যস, এই আয়। পান সাজে তার আরো অখাদ্য একটা ভাগ্নে। গলায়-পড়া বিধবা বোনের ছেলে।

পাড়ায় এদের কেউ মানুষ বলে গণ্য করে না, নেহাৎ পাড়ার লোক বলেই, আর জিনিস কিনে দাম বাকি রাখার সুবিধে আছে বলেই ক্ষ্যামাঘেন্না করে কথা বলে। তবে কখনো কখনো ছুটিছাটায় নীরদ বৌ-ছেলে নিয়ে 'বাড়ি' এলে আলাদা কথা। তখন সরকারবাড়িতে লোক সমাগম। নীরদ-কোম্পানীর প্রতি পরমপুজ্যি ভাব।

কিন্তু মহিমের যেহেতু সবই বিপরীত, তাই মহিমকে (নিজেও তো আসেন ছুটি-ছাটায়) বাল্যবন্ধুর দিক মাড়াতেও দেখা যায় না। অথচ 'বন্ধুর ভাই' এই সুবাদে মহিম প্রতি সপ্তাহে পানের দোকানের বিনোদের সামনে একটু না দাঁড়িয়ে যান না। কী ? কী খবর ? বলে দাঁড়ান।

বিনোদ আজ আর ওই ডবল দামের উল্লেখ না করে বলে উঠল, শুনলুম আপনি না কি রিটায়ার করেও মেস ছাড়ছেন না মহিমদা ?

হয়তো মহিমের প্রশ্রয়ই বিনোদের সাহসের জন্মদাতা। নইলে নিজের দাদার সঙ্গে তো মুখ তুলে কথাই কইতে সাহস পায় না লোকটা।

মহিম হাসলেন।

বললেন, কে দিল খবরটি ?

বিনোদ অপ্রতিভাবে বলল, মানে বাড়িতে শুনছিলুম। খবরটা সত্যি ?

সত্যি না হবার কী আছে হে ?

বিনোদ আরো অপ্রতিভ হয়ে বলল, না, মানে, এখন তো ঘরে এসে বসবাস করবার কথা—চিরদিন মেসে পড়ে থাকলেন।

পড়ে থাকলাম ?

মহিম জোর গলায় হেসে উঠলেন, 'পড়ে থাকতে' আমায় কে হুকুম দিয়েছিল ? পড়ে থাকা কেন ? 'থাকা'।

বিনোদ আর কিছু বলল না। ভাগ্নেকে যথারীতি ইশারা করল, ভাগ্নে দু'খিলি পান এগিয়ে দিল।

মহিম পান খান না, তবু বিনোদ এটি করবেই। প্রথম প্রথম মহিম দাম না দিয়ে নিতে চাইতেন না, কিন্তু বিনোদ একদিন বলে বসল, আমি গরীব বলেই তো এটা বলতে পারছেন মহিমদা ?

সেরেছে !

মহিম বলে উঠলেন, দে বাবা বুদো, দে কষে চুন দিয়ে দুটো পান। তোর মামার যদি রাগ পড়ে।

বুদো দাঁত বিছিয়ে হেসে বলেছিল, তো বেশী করে চুন ক্যানো ?

বেশী করে গুণ গাইব ! আরে বাবা পান তো খাই না, মিছিমিছি কেন দুটো করে পান গচ্চা, তাই বারণ করি।

মহিমের ওই পান না খাওয়ার কথা অজানা নয় বিনোদের, কখনো কখনো বলে, পান খেলে ওই মুক্তোপাটি দাঁতটির শোভা যাবে, তাই। না কি বলেন ? তবু পান

গচ্চা দিতে ছাড়ে না। বলে, আপনি না খান বড়বৌদিকে দেবেন। উনি খুব পানের ভক্ত।

মহিম মনে মনে ক্ষুব্ধ হাসি হাসেন।

শুধু পানের? দাঁতের পাটি তো দোক্তায় জরজর! অথচ সত্যি যদি দাঁতের সঙ্গে মুক্তোর তুলনা করতে হয় তো দেবযানীরই ছিল।

মহিমের মা, তার 'রাজপুত্তুরে'র মত চেহারার বড় ছেলের বৌটি, তার পক্ষে নীরেস হওয়ায় ওপরওয়ালাদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, শ্বশুর নাকি কাকে কথা দিয়ে বসেছিলেন, সে কথার নড়চড় করা চলে না। বৌ এমনিতে সুশ্রী হলেও, রঙেতে মহিমের কাছে লাগে না। কিন্তু সদ্য যুবক মহিম তাঁর মায়ের এই মনোভাবের ধারে-কাছেও যাননি। মহিম বৌয়ের মুক্তোঝরানো হাসিটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

হাসিতে হয়তো এখন ঘাটতি ঘটেনি দেবযানীর, অন্তত গেরস্থর আর পাঁচজনের সঙ্গে, পাড়াপড়শীর সঙ্গে, কিন্তু দাঁত? তাতে আর আলো ঝলসায় না। কালো আর ক্ষয়া। আর মহিম? দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষার আর যৌবন রক্ষার চিন্তায় বরাবর লড়ে আসছেন।

পান দুটো হাতে নিয়ে মহিম একটা কাগজে মুড়ে হাতের ব্যাগে রেখে হেসে বললেন, তোমার এই বাজে খরচটিও তাহলে বজায়ই থাকল?

বিনোদ বলল, কোন্‌টা বাজে, কোন্‌টা কাজের সে হিসেব কি সবসময় বোঝা যায় মহিমদা?

হুঁ। সবাই তত্ত্বকথার ওস্তাদ। বলে মহিম রিক্‌শায় উঠে বসেন।

বিনোদের দোকানের পাশেই রিক্‌শা স্ট্যাণ্ড। স্টেশন থেকে বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি নয়, প্রতাপ তো এইটুকু পার হবার জন্যে পয়সা খরচের কথা ভাবতেই পারে না, কিন্তু মহিম হাঁটার দিক দিয়ে যান না।

রাস্তা তো আর পীচঢালা নয়, জুতোয় পুরু ধুলোর আস্তরণ পড়বে, ধাক্কাদার পাড়ের ফুল-কোঁচানো ধুতির কোঁচার আগার বারোটা বেজে যাবে! তা ছাড়া, হাঁটা পথে যাওয়া মানেই তো প্রতি পদে একবার থামা, আর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

অথচ প্রশ্নগুলো অহেতুকই।

এই যে বাবা মহিম! বাড়ি এলে?

এই যে মহিম কাকা, এলেন? রেলে, না বাসে?

বাসে মহিম আসেন না কোন দিনই, তবু বলে। একই প্রশ্ন। মহিমেরও একই উত্তর, না, ট্রেনেই।

কেউ কেউ আবার উদ্বেগের গলায় বলেন, মহিমের শরীর-স্বাস্থ্যটি তো তেমন জুতের ঠেকছে না ? ভাল আছ তো বাবা ?

মহিম অবজ্ঞার গলায় বলেন, মহিম হালদার কখনো ভাল ছাড়া খারাপ থাকে না মিত্তিরকাকা !

জানেন, ঐ উত্তর শুনে শুভানুধ্যায়ী মনে মনে বলে উঠছেন, অহংকারে মটমট। এতো তেজ থাকবে না রে ব্যাটা !

জেনেবুঝেও ওইরকম উত্তরই দিয়ে বসেন। কারণ এও জানেন, আবার কোন-দিন পথে আসতে ওনার চোখে পড়ে গেলেই, উনি মহিমের চেহারা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে একই প্রশ্ন করবেন।

আশ্চর্য এইসব লোকের মনোবৃত্তি। দেখিস তো বাবা মহিম তোদের অ্যাভয়েড করতে চায়, তবু ডেকে ডেকে ওই গায়েপড়া আত্মীয়তা, আর একঘেয়ে বোকা বোকা প্রশ্ন।

এইসব প্রশ্নোত্তরের হাত এড়াতেও রিক্‌শাটা উপকারী। রিক্‌শাওলা প্রশ্ন-কর্তার নাকের সামনে দিয়ে বো করে বেরিয়ে যাবে। তা তাই যাচ্ছিল, কিন্তু ভূদেব রায়বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। সেখান থেকেই গলা তুলে হাঁক দিলেন, তোর গাড়িতে কে রে কেষ্ট ? আরে বাবা একটু থাম্ না !

বাধ্য হয়ে একটু থেমে কেষ্ট বলল, আজ্ঞে কে আর ? হালদারবাড়ির বড়বাবু।

হালদারবাড়ির—অ মহিম ? তা বাবা মহিম, বাড়ি এলে ? তো এবারও যে দেখছি ঝাড়া হাত-পা ?

মানে ?

মানে, তোমার মালপত্তরটত্তর তো দেখছি না। এতোকালের বসবাস, জিনিস তো সেখানে কম জমেনি। সেই যে নাড়ু একবার গেছিল তোমার মেসে কি জন্যে, এসে তো বলতে বলতে অজ্ঞান। বলে, কে বলে মেসের ঘর। একদম বাসাবাড়ির মতন ঘর সাজিয়ে রেখেছে মহিম মামা ! তো সে সব তো আর মেস মালিককে দাতব্য করে আসবে না ?

মহিম অবশ্য রিক্‌শা থেকে নামেন না, ঘাড় বাঁকিয়ে বলেন, দাতব্য ? কেন ? আমার আর লাগবে না সেসব ?

বুঝতে ভুল হয় না, মহিমের সংকল্প ভূদেবের অজানা নয়। তবু তিনি অবোধের ভানেই বলেন, আবারও লাগবে ? কেন ? অফিসে কি আবার এক্সটেনশন ঘাড়ে চাপালো না কি ?

'এক্সটেনশন'। 'ঘাড়ে চাপালো'।

জোরে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল মহিমের। ভুবন রায়ের বড় ছেলে ভূষণ, একটা বছর এক্সটেনশন পাবার জন্যে কত কাঠখড় পুড়িয়েছে, জানতে তো বাকি নেই মহিমের। তবে সে কথায় গেলেন না মহিম, বলে উঠলেন, পাগল। ঘাড়ের বোঝা নামল, বাঁচলাম। আবার ঘাড় পাতি।

ভূদেব রায় মনের দাঁত কিড়মিড়িয়ে মনে মনে বললেন, অহঙ্কার। তেজে মটমট করছেন। এক্সটেনশান পেলে ছাড়তিস? পাসনি তাই। কিন্তু ব্যাপারটা তাহলে কী? অফিস চুকেবুকে গেল, অথচ মেসের ঘরটি রইল, এর রহস্য? তাহলে ছেলেরা কানাঘুষোয় যা বলছে, সেটাই সত্যি? ওরা তো বলছে নির্ঘাৎ মহিম হালদার কলকাতায় একটা 'ডুপ্লিকেট সংসার' ফেঁদে রেখেছে। নচেৎ চিরকাল মেসে পড়ে থাকে? এখন কলকাতায় যাওয়া-আসার এত সুবিধে হয়েছে। তাই সম্ভব। না হলে এখনো এমন সাজগোজে লক্কা পায়রাটি!

কিন্তু মন আর মুখ তো এক বস্তু নয়, মুখে যা বলেন ভূদেব তা একেবারে সরল সুন্দর মধুর। মুখের রেখায় ইনোসেন্টের ছাপ মেখে বলেন ভূদেব রায়, অ, বুঝেছি। আখের ভেবে, সময় থাকতে কলকেতায় কোন বিজনেস ফেঁদে বসে আছো, কেমন? তাহলেই নিত্যি যাতায়াতের দরকার, ঘরখানা থাকলে সুবিধে। এই যে আমাদের ফোটন, কাঁচা বাজার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা ধরেছে, তো রোজ দুপুরের ভাতটা খেতে যা-তা হোটেলে ছুটতে হয়। এ তোমার চিরপরিচিত জায়গা-

মহিম অমায়িক মুখে সমস্ত কথাটি মন দিয়ে শুনে বলেন, আরে বাঃ! সবই তো বুঝে ফেলেছেন কাকা! বুঝবেনই তো— অভিজ্ঞ মানুষ! পৃথিবীকে কতদিন যাবৎ দেখছেন। আচ্ছা চলি। কেষ্ট—

বলতে যা দেরী, কোথা থেকে যেন লাঠি ঠকঠকের শব্দ, তার সঙ্গে একটি ভাঙা গলার ডাক এগিয়ে আসে, এই যে বড়খোকা, এলি?

আটান্ন বছর বয়েসের মহিম হালদারকেও এখনো 'বড়খোকা' বলে ডাকবার লোক এই গোপীচন্দনপুরে আছে বেশ কিছু। সত্যঠাকরুণ তাঁদের মধ্যে অন্যতমা, অথবা জ্যেষ্ঠতমা।

পঞ্চনন্দতলার গলি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। মহিম বললেন, কেষ্ট, রিক্‌শা থেকে একটু নামি রে—প্রণামটা করি।

কেষ্ট ব্যাজার গলায় বলে, তা'লে আমায় ছেড়ে দ্যান বাবু। ও বুড়ি কি আপনারে পেলে সহজে ছাড়বে। কথার জাহাজ।

তা সেটা একটা ভয় বটে।

মহিম গলা বাড়িয়ে শরীরটা ঝুঁকিয়ে বলেন, আরে ঠাকুমা। অনেকদিন দেখি না-! এখনো আপনি একা একা রাস্তায় ঘোরেন ?

সত্যঠাকরুণ ভাঙা ফাটা গলাতেই খলখলিয়ে হেসে ওঠেন, একা ঘুরব না তো কোন্ পীরিতের সখা আমারে হাত ধরে নে বেড়াতে বেরোবে রে ? দোকা হবো সেই সেদিন, যেদিন যম এসে গলা ধরবে। তো তোর খবরটা কী রে নাতি ?

মহিম হেসে বললেন, খবর উত্তম। এই অনেক দিন বাদ আপনার সঙ্গে দেখা হলো।

সত্যঠাকরুণ আরো দু'পা এগিয়ে এসে বলেন, হ্যাঁ, অনেকদিন আর তোদের ওদিকে যেতে পারিনি। তা লবকার্তিক হে, তুমি তো ডুমুরের ফুলটি। এখনো অব্দি শনিবারের বাবু' মনে আশা ছিল, রিটায়ার হয়ে ঘরে আসছিস, অ্যাখন ইচ্ছেমতন সময়ে গেলেও দ্যাখা হবে। তো ই কি শুনছি ?

মহিম একবার কেষ্টর দিকে তাকান, অস্বস্তি বোধ করেন। সবকিছুর শ্রোতা হয়ে দিব্যি মজা পাচ্ছে ব্যাটা।

একটু অগ্রাহ্যের গলায় বলেন, কী শুনছেন ?

এই রিটায়ার হয়েও নাকি ঘরে এসে বসবি না ? কলকেতায় থাকবি ?

উঃ ঠাকুমা, এখনো এসব ফালতু কথা নিয়ে মাথা ঘামান ? আপনার গোপাল-গোবিন্দরা কোথায় গেলেন ? তাদের নাম জপুন না ?

ও আমার মাস্টারমশাই ! বলি দিনে রাতে তো চব্বিশটা ঘণ্টা ! কত নাম করবো, অ্যা ? তাঁদেরও তো দু'দণ্ড শান্তিতে ঘুমোতে দেওয়া দরকার। যাক যা শুদোলাম তার জবাবটা দে ? কথাটা সত্যি ?

মহিম হেসে উঠলেন, আপনাকে যারা বলেছে, তারা কি আর মিথ্যে খবর দিয়েছে ঠাকুমা ?

অ ! বুঝেছি ! খবর তা'লে মিথ্যে নয় ?

বুড়ি আবার খলখলিয়ে হেসে ওঠেন। তা বলি, আসল ঘটনাটা কী মাণিক ? কলকেতায় আর একখানা ঘরসংসার ফেঁদে বসে নেই তো ? বেটাছেলেকে বিশ্বাস নেই শালা।

নাঃ ! ব্যাটা কেষ্টটার কাছে আর মানসম্ভ্রম বজায় থাকছে না। বুড়োবুড়িদের এই একটা দোষ, কার সামনে যে কী বলতে আছে আর নেই, সে বোধ নেই।

তা মান বজায় রাখতেই হা হা করে হেসে উঠতে হয় মহিমকে।

ঘরসংসার! যে প্যাচটিতে পড়বার ভয়ে চিরকাল পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছি হাসালেন ঠাকুমা।

বুড়ি ফাটা গলাকে কিঞ্চিৎ জোড়ার চেষ্টা করে বলেন, অ! বুঝলুম, তা তুমি তো চাঁদ পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে জীবন কাটালে। এখনো সেই ভাল! বলি বৌটা?

বৌটা? কোন্ বৌটা? ও হো হো হো! হালদারবাড়ির বড়গিন্নির কথা বলছেন? কেন? তাঁর হঠাৎ কী হল? তিনি তো তাঁর ঘরসংসার, পরিবার-পরিজন, গরু-বাছুর, বাগান-পুকুর, রান্নাঘর-ভাঁড়ারঘর নিয়ে দিব্যি দাপটে রাজ্য চালাচ্ছেন।

শোনো কথা শালার! চালাবে না তো কি তোর মতন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে সখী সেজে বেড়াবে?

উঃ! অসহ্য! মহিম তাড়াতাড়ি বলেন, আচ্ছা ঠাকুমা, পরে দেখা হবে। এখন চলি। কেষ্টধন, চল বাবা।

কিন্তু চলি বললেই কি অবাধ চলার উপায় আছে? এখন যে সারা পাড়ায় মহিম হালদারই একমাত্র প্রশ্ন। তাকে হাতে পেলে এতহাত না নিয়ে ছাড়বে কেউ? হাতে পাচ্ছিল না তাই—

একটু চলেই আবার ব্রেক কষতে হলো কেষ্টকে।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় বাইরের দাওয়ায় বসে শশাঙ্ক মাছ ধরার সুতোয় মাঞ্জা দিচ্ছিল। এটি শশাঙ্কর শনিবার বিকেলের অবধারিত কর্ম। শশাঙ্ক ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে এবং শনিবার দিন অফিস থেকে ঘণ্টাখানেক সময় হাতিয়ে দেড়টার গাড়িটা ধরে বাড়ি চলে আসে। আসার পর চা-মুড়ি খেয়েই বসে যায় পরদিন ছিপ নিয়ে বসার ব্যবস্থা করতে। একাধিক ছিপ আছে শশাঙ্কর, বঁড়শি তো দশাধিক। মাছ ধরার ভাজা মশলা ছাড়াও কেঁচো, পিঁপড়ের ডিম, পান্তা ভাত, এসব মজুত করে ফেলে সকালের জন্যে।

রিক্‌শার শব্দ শুনেই শশাঙ্ক গলা বাড়িয়ে দেখল, আর চেঁচিয়ে উঠল, কেষ্ট, গাড়ি থামা!

কেষ্ট অগত্যাই বেজার মুখে রিক্‌শা-সাইকেলে প্যাডেল করতে করতে বলে, আপনার আজ্ঞে রেশকো চাপার কোনো মানে হয় না হালদারবাবু। ঘরে পৌঁছুতে সেই বেলা পার হয়ে যাবে!

শশাঙ্ক মহিমের হামাগুড়ির বয়েসের বন্ধু। পাশের জ্ঞাতির ছেলে, দুটোকেই এক উঠোনে ছেড়ে দিত তাদের মায়েরা, ছোট-মোট একটা তত্ত্বাবধায়িকাকে বসিয়ে রেখে।

পড়েছেও একই স্কুলে এবং কলেজেও একসঙ্গে বছরখানেক। তারপর শশাঙ্ক সেই

হাওড়া কলেজেই থেকে গেছল, মাহম জেদাজিদি করে কলকাতার কলেজে পড়তে চলে গিয়েছিল দিদিমার কাছ থেকে। তা যাক, বন্ধুত্বটা বজায় ছিল। এখনও আছে। হয়তো এই থাকাটা মোটামুটি শশাঙ্কর গুণেই। সে পাড়ার আর সকলের মত মাহমকে সমীহ করে, দূরত্ব রেখে কথাটথা বলে না। আর বিদেশ-বিদেশ ভাবও পোষণ করে না।

মহিমের এই সাজসজ্জা, আত্মপ্রেমী ভাব, একটু নাটকীয় ভঙ্গী, ঘরসংসারের প্রতি ঔদাসীন্য, বিষয়-আশয়-টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনায় তুচ্ছ বোধ এগুলো বিশেষ কেউই সুচক্ষে দেখে না। মহিমের নিজের ভাইই তো বেশ করে দেখে না। শশাঙ্ক ঠিক তেমনটি নয়, ও এসব নিয়ে মাহমকে ঠাট্টা করে বটে, তবে তাতে ব্যঙ্গের হুল থাকে না।

শশাঙ্ক আর মাহম একই বয়সী, তবে অঙ্কের খাতায় বয়েস লেখানোর সময় কিছুকিঞ্চিৎ কারচুপি থাকার ফলে শশাঙ্ক এখনো চেয়ারচ্যুত হয় নি। আরো বছর দেড়েক থাকার আশ্বাস রয়েছে।

কেষ্ট গ্যাড় থামাতেই শশাঙ্ক বলে উঠল, এই যে নবাব বাহাদুর এলেন! বাল এটুকু আর চরণগাড়িতে আসা যায় না?

মহিম হাস্যবদনে বলেন, যাবে না কেন? তবে সবাই তাই যাওয়ালে এরা যে বেকার হয়ে যাবে!

ওঃ! তত্ত্বজ্ঞান! তো যা শুনছি, তা সত্যি?

কী শুনেছিস তাই তো জানি না!

জানিস না? ন্যাকা ওস্তাদ! কেন, সব্বাই তো বলছে তুই নাকি কলকাতাতেই থাকবি। মেসের ঘরটা ছাড়বি না।

কী ব্যাপার বল্ তো শশা? মহিম হালদারের মত একটা তুচ্ছ লোক কী করবে না করবে, এ নিয়ে সবাই মাথা ঘামাচ্ছে! কারণটা কী?

তুচ্ছ লোক বলে বেশি বিনয় করার দরকার নেই। নিজেকে তুই যথেষ্ট 'উচ্চ' বলেই মনে করিস, আর সেই জন্যেই আমাদের মত তুচ্ছদের সঙ্গে বাস করতে নারাজ।

বাঃ! তবে তো সবাই সব বুঝেই ফেলেছিস। আর প্রশ্ন কেন?

মহিম, তোর এই ডিসিশনটা ঠিক হচ্ছে?

নিজে এখনো ভেবে দেখিনি, ঠিক হচ্ছে কিনা।

হুঁ। আচ্ছা ঘুরে আয়, পরে কথা হবে। জানিস, এতে তোর নামে নিন্দেয় ছি-ছিক্কার পড়ে যাচ্ছে?

তাই বুঝি। তবে তো চিন্তার বিষয়। আচ্ছা আসছি। কেষ্ট! চল বাবা—

এক দেয়ালের জ্ঞাতি শশাঙ্ক আপাতত নিজভূমিতে নেই। মাছ ধরার অন্তরঙ্গ সঙ্গী দ্বিজু কামারের দাওয়ায় বসে সুতোয় মাঞ্জা দিচ্ছে। মাছ ধরার সরঞ্জাম তার এখানেই থাকে।

মাছ ধরা সংক্রান্ত যে-কোনো ব্যাপারই শশাঙ্কর বৌ দু'চক্ষের বিষ দেখে, এইসব কর্ম করতে বসলেই রসাতল করে এবং রীতিমত শাসিয়ে রেখেছে, সুযোগ পেলেই একদিন ওইসব সরঞ্জাম ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেবে। অতএব এই সাবধানতা। মহিমের এটি জানা।

বাকি রাস্তাটুকু আসতে আসতে মহিমের চোখে কেবলই ভাসতে থাকে শশাঙ্কর দ্বিজুর দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা চেহারাটা। পরনে একটা তেলচিটে লুঙ্গি, কাজের সুবিধের জন্যে পেটের ওপর বড় করে গিঁট দিয়ে উঁচু করে পরা, তার নীচে থেকে শিরাওঠা ঠ্যাঙা ঠ্যাঙা ধুলোমাখা খালি পা দুটো চক্ষুশূলের মত দৃশ্যমান। গায়ে একটা তেমনি ময়লা হাতকাটা গেঞ্জি, বুকে-পিঠে বেশ কিছু জানলা-দরজা। মুখের রেখায় রেখায় একটা কৃচ্ছ্রসাধনের ছাপ।

মনটা খারাপ লাগছে মহিমের। শশাঙ্কর বাড়ির অবস্থা যে বিশেষ খারাপ তা তো নয়। চাকরিটাও খুব খারাপ নয়। বড় মেজ দুটো ছেলেই তো আয়-উপায় করছে। বড় এই 'গোপীচন্দনপুর মাধ্যমিক স্কুলে'র সেকেণ্ড মাস্টার, মেজ ছেলে দুর্গাপুরে না কোথায় কাজ পেয়েছে। আরো দুটো ছেলে লায়েক হবো-হবো। বছর-প্রসবিনী বৌয়ের এই অবদান এখন শুভফল দিচ্ছে। মেয়েও আছে গোটাতিনেক, তা তারা নীচের দিকে। তাদের জন্যে এক্ষুনি ভাবতে বসার দরকার নেই, এখনো ফ্রকের গণ্ডিতে আছে। শশাঙ্কর চেহারা তো এমন দারিদ্র্যগ্রস্ত হবার কথা নয়। তবে দেবযানীর মুখে শুনেছেন মহিম তার ওই জ্ঞাতি খুড়শাশুড়ীটি যেমন খাণ্ডার, তেমনি কিপটে।

অথচ এই শশাঙ্কও বয়েসকালে কম শৌখিন ছিল না। মহিমের মত সর্বদা টিপ্‌টপ্ না হলেও, জামা-জুতোয় দৃষ্টি ছিল যথেষ্ট। শখ ছিল খেলা দেখতে যাওয়ার, সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাওয়ার, গানের জলসা-টলসা শুনলেই উসখুস করার। কলেজে থাকতে কত সময় মহিমের সঙ্গে যুক্তি করে চলে গিয়েছে এখান সেখান। তারপর অবশ্য দু'জনের জীবনযাত্রা প্রণালী দু' ছাঁচে ঢালাই হয়ে গেছে।

বাড়ির দরজায় এসে গেছেন। সাইকেলরিক্‌শা থেকে নেমে পড়েন কেষ্টকে এক টাকার জায়গায় পুরো দু' টাকার নোটটা দিয়ে। শশাঙ্কদের দেয়ালটা চোখে

পড়তেই, শশাঙ্কর চেহারাটাও আর একবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বাড়ির চেহারার সঙ্গে সে চেহারার সামঞ্জস্য আছে। আর সেই তুলনাটা মনে উঠতেই একটা কাল্পনিক ভয়ের ধাক্কায় হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল মহিমের।

মহিমও যদি দেবযানীর অভিমান অভিযোগের ধাক্কায় এদের ওদের মত তেলি প্যাসেঞ্জারীর গাড্ডায় পড়ে যেতেন, হয়তো শশাঙ্কর মতই হয়ে যেতেন। অনায়াসে তেলচিটে লুঙ্গি আর টুটাফুটা গেঞ্জি পরে রাস্তার ধারে বসে—

প্রায় শিউরে উঠতে গিয়েও থেমে গেলেন মহিম। শুধু শশাঙ্ক বা এ-ও-সে কেন, মহিমের নিজেরই ভাই প্রতাপই বা কী? লুঙ্গি গেঞ্জি পরতে ছাড়ে? না সেই বেশভূষায় সারা গ্রাম চষে বেড়াতে ছাড়ে?

তবে বাড়ির হেড-এর সর্বক্ষণ পরিষ্কার বাতিক, তাই রক্ষে। দেবযানীর তীক্ষ্ণ তদারকীর ফলে ময়লা পরতে পায় না, ছেঁড়াও না।

প্রতিদিন সকালে দেবযানীর কাজ হচ্ছে—ক্ষুদুর মাকে মুঠো মুঠো গুঁড়ো সাবান দিয়ে আর বাড়ির সমস্ত কাপড়-চোপড় গুনে দিয়ে পুকুরে পাঠানো, এবং তারপর আবার সেই কাচাগুলোকেই টিউবওয়েলের জলে ফের ধুইয়ে উচিতমত ভাবে রোদে দেওয়ানো। সংসারের সদস্য-সংখ্যা তো কম নয়। কাজেই শুধু কাপড় কাচা, ঘর মোছার জন্যেই আলাদা একটা লোক আবশ্যক।

সংসারের সবকিছুর ওপর প্রখর দৃষ্টি দেবযানীর, কোথাও না ধুলো-ময়লা থাকে, কেউ না ময়লা জামা-কাপড় পরে, কারুর ঘরেই না বিছানাপত্র মলিন মূর্তি নিয়ে পড়ে থাকে। বাসনপত্রও যেন আয়নার মত ঝলসায়। শুধু নিজের সম্বন্ধেই কেমন একটা ঢিলেমি, গা-ছাড়া ভাব। সাজসজ্জা, আচার-আচরণে মনে হয় সাধারণ নারীধর্মে চেহারাটাকে বয়েসের নীচের দিকে টেনে রাখবার চেষ্টা না করে, বয়সের ওপরদিকে ঠেলে তোলবারই চেষ্টা দেবযানীর।

এটা কেন?

এ কি স্বভাবগত ঔদাসীন্য, না গৃহিণীত্বের মর্যাদা রক্ষার আভিজাত্য? এ প্রশ্ন আসে মহিমের মনে।

রিক্‌শার ঠুনঠুন শোনামাত্রই নানা বয়েসের আধ ডজন ছেলে-মেয়ে দরজার কাছে ছুটে চলে এল, জেঠু এসেছে! জেঠু এসেছে! এতক্ষণে এল জেঠু! ও জেঠু, কী এনেছ? জেঠু, আমার রং-পেন্সিল এনেছ?

হ্যাঁ, সকলেরই 'জেঠু'। কেউই বলছে না 'বাবা'।

অতএব বোঝা যাচ্ছে মহিমের মেসের মুরারি মুস্তফী, নিশিকান্ত ঘোষাল কোম্পানী

'যা শুনেছে' তা সঠিক নয়। শুনেছে, 'বাড়িতে নাকি একপাল ছেলে-মেয়ে।' তবুও এমন নবীন যুবক ভাব, এর পরিপ্রেক্ষিতেই ওই ছেলে-মেয়ের সংখ্যার প্রসঙ্গ।

ওদের শোনাটায় একটু ভুল এই, বাড়িতে ছেলেমেয়ে একপাল থাকলেও এবং মহিমের প্রতিপাল্য হলেও, মহিমকে 'বাবা' ডাকতে কেউ নেই। নিঃসন্তান দেবযানী ভাশুরের এই রেজিমেণ্টটিকে অপত্যস্নেহে মানুষ করে চলেছেন। কে জানে সহজাত স্নেহক্ষুধায়, না চিররুগ্ন জননীর ছেলেমেয়েগুলোর প্রতি করুণা? না বড়র মহিমা বজায় রাখতে? শুধু করুণায় এমন প্রাণপাত সম্ভব?

কে জানে!

ঢিলেঢালা সাজ, সদা কর্মব্যস্ত, অথচ সদাহাস্যমধুরা দেবযানীকে যেন ঠিক বোঝা যায় না। কখনো মনে হয়, নেহাৎই সাদামাটা ঘরসংসারী মেয়ে, যেন যুক্তাক্ষর-বর্জিত সরল পুস্তকের পড়ে ফেলা পৃষ্ঠার মত। দ্বিতীয়বার পড়ার দরকার হয় না। তাতে নতুন কোন অর্থ আবিষ্কার হবে না।

আবার কখনো মনে হয়, সবটাই বুঝি ওর ছদ্মবেশ। ওই হাসির অন্তরালে একটা অনাবিষ্কৃত জগৎ আছে, যেটা ধরাছোঁওয়ার বাইরে।

আর কেউ এত বিশ্লেষণ না করুক, দেবযানীর ভাগ্নী করে। আর আড়ালে বলে, মামীকে তোমরা বোঝ না বাবা, মামী হচ্ছে গভীর জলের মাছ।

রিক্‌শার সাড়া আগেই জানান দিয়েছিল। তবে ছেলেমেয়েদের কল-কোলাহলেই যেন টের পেলাম, এইভাবে ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল প্রতাপ। এবং বেরিয়েই ওই কোলাহলরতদের প্রতি প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠল, এই বদমাশরা, কী হচ্ছে কী? যা পালা! জেঠু তেতেপুড়ে এল, আর তোরা এক্ষুনি—

মহিম তাড়াতাড়ি বলেন, কী মুশকিল! তেতেই বা কেন, পুড়েই বা কেন? বেশ ভালই তো এলাম। আয়, চল্ ভেতরে যাই।

সাবেককালের পদ্ধতিতে দালানে একখানা ঢাউশ চৌকি পাতা আছে, চোরের মার খাবার মত। সারা সংসারের যাবতীয় কর্মযজ্ঞের কিছু না কিছুতে সে বুক পেতেই আছে।

সকালে এর ওপরই প্রতাপ এবং তস্য পরিবারের প্রাতঃরাশের আসর বসে। সে পাট মিটলে চৌকিকে উত্তম করে মোছা হয়, অতঃপর তার ওপর যে শিশুটি তখনো কাঁথায় শোয়া অবস্থায়, তাকে শোয়ানো হয় আশপাশে বালিশ ঠেকিয়ে এবং তার মা, অর্থাৎ প্রতাপগিন্নী তার কাছাকাছি বসে রোদ পোহানোর কালে রোদ পোহায়, আর

হাওয়া খাবার কালে হাওয়া খায়। দালানের দেওয়ালে জানলার প্রাচুর্য আছে।

দুপুরবেলা আবার এই চৌকিই মহিলাদের দিবানিদ্রার পীঠস্থান। (অবশ্য দেবযানী বাদে। দেবযানী নামের মহিলাটি দিবানিদ্রার কথা ভাবতেই পারে না।)

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেই, এই চৌকিতেই বসে বৈকালিক চুল বাঁধার আসর। এ আসরে শুধু যে প্রতাপের বৌ-মেয়েরা বা বাড়ির আর কেউরা এসে জোটে তা নয়, পড়শীদের বৌ-মেয়েরাও এসে জোটে। বরং তাদেরই অগ্রাধিকার। কারণ কেশবিন্যাসকারিণী হচ্ছে ভাগ্নী তার মতে ওদের বয়সে রেখে বাড়ির লোকের কেশবিন্যাসে হাত দেওয়া গর্হিত, অভদ্রতা।

তা তার এই অভিমতের ওপর কথা চালাবার সাহস স্বয়ং দেবযানীরও নেই। ভাগ্নীর মা'র তো নয়ই।

এই প্রসাধন পর্বের পর আর একবার চৌকিকে ঝাড়ামোছা হয়, অতঃপর ছেলেমেয়েরা পড়তে বসে। তখন তার ওপর শেতলপাটি পড়ে।

শনিবারে শনিবারে এই প্রসাধন পর্বটিকে একটু শর্টকাট করা হয়ে থাকে, বেলা-বেলিই ঝাড়ামোছায় তকতক করে শেতলপাটি বিছিয়ে রাখা হয়। মহিম আসেন।

আজও মহিমের সেই একই পদ্ধতিতে আবির্ভাব। শুধু রাস্তায় মাঝে মাঝেই ঠেক খেতে হয়েছে বলে একটু দেরি হয়ে গেছে। শেতলপাটি বিছানো হয়েছে অনেকক্ষণ।

ভাইপো-ভাইঝিদের ডেকে নিয়ে এসে এই মহাক্ষেত্রটিতে ঘিরে বসলেন মহিম। হাতের পোর্টফোলিও থেকে একে একে বার করতে লাগলেন টুকটাক সব উপহার দ্রব্য।

বাবু, এই তোমার রং-পেন্সল, কুটু, এই তোমার শক্ত মলাটের খাতা, ডলু, এই তোমার চুলের চওড়া ক্লিপ, ভুটান, এই তোমার ড্রইপেন, ছোটন, এই তোমার 'সেন্টেড রবার, আর রাণু, এই নাও তোমার লাল উল আর বোনার কাঁটা। দ্যাখ এই রংটা ঠিক কিনা? হলে পরের শনিবারে বেশী করে এনে দেব।

খুব ঠিক জেঠু, খুব ঠিক। খুব সুন্দর।

রাণু উচ্ছ্বসিত হয়।

তবে তার উচ্ছ্বাসে জল ঢালে তার বাবা। বলে ওঠে, মিটেছে তোমাদের? তা হলে যাও পালাও। দাদা, আমায় একটু সময় দিতে হবে তোমায়। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ভণিতা দেখেই বুঝতে বাকি থাকে না মহিমের কিসের কথা। সবাই মিলে পেড়ে ফেলবার তালে আছে। মনে হচ্ছে বোধ হয় উঠে-পড়ে লাগবে!

আশ্চর্য, সংসারে সবাইকেই ঐক ছাঁচে ঢালাই হতে হবে! একজনেরও কি ছাঁচের বাইরে নিজের মত করে থাকতে ইচ্ছে করতে পারে না? সেই ইচ্ছের স্বাধীনতাটুকু থাকবে না তাঁর?

তাঁর এই পরিবারটিকে কি ভালবাসেন না মহিম? সাধ্যমত কর্তব্যও কি পালন করেন না? সপ্তাহে এই এক-দেড় দিন থাকায় খুবই তো আনন্দ-আহ্লাদ অনুভব করেন, শুধু মুক্তির দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে এইখানেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা ভাবতে গেলেই হৃৎকম্প হয় মহিমের।

কী ভরাট ভারী এই সংসারটি। কতখানি ছড়িয়ে থাকা সীমানা। কত কত জিনিস, কত কাজ, কত নিয়ম-কানুন, বিধিব্যবস্থা! সামান্য এক-একটু অংশই চোখে পড়ে মাত্র, তবু তাতেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে মহিমের।

তবে? কী ক্ষতি যদি মহিম এই ভারী জাঁতার তলায় নিজেকে পিষে ফেলতে না চান?

অথচ সংসার-ক্ষেত্রে সবাই তাঁকে সেই পেষাই হওয়া মূর্তিতেই দেখবে বলে বদ্ধ-পরিকর। যাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো যোগসূত্র নেই, তাদেরও মাথাব্যথার অবধি নেই।

মহিম মনে মনে শক্ত হলেন।

বললেন, কথা আছে? কী কথা? বলেই ফ্যাল না। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে নাকি?

ইচ্ছে করেই কথাকে অন্য পথে চালিত করতে মেয়ের বিয়ের কথা তুললেন মহিম। যদি আপাতত প্রতাপ সেই সমস্যাটাকে আঁকড়ে ধরে।

কিন্তু প্রতাপ তো আর তার দাদার মত কাঁচা ছেলে নয়। প্রতাপ গম্ভীরভাবে বলে, মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে না। সে ভাবনা আমি ভাবতে যাব কেন? ভাবনা ভাবুক মেয়ের জ্যাঠা-জেঠি। ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। বলছি—এবার তুমি সংসারের সব কিছু বুঝেপড়ে নিয়ে আমায় রেহাই দাও। আমি একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

পরে বলব বলেও প্রতাপ বলেই ফেলে। বলে, অনেকদিন থেকে এই দিনটির অপেক্ষা করছি দাদা। কাঁধের জোয়ালটা নামাই।

মহিম প্রমাদ গণেন। তবু মুখে 'সহজ' হয়ে বলেন, আমি আবার তোর এসবের কী বুঝি পতু?

হাসেন একটু।

পতু এ হাসিতে ভোলে না।

গুরুজনের মান রাখা হিসেবে গলায় স্বরের স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষতা একটু কমিয়ে অথচ বেশ দৃঢ়স্বরে বলে, 'বুঝি না' বলে এড়িয়ে গেলে তো চিরকাল চলবে না দাদা। বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। পিতৃপুরুষের এই বাগান-পুকুর, জমিজমা, বাড়ি-ঘর, ঠাকুর-দেবতা, সমাজ-সামাজিকতা, এসবের দায় তো সোজা নয়? আমিই বা চিরকাল পেরে উঠি কী করে?

মহিম মনে মনে এই ভাইটিকে আদৌ সমগোত্র মনে না করলেও আপাতব্যাপারে ভয় পান। হঠাৎ ক্ষীণস্বরে বলেন, তা তুই-ই তো চালিয়ে আসছিস ভাই। কোনো বিশৃঙ্খলাই তো হচ্ছে না।

প্রতাপ একবার একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, সেটা আমার গুণে নয়, বৌদির গুণে।

আহা না হয় বৌদি আর লক্ষ্মণ দেবরের গুণেই হল। আমি এর মধ্যে মাথা গলাতে এলে উল্টোপাল্টাই হবে। যেমন চলছে চলুক না।

পতু অবশ্যই এতে বিচলিত না হয়ে পুলকিতই হয়। কারণ তার মত ওই দাদারই মত। এই স্বচ্ছন্দ ছন্দে আবর্তিত সংসারচিত্রখানির মধ্যে মহিমের মত একটি দিলদরিয়া, বেপরোয়া, অনভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রবেশ ঘটলে ছন্দপতন অনিবার্য!

তবু বলার দিক থেকে ত্রুটি না রাখাই ভাল। পাচজনকে তো বড় গলায় বলতে পারা যাবে, দাদার মতিগতি ফেরাতে কম সাধ্যসাধনা করেছি!

অতএব প্রতাপ হালদার গলার স্বর নামিয়ে বলে, স্বদেশরঞ্জন একটা কথা বলে যাওয়া পর্যন্ত পাড়ায় তো একেবারে—

মহিম হাসলেন, সে তো দেখলাম। পাড়াপড়শীরই মাথাব্যথা বেশি হয়।

তা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

প্রতাপ স্বর আরো নামায়, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে।

মহিম হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। ভাবছিলেন চা-টা, খাবারটা কে আনবে? যদিও নিয়মের অভ্যাসে ভাগ্নীই আনে এবং কম খেলে 'তা বললে শুনব না বড়মামা, একটা খেতেই হবে', বলে জোরাজুরি করে, তবু কদাচ কোনোদিন দেবযানীও আনে। হয়তো বলে, ও ঠাকুরপো, দু'ভাইয়ে হাত চালাও ততক্ষণে, চা আসছে।

শনিবার বিকেলে কিছু না কিছু শৌখিন খাবার বানানো হয় বাড়িতে মহিমের অনারে। হঠাৎ মনে হচ্ছিল, বাড়িতে এসে বসা মানেই তো সপ্তাহ. মাস, বছর সব

দিন একরঙা হয়ে যাবে। অথবা একরঙা নয়, রং-জলা বিবর্ণ। তখন দেবযানী চা আনছে কিনা এই চিন্তাটুকু মনের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য আনবে না।

এই অন্যমনস্কতার মাঝখানে কথাটা কানে এল। বললেন, কে কী বলছে?

প্রতাপ গভীর গম্ভীর গলায় বলে, সে আর আমি ছোট ভাই হয়ে কী বলব?

মহিম ফর্মে এলেন।

হেসে উঠলেন, ও হো হো! সে তো রাস্তাতেই একচোট হয়ে গেছে। সত্য ঠাকুমা রিক্‌শা দাঁড় করিয়ে—হা-হা! পাঁচজনে বলছে, তোরা বলছিস না তো? তা হলেই হলো।

হা-হা-হা।

এই খোলা গলার হাসিটি উঠোন পার হয়ে রান্নাঘর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়। আর আশ্চর্য বেহায়া একটা হৃদয় সেই হাসিতে স্পন্দিত হয়ে ওঠে।

মনটাকে কাঠের মত করে রাখবার প্রতিজ্ঞা ছিল, ছিল পাথরের মত তাপ-উত্তাপহীন করে রাখবার, কিন্তু মানমর্যাদাবোধহীন বেহায়া হৃদয়টা তবু ছুটে যেতে চায় ওই হাসির আসরে কোনো একটা ছুতো করে।

কিন্তু নাঃ, আজ কিছুতেই নয়।

আজ দেবযানী শক্ত হবে। একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে। কিন্তু তার জন্যে তো অপেক্ষা করতে হবে রাত্তির পর্যন্ত!

যদিও সপ্তাহের অন্য বারগুলোয় দেবযানীর বিছানাতেই ললিতার শাবকগুলির আশ্রয়, তবে এই দুটো-একটা রাত প্রতাপ কী ভেবে জোর করে ওদের আটকায়। বলে, না না, দাদা সুখী মানুষ, চ্যা-ভ্যাদের নিয়ে শুতে হলে কষ্ট হবে।

কাজেই রাতটা দেবযানীর হাতে আছে।

তা এখন লোকের সামনে টসকানো চলবে না। অতএব রাণুকে ডাক দেয়, এই রাণু, তোদের জেঠুকে বল্ গে যা দুই ভাইয়ে বসে বসে আড্ডা দিলেই চলবে? হাত-মুখ ধুতে হবে না? চায়ের জল ফুটে ফুটে মরছে! বল্ গে কড়াইশুঁটির কচুরি ভাজা হচ্ছে, জুড়িয়ে যাবে।

বলার পরই মনের মধ্যে একটু তিক্ত বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল দেবযানীর।

চায়ের জলটা ফুটে ফুটে মরে যাচ্ছে, সেটা একটা লোকসান।

কড়াইশুঁটির কচুরি জুড়িয়ে যাওয়া একটা লোকসান।

তা লোকসানটা অবশ্য মহিমের হিসেবের খাতায় এসে পৌঁছল না। গরম চা ও

এল, গরম কচুরিও এল, শুধু যে প্রত্যাশাটি নিয়ে বার বার দরজার বাইরে দৃষ্টিক্ষেপ করছিলেন, সেই প্রত্যাশাটি পূরণ হল না। এই গরমেরা এসে হাজির হল ভাগ্নী-বাহিত হয়েই।

মহিম তখন হাত মুখ ধুয়ে অভ্যস্ত নিয়মে ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে কসা পায়জামা আর পাটভাঙা একটা অর্ডিনারি পাঞ্জাবি পরে বসে তোয়ালে নিয়ে ঘাড়-গলা মুছছিলেন।

ত' মামাকেই খেতে দিয়ে ভাগ্নীও বলে উঠল, বড়মামা, পিসেমশাই যা বলে গেলেন সেটা তা হলে সত্যিই হচ্ছে?

মহিম ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বলেন, 'সত্যি' জিনিসটা দু'রকমের হয় না রে বুড়ি, ওটা একরকমই থাকে।

তার মানে, তুমি --

ঠিক বলেছিস, তার মানে আমি -

• বড়মামা!

ভাগ্নীর কণ্ঠে ঝাঁঝ।

সারাজীবন কলকাতায় থাকলে, তবু কলকাতার সাধ মিটল না তোমার?

মহিমও একটু গম্ভীর হলেন।

হয়তো যে কথাটা অন্য একজনকে বলার জন্যে তৈরী ছিল, সেটাই উচ্চারিত হয়ে গেল।

সারাজীবন কলকাতায় থাকলাম তা তো কই মনে হচ্ছে না! কলকাতাকে দেখলাম কবে?

কলকাতাকে দ্যাখোনি? অ্যা!

কই আর দেখলাম, বল্ তো? অফিস গেছি আর মেসে ফিরেছি, ছুটি হলেই হাওড়া স্টেশনে ছুটেছি, বাড়ি চলে এসেছি।

তবে কি তুমি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে বড়মামা?

মহিম বললেন, তা সেটাই ভাবছি এখন।

অতঃপর দিদি একপালা আক্ষেপ করে যান। বক্তব্য অবশ্য একই। সেই মহিমের 'অনাছিষ্টি' সিদ্ধান্ত। এরপর গুটি গুটি এলেন পাড়ার লোকেরা। জনে জনে সবাই একবার করে মহিমের সৃষ্টিছাড়া সংকল্প নিয়ে বিস্ময়প্রকাশ করলেন, নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত আর একবার ভেবে দেখবার অনুরোধ করে চলে গেলেন।

কিন্তু মহিমও তো কম অনমনীয় নয়।

দেশশুদ্ধ লোকের এই হিতকথার বাড়াবাড়িতেই কি ক্রমেই জেদ বেড়ে যাচ্ছে মহিমের? মনে হচ্ছে, আর ফেরা যায় না!

আর সেই জেদের মনে জলসিঞ্চন করে রেখেছে প্রতাপের ছোট ছেলে ছোটনটা।

চুপিচুপি একফাঁকে বলে গেছে, তুমি কারুর কথা শুনো না জেঠু। কখনো তুমি এইখানে রোজ রোজ থেকো না। কলকাতাতেই থাকবে।

মহিম একটু অবাক হয়ে গিয়েও কৌতুকের হাসি হেসে জিগ্যেস করেছিলেন, কেন বল তো?

এখানে থাকলে যদি তুমি বাবার মতন রাগী হয়ে যাও, বাবার মতন পাজী হয়ে যাও।

ধ্যেৎ, একথা বলতে নেই, ছি! বাবাকে বলতে আছে এসব?

কেন বলব না? বাবা তো ছাই বিচ্ছিরি, কেবল বকে মারে। তুমি একদম-ভগবানের মতন!

একটু চমকে গিয়েছিলেন মহিম।

শিশুর মনস্তত্ত্ব! আর শিশুর সারল্য!

তারপর ভেবেছেন, অনেকগুলো ঝড় তো ম্যানেজ করে ফেলা গেল, এখন আসল আর বড় ঝড়টা বাকি আছে। দেখি কীভাবে ম্যানেজ করা যায়।

তবে কতক্ষণে আসবে সে ঝড়, তা জানা নেই মহিমের।

আগামী সকালের জন্যে কী কী কাজ গুছিয়ে রাখতে হয় দেবযানীকে, সে কথা জানা নেই মহিমের। তবে কাজ যে ওর ফুরোতেই চায় না সেটা জানা আছে।

মহিম হালদার নামের আটান্ন পার করা মানুষটা কি কল্পনা করতে পারবেন, যে মানুষটা এই মাঝরাত্তির পর্যন্ত সংসারের কাজ করে মরছে সেটা তার কাজ নয়, লজ্জা ঢাকবার আবরণ। কী করে মনে করবেন, দেবযানী নামের সেই রগের চুলে রূপোলি ঝিলিক আঁকা, পান খেয়ে দাঁত কালো করে ফেলা, ঢিলে সেমিজ আর কোন্ কাল থেকে সাদা খোলের শাড়ি পরা পরম গিন্নী মানুষটার মধ্যে এখনো নবোঢ়ার লজ্জা। এখনো ভাবতে বসে, সাততাড়াতাড়ি শুতে গেলে লোকে যদি মুচকি হাসে!

অন্যদিন কুচোকাচাদের ডাকাডাকিতে হাতের কাজ ফেলে ছুটে চলে আসতে হয়। আজ তো আর সে প্রশ্ন নেই। তবে কোন্ লজ্জায় খুঁটিনাটি কাজগুলো ফেলে চলে আসবে?

না, একথা ভাবতে পারছেন না মহিম।

ভাবছেন, ঠিকই বলেছি সত্য ঠাকুমাকে। হালদারবাড়ির বড়গিন্নী তার সংসার নিয়েই দিব্যি আছে।

খোলা জানলা দিয়ে শীতশেষের সামান্য হিমেল হাওয়া আসছে, তবু জানলাটা বন্ধ করার ইচ্ছে করছে না।

জানলার বাইরে চোখ ফেলে মহিম ভাবছিলেন, অথচ অতীতে একদা মহিম হালদার নামের একটা সদ্য যুবক, কী মূঢ় আশায় একখানা মেসের ঘরের লাইফ মেম্বার হয়ে বসেছিল অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে।

কাঠখড় তো পোড়াতেই হবে, প্রস্তাবটা তো নিতান্তই অবাস্তব।

পরে অবশ্যই সেই ছেলেমানুষি মূঢ় আশার কথা ভেবে হাসি পেয়েছে, তবু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা ঔদাসীন্যও সৃষ্টি হয়েছে।

উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করার আলস্যে বেডকভারটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপিয়ে পাশ ফিরে শুলেন। সেই মূঢ় যুবাটাকে দেখতে পেলেন।

জীবনের হাটে মস্ত একটা মূলধন ছিল ছেলেটার, সেটা হচ্ছে তার বপু। ছেলেবেলা থেকেই রূপের প্রশস্তি কানে এসেছে এবং সেটা ভিতরে ভিতরে আত্মস্থ ভাবের রসদ যুগিয়েছে।

গোপীচন্দনপুরের হালদার-বাড়িটা কেলে-কুচ্ছিতের বাড়ি নয়, মোটামুটি সকলেই একরকম ভালই দেখতে, মহিমের ছোট ভাই প্রতাপও রঙে দাদার থেকে কম ছিল না। (এখন অবশ্য সেটা 'ছিল'তেই পর্যবসিত হয়েছে।) কিন্তু দাদার মত তিরতিরে মুখ-চোখটি কোথায় তার? চুলের এমন সুবিন্যাস? এমন পাতলা ছিপছিপে বয়েস-ছাড়ানো মাথা-উঁচু গঠনভঙ্গী? হাত-পায়ের আঙুলগুলি পর্যন্ত লম্বা ছাঁদের অথচ মোলায়েম মসৃণ।

তাছাড়া অলঙ্কারের গায়ের পালিশের মত, বাল্যাবধিই মুখে-চোখে কেমন একটি বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। প্রতাপের মুখ-চোখ গোলগাল-গোপাল গোপাল এবং সর্বাবয়বে পালিশটা অনুপস্থিত। তবু বছর বারো-তেরো পর্যন্ত তাকেও কেউ ফ্যালনা করত

না। কিন্তু পরবর্তী সেক্ষেত্রে দেখা গেল, কি জানি কোন কারণে প্রতাপের শরীরের বৃদ্ধির প্রবণতা প্রস্থের দিক ত্যাগ করে শুধু দৈর্ঘ্যের দিকটাতেই।

আর তারপর থেকেই দুই ভাইয়ের চেহারায় বেশ একটি বড় পার্থক্য ধরা পড়তে লাগল। রোগা সিড়িঙ্গে, মুখটাতেও হাড় আর পেশী সার। অতএব লোকের নজর চলে গেল বড় ছেলেটার দিকেই।

আহা বেঁচে থাক, কী রূপটি ছেলের! যেন নদেব গৌরাঙ্গ!...

আবার লেখাপড়াতেও ছোটর মত মাঠো নয়। মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

এমন সব মন্তব্য ছোট থেকেই কানসহা মহিম নামের ছেলেটার।

ছাত্রজীবনে এই চেহারাখানির জন্যেই বন্ধু মহলে তার জন্যে ছিল একটি বিশেষ আসন। এমন কি দিদিমাও তার এই সোনার কান্তি বড় নাতিটিকেই ভি আই পি-র দৃষ্টিতে দেখতেন। সে একটু কিছু নিলে, খেলে দিদিমা কৃতার্থ।

অতঃপর কলেজে পড়ার কালে বছর তিনেক দিদিমার কাছে থাকার ফলে, দিদিমার কাছে জুটেছে অনেক আবদার আহ্লাদ আস্কারা। হাতটা এমন দরাজ হয়ে যাওয়ার বদভ্যাস সেই বুড়ির যোগানদারিতে এই মেজাজী নাতিটিকে তোয়াজ করাটাই যেন জীবনের সারসত্য ছিল বুড়ির।

মেজাজী, তবে বদমেজাজী নয়।

বলতে পারা যায় 'মানী'।

তাই যখন নবদুর্গা মেসের প্রতিষ্ঠাতা মালিক শিবরব ঘোষ মদগর্বচালে বলেছিল, 'দোতলার ঘরটা? ওর ডবল চার্জ!'

তখন ভিতরে ফুঁসে ওঠা ওই ছেলেটা মুখে শান্ত ভাব দেখিয়েই বলেছিল, আপনাকে কেউ জানিয়ে গেছে, সেই চার্জটা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়?

একটু বে-কায়দায় পড়ে গিয়ে শিবরব ঘোষ মিহি গলায় বলেছিল, না, আসলে ওটা আমার নিজের দরকারেই রাখব ভেবেছি।

মহিম ততোধিক মিহি অথচ মাজা গলায় বলেছিল, এটা যে আবার হঠাৎ একটা নতুন কথা হলো ঘোষমশাই! এই ডবল চার্জের কথা তুললেন!

মানে, ওটা আর কি, এড়াবার জন্যে বলা—

কোনটা যে এড়াবার জন্যে বলা, তা তো বুঝতে পারছি না ঘোষমশাই, একটু পরিষ্কার হোন।

অতঃপর বেচারীকে 'পরিষ্কার' হইয়েই ছেড়েছিল ছোকরা।

'ডবল চার্জ' বলে ওঠার পরও যখন ছেলেটা পিছিয়ে না গিয়ে জোর তলবে

এগিয়ে এল, তখনই শিরিষ ঘোষের মাথায় খেলে গেছে মোচড় দিলে আরো বাড়তে পারে। শেষ পর্যন্ত নীচের তলার সীটের আড়াই গুণ চাজে রাজী হয়ে তৎক্ষণাৎ টাকা জমা দিয়ে রসিদ পকেটে ফেলে তবে শান্তি মহিমের। শিরিষ ঘোষের 'নবদুর্গা'য় এমন খানদানী মেজাজের মেম্বার আর কে আছে? তদুপরি এমন খানদানী চেহারার? যে ক'টা আছে, সবকটাই তো ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার, আধলায় মরে বাঁচে, আর চেহারা ও রাশির মাপ।

দোতলায় তখন মাত্র ওই একটাই ঘর উঠিয়েছে শিরিষ ঘোষ, বাকটা খোলা ছাদ। কাজেই বাথরুমের ব্যবস্থা ওই ঘরটার লাগোয়া, এক ছাদের নীচে। দেখে মোহিত হয়ে গেল যুবক মহিম। তখনো অবশ্য জলের পাইপ বসেনি। তা হোক, বসবে তো?

ঘরের চাবিটি হস্তগত করে নিশ্চিন্ত হয়ে ওপরে উঠে এসে যেন বিহ্বল হয়ে গেল মহিম। 'কলকাতার মেস' সম্পর্কে বাড়িতে বাপ-জ্যাঠা এবং পাড়ার লোকেরাও অনেক বিভীষিকা দেখিয়ে দেখিয়ে মহিমকে মেসে থাকার সংকল্প নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছে, মহিম তথাপি সংকল্প ত্যাগ করেনি। মহিম তার একটি বন্ধুকে বলেছিল, কেন জানিস? পয়লা রাত্তিরেই বেডাল কাটতে হয় বলে। একবার ডেলি প্যাসেঞ্জারীর গাড্ডায় পড়ে গেলে কি আর উঠতে পারব? তার মানে চিরজীবনের মত এই গোপীচন্দনপুরে দাসখৎ লিখে দেওয়া। সেই হালদার-গুষ্ঠীর সবাই মিলে এক ডাব্বায় 'জাবনা' খেয়ে এক পদ্ধতিতে জাবর কেটে চলা, এক পয়সায় মরা-বাঁচা, আর অকালে বুড়িয়ে যাওয়া। বাপস্! নাঃ বাবা!

কলকাতায় তুই এমন আলো-বাতাস খোলা-মেলা পাবি?

ওগুলো শুধু বাইরে পেলেই হয় না রে, মনের মধ্যেও পাবার জিনিস। এতো খোলা-মেলা আলো-বাতাসের মধ্যেও তো দেখি সব এক-একটি কূপমণ্ডুক।

'নবদুর্গা'র এই ঘরটা দেখে তাই বিহ্বল হয়েছিল মহিম। মনে হয়েছিল—কি জানি, সত্যিই নিজের ব্যবহারের জন্যে ভেবেই বানিয়েছিল কিনা শিরিষ ঘোষ। ঘরের মেজেটা লাল সিমেন্টের, জানলাগুলোয় 'পাখি' 'খড়খড়ি' আর সর্বোপরি দক্ষিণে একচিলতে কোণাচে মত বারান্দা, যেটার শেষ কোণটায় দাড়ালে আশপাশের 'ইটের পরে ইট'-এর নিবিড় আড়ালের মাঝখান থেকে অলৌকিক একটা খাঁজের মধ্যে দিয়ে গলির বাইরের বড় রাস্তাটার একটু টুকরো দেখা যায়।

পরে অবশ্য এই এল্ শেপ দোতলা জুড়ে অনেকগুলো ঘর হয়েছে, ব্যয়বৃদ্ধি

বেড়েছে মেসের, কিন্তু ওই দক্ষিণের দাক্ষিণ্যটুকু রয়েই গেছে এই ঘরটায়।

সে যাক, সে তো পরে।

সেদিন সদ্য চাকরি পাওয়া সদ্য যুবক মহিম হালদার পুলকিত চিত্তে ভেবেছিল, মেসের নামে এতো নিন্দে, অথচ তার মধ্যে এমন ঘরও থাকতে পারে!

কিন্তু সেখানেই পুলকের শেষ হয়নি, রোমাঞ্চ লেগেছিল আর একটা দৃশ্যে। পশ্চিমের দেওয়ালের জানলাটা খুলতেই দেখল, ওটা জানলা-কাম-দরজা। ওপর-নীচে দু-ভাগে পাল্লা থাকলেও, জানলার শিকগুলোর জায়গায় একখানা কোলাপ-সিবল্। আর তার বাইরে গোটা দুই-তিন সিঁড়ির ধাপ। এবং সে ধাপ গিয়ে ঠেকেছে একটুখানি নীচু ছাদে। তার মানে রান্নাঘরের ছাদটার সঙ্গে ঘরটাকে একটু লাগোয়া করে রাখা হয়েছে।

অর্থাৎ এই দরজাটি খুলতে পারলেই বাড়তি আর একটু খোলা হাওয়া। যদিও সেই ছাদটা ভর্তি তখন মজুর-মিস্ত্রীদের কড়া বালতি হ্যানোত্যোনো জমানো ছিল এবং তাদের আশপাশে ছিল কয়লাগুঁড়োর গুল শুকোতে দেওয়া, তবু জায়গাটার মূল্য বুঝতে পারা অসম্ভব হয়নি। তবে হঠাৎ আর একটা চিন্তা দেখা দিল, ছাদটায় যেতে-আসতে কি এই ঘরটাই ব্যবহার করা হবে নাকি?

ঘোষমশাই তখন ঘরের অন্য জানলাগুলো খুলে খুলে দেখছেন নতুন রঙে আটকে গেছে কিনা। মহিম বলল, ঘোষমশাই, এ দিকটা কী?

ঘোষমশাই ঈষৎ অপ্রতিভ হলেন, বলেন, ও কিছু না, ওর জন্যে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না, কোলাপসিবেলে তালা-চাবি মারাই থাকে। ইচ্ছে করলে আপনিও এদিক থেকে একটা লাগিয়ে রাখতে পারেন লোহার চেন দিয়ে।

না না, সে কথা বলছি না, বলছি ওই ছাদটাতে তো আপনাদের কাজ-কর্ম হয়, তা আসা-যাওয়া হয় কি এই ঘর দিয়েই?

জিভ কাটলেন শিরিষ ঘোষ, না না, ইস! খদ্দেরকে ডিসটার্ব করে? ওর আলাদা এনট্রেন্স আছে। আচ্ছা দেখে নিন স্বচক্ষে।

ফতুয়ার পকেট থেকে একগোছা দড়িবাঁধা চাবি বার করে ঘোষ দরজাটা খুলে ছাদে উঠে বললেন, এই যে আসুন—

মহিম নেমে গেল, দেখল।

দেখল ন্যাড়া ছাদের ও-প্রান্তে নেহাতই কাদা খোঁচা সুরকি গাঁথুনি একটি রেলিঙের বালাইহীন ছোট সিঁড়ি নেমে গেছে, যার শেষ পদক্ষেপ রান্নাঘরের পাশের সরু প্যাসেজে। এর অনতিদূরেই বাসন মাজার জায়গা, কল চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার

পাশেই খিড়কিদ্বার। এই সিঁড়ি প্যাসেজ আর খিড়কিদ্বার যেন মহিমকে একটি সম্ভাবনাময় জীবনের পথ দেখিয়ে দিল। মহিম সিঁড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল একটুক্ষণ।

শিরিষ ঘোষ কী ভেবে ব্যস্ত গলায় বলল, এই দিক দিয়েই আমার যা দরকার-টরকার মানে ওই পিছনেই আমার বাসা, ফ্যামিলি নিয়ে থাকা, কাজেই নিরাপদের কোনো অভাব হবে না আপনার।

সে নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না ঘোষমশাই, ভাবছিলাম এদিকে যখন একটা এণ্ট্রেন্স রয়েছে এই ঘরখানাকে আপনি ইচ্ছে করলে একটা শেপারেট বাসাগোছের—

বাসাই বলেছিল। 'ফ্ল্যাট' শব্দটা তখনো তেমন বাজারচলতি হয়নি।

কথাটা ঘোষমশাইয়ের মাথায় যে ঠিক ঢুকলো ত, মনে হলো না, তবে তিনি প্রসঙ্গ বিশদ না করে বললেন, সবই তো টাকার খেলা!

এই পরিস্থিতির সুযোগেই মহিম একটু 'টাকার খেলা' দেখিয়ে বসল। নব-দুর্গা মেসের 'লাইফ মেম্বার' হতে চাইল।

মেসবাড়িতে লাইফ মেম্বার!

এমন অনাসৃষ্টি কথা জীবনে শোনেননি শিরিষ ঘোষ। তবু বারবারই শুনতে হলো তাঁকে। উপর্যুপরি! আর শেষ পর্যন্ত সেই সৃষ্টিছাড়া ব্যবস্থাটি ঘটিয়েই ছাড়ল এই সৃষ্টিছাড়া ছেলেটা। ছেলেই তো, এখনো যখন বিয়ে হয়নি।

খানিকটা কাঁচা টাকা পাওয়া যাচ্ছে।

শিরিষের দোলায়মান মনটা কিছু যুক্তি খাড়া করে নিল। লাইফ মেম্বার! লাইফ ভোর তুমি মেসে পড়ে থাকবে! বে-থা করবে না? সংসারী হবে না? যদ্দুর মনে হয়, ভালো ঘরের ছেলে, অভাব-অনটন নেই, হয়তো মা-বাপের সঙ্গে কোন কারণে মনান্তর মতান্তর হয়েছে তেজ করে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছো মাণিক, চিরকাল মেসে থাকব বলে। ওই যে ছেলেদের এখন এক ফ্যাসান হয়েছে, 'বে করবো না,' হয়তো সেই নিয়েই জিদের লড়াই। যাক গে মরুক গে, আমার কী! নিয়মিত ভাড়া দিলেই হলো।

ব্যস! সেই থেকেই স্থিতি!

বে-থা যখন করেছে শিরিষের নবদুর্গা মেসের খানদানী বোর্ডার, শুধিয়েছে শিরিষ, কী মশাই, বে-টে তো করলেন? এখনো মেসের ঘরে পড়ে থাকবেন?

মহিম খুব অমায়িক গলায় বলেছিল,আপনার এখানে যাঁরা থাকেন, তাঁরা সবাই ব্যাচিলার?

শিরিষ জিভ কেটেছিলেন।

কথা ঘোরাতে পথ পাননি।

অতঃপর শিরিষ ঘোষের এই এল্ শেপ দোতলায় আরো অনেক ঘর উঠেছে, মেম্বার বেড়েছে, প্রথম যুগের থেকে সিটরেন্টও বেড়েছে, এবং বিবেচনাসম্পন্ন মহিম হালদার তদনুপাতেই আড়াই গুণটিকে বজায় রেখে চলেছেন।

শিরিষ ঘোষ ভাবতেন, কিছু রহস্য আছে, নচেৎ নাকের গোড়ায় 'দেশ, মানুষ, ঘর-সংসার' ছেড়ে বাইরে পড়ে থাকে? রহস্য না থাকলে? অথচ আবার শনিবারে শনিবারে আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে বাড়িও তো যায়। রহস্য বোঝা দায়!

অবশেষে একদিন সেই রহস্যটা বোঝবার দায় পুত্র সতীশ ঘোষের ওপর ছেড়ে দিয়ে শিরিষ ঘোষ বিদায় নিয়েছে। কিন্তু সতীশ ঘোষই কী পেরেছে সে রহস্য ভেদ করতে? লোকটা যদি মন্ত্যপ হতো, ভাবতে পারা যেত, বাড়িতে এইটির সুবিধে হয় না বলেই বাবুর—

যদি স্বভাবচরিত্র খারাপের কোনো নিদর্শন পাওয়া যেতো তাহলে তো রহস্য-ভেদ হয়েই যেতো। কিন্তু সে নিদর্শনের ছায়ামাত্রও তো—

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রহস্যকে রহস্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল সতীশ। বাতিক! বাতিক ছাড়া আর কিছু না। নচেৎ লোকমুখে কানাঘুষোয় তো টের পেয়েছে সতীশ, মহিম হালদার অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, বাগান পুকুর ঘরবাড়ি সব বর্তমান, তবে?

তারপর কত বর্ষা বসন্ত শীত পার হয়ে গেল, মহিম হালদার রয়ে গেলেন একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে। কিন্তু কেন?

কেন সেদিন মহিম হালদার নামের সদ্য যুবকটি এমন একটা মোহাচ্ছন্নের মত প্রস্তাব করেছিল মেসের মালিকের কাছে?

সেই 'কেন'টার উত্তরটিই আজ অনুধাবন করতে চেষ্টা করছেন প্রৌঢ় মহিম হালদার।

প্রৌঢ়?

তা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তা ছাড়া আর কী বলা যাবে?

খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে, হাওয়ায় রাতের গভীরতা ধরা পড়ছে, তবু এখনো দেবযানীর শুতে আসবার সময় হচ্ছে না। নীচের তলা থেকে খুচখাচ কাজের খুটখাট আওয়াজ আসছে। তার মানে কাজের তালিকা শেষ হয়নি তার।

হায় মূঢ় অবোধ নারী !

ভাবলেন মহিম, কোন গ্রহনক্ষত্রের কুটিলতায় মানুষজন্ম হয়েও তোমায় এমন ধাঁধার জীবনযাপন করতে হয়ে চলেছে ?

যখন মেস ঠিক করলেন, তখন বিয়ে হয়নি বটে, বিয়ের তোড়জোড় চলছে। মহিমকে ভাবী কনের একটা বাস্ট ফটোও দেখানো হয়েছে। তবে তাকে শোনানো হয়েছে মফঃস্বলের স্টুডিও, ছবি তেমন উতরোয়নি। মেয়ে দেখতে আরো ভাল।

মহিম আরো ভালোর চিন্তায় মাথা ঘামায়নি। সেই না-উতরোনো ছবিটা থেকেই তার ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি ঠিক করে ফেলতে শুরু করেছে। অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞও।

ছবিটা যে গাবদা-গোবদা জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণের মত বা হৃষ্টপুষ্ট লক্ষ্মী ঠাকরুণটির মত না হয়ে দেবী সরস্বতীর মত ছবি-ছবি চেহারাই, কৃতজ্ঞতা সেইখানেই।

সেই 'ছবি-ছবি' ছবিটিকে মহিম তাদের এই গোপীচন্দনপুরের জগদ্দল সংসারটির মধ্যে কোথাও খাপ খাওয়াতে পারেনি। যেন এই অবিশ্রান্ত চালু কারখানাটির কোনখানে ঢুকে পড়লে আর তাকে দেখতে পাওয়া যাবে না।

আর মহিম তাকে তখন এই গোপীচন্দনপুরের গাড্ডে থেকে বার করে নিয়ে পটলডাঙার নবদুর্গা মেসের পিছনের প্যাসেজ থেকে উঠে যাওয়া এবড়ো-খেবড়ো খোলা সিঁড়িটা দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে, ছোট্ট একটু ছাদ পার হয়ে দু'ধাপ উঠে, এসেছে সেই ঘরটিতে। যার মেঝেটা লাল টুকটুকে, জানলাগুলোয় পাখি খড়খড়ি, আর দক্ষিণে এক চিলতে বারান্দা।

ভাড়া আরো কিছু বেশি ছাড়লেই শিরীষ ঘোষ ছাদের মালিকানাটুকু মহিমকে ছেড়ে দেবেই। ছাদটার কাজের মধ্যে তো গোটাকতক ডেয়ো ঢাকনা জিনিস রাখা, আর চারটি কয়লাগুঁড়োর গুল শুকোনো। এটুকুর জন্যে মাসে মাসে কিছু পেয়ে গেলে লোকসানটা কোথায় ?

মহিমের ছবির বৌ সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সে ভোরে উঠেই ঘরের কাছাকাছি স্নানের ঘরে স্নান সেরে এসে (মহিমের কল্পনার চোখে তখন শিরীষ ঘোষের বসানো পাইপে প্রচুর জল। যদিও অদ্যাবধি সে পাইপে জল ওঠেনি।) পিঠে ভিজে চুল ছড়িয়ে সুন্দর একটি শাড়ি সুন্দর করে পরে স্টোভ জেলে চায়ের জল চাপিয়ে মহিমকে ডেকে ঘুম ভাঙায়, তারপর দু'জনে মুখোমুখি বসে চা খেয়ে মহিম খবরের কাগজ পড়ে, দাড়ি কামায়, বৌয়ের সঙ্গে খুনসুড়ি করে, স্নান করে, সাজগোজ করে এবং বৌকে আদর করে, আর একশো দফা সাবধানবাণী বর্ষণ করে

অফিস চলে যায়।

অফিসের ভাত ?

সে তো 'নবদুর্গা'র রান্নাঘরের সঙ্গে বন্দোবস্ত। মহিম এই সকালের দলে খেয়ে যায়, আর রান্নাঘরের দ্বিতীয় দলের জন্যে রান্না গরম ভাত দোতলায় তুলে দিয়ে যায় ঠাকুর।

হ্যাঁ, এই ব্যবস্থা মহিমের কাল্পনিক সংসারে। তা নয়তো কি বৌকে হাঁড়িকুঁড়ির প্রেমে পড়তে দেবে ? সারাদিনটা বৌ করবে কী ?

কেন বই পড়বে, সেলাই করবে, উল বুনবে, ঘর গোছাবে, নিজেকে সাজাবে, তারপর নির্দিষ্ট সময়ে স্টোভ জেলে শৌখিন জলখাবার বানাবে, চায়ের জল চাপিয়ে বসে থাকবে, আর বর এলে দু'জনে সেই শৌখিন খাবার আর চা খেয়ে দু'জনে বেড়াতে বেরোবে। কোথায় যাবে বেড়াতে ? কোথায় নয় ? কলকাতা শহরে বেড়াতে যাবার জায়গার অভাব ? এ কি তোমার গোপীচন্দনপুর ? যে বৌ নিয়ে বেড়াতে বেরোবার কথা ভাবাও নরকতুল্য ক্লেদাক্ত ব্যাপার। দিনের বেলা বরের সঙ্গে কথা কওয়া পাপ।

সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফেরার সময় যা কিছু কেনাকাটা সারা। তা কেনাকাটা থাকবে বৈকি। ভাত-ডালের দায়টা না থাকলেও চা খেতে, শৌখিন জলখাবার খেতে, সাজতে-গুজতে প্রত্যেকটি ব্যাপারেই দোকানের শরণাপন্ন হতেই হয়।

বই আসবে অবশ্য অফিস লাইব্রেরী থেকে। রোজ একটা করে শেষ করলেও অসুবিধে নেই, মস্ত লাইব্রেরী।

রাতের খাওয়া ?

নাঃ, তার জন্য আর নবদুর্গার রান্নাঘরের দ্বারস্থ হওয়ার দরকার নেই, সান্ধ্য-ভ্রমণের অন্তিমকালে, হয় সেটা সেরে আসা, নয় তার ব্যবস্থা নিয়ে আসা। ব্যস। কী নেই কলকাতার রাজপথ-প্রান্তে ? ভাত, ডাল, মাছ, মাংস ! লুচি-পুরী, ভাজি, আলুরদম, চাটনী, কচুরী, সিঙাড়া, রাবড়ি, রাজভোগ, কুলপি মালাই, চানাচুর, অবাক জলপান।

হেসে হেসে ভেবেছে মহিম। কলকাতার পথে বেরিয়ে বিনা আয়াসে কতরকম মুখরোচক খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করা যায় তার তালিকা করতে বসলে তো মহাভারত হয়ে যায়। রোজ নতুন নতুনেও তিনশো পয়ষট্টি দিনেও বৈচিত্র্য হারাতে পারবে না কলকাতার পসারিদের।

দুটো মানুষের কতটুকুই বা চাহিদা ? 'পিতৃরক্ষা'র ডাল-ভাতটা তো নবদুর্গার

রান্নাঘর থেকেই হয়ে যাবে। . চিন্তাটা বাস্তব না অবাস্তব সেকথা মাথায় আসত না বিয়ের পরও। বিয়ে হওয়া মাত্রই 'হনিমুনে' ছোটা তখন ঘরোয়া বাড়িতে কেউ ভাবতেও পারত না, অতি বড়লোকেও না। তথাপি মহিম নামের সদ্যবিবাহিত ছেলেটা ভাবতো, বৌ মফঃস্বলের মেয়ে। কলকাতা দেখানোর ছুতোয় যদি একবার এনে ফেলে তাকে এই জীবনের স্বাদটি পাইয়ে দিতে পারতাম! একবার স্বাদ পেলে—

আহা, ওই এবড়ো-খেবড়ো সিঁড়ি আর খিড়কির দরজাটা, যেন মহিমের জন্যেই করিয়েছিল ঘোষ. এইটি না দেখলে তো আর মহিমের মাথায় এই পরিকল্পনাটি আসতো না।

দিনের পর দিন এই এক মধুর স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছে ছেলেটা। অথচ ছেলেটা চিরদিনই বুদ্ধিমান বলেই সবাই জানে। মুখে-চোখেও তো বুদ্ধির দীপ্তি। কথায় ছুরির ধার, তবু 'স্বপ্ন' জিনিসটা এমনই আচ্ছন্নকারী!

তাই মহিম তার স্বপ্ন আর কল্পনার গড়া সংসারে সন্ধ্যাবেলা বৌ নিয়ে বেরিয়ে ফেরে, দু'জনের দু'জোড়া হাত জোড়া করে সওদা নিয়ে এসে খোলা সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে একে একে ওঠে, আর তারপর রাতের খাওয়া সেরে বেহালা নিয়ে বসে।

এই বাজনাটার সুরে আকৃষ্ট হয় মহিম দিদিমার বাড়ি থাকতে। দিদিমার এক-তলার ভাড়াটে গগনবাবু ছিলেন গুণী লোক। রেডিও আর্টিস্ট এবং বেহালার শিক্ষক। মহিম তাঁর শিষ্য হয়ে পড়েছিল।

মহিম চলে আসার সময় তিনি বলেছিলেন, তিন বছরে কিছুই হয় না হে, আমি তো তিরিশ বছর ধরে সাধনা করে চলেছি—

মহিম বলেছিল, যদি অকালমৃত্যু না ঘটে, কতকগুলো বছর তো পাবোই হাতে। সাধনা চালিয়ে যেতে বাধা কোথায়?

তা সেই সাধনাই বজায় রেখেছে মহিম হালদার। তাই সে তার ছবির মত সুন্দর আর পালকের মত হাল্কা সংসারে রাত্রের খাবার সেরে বেহালা নিয়ে বসার ছবিটিও দেখে।

দুম করে একদিন, মানে গোড়ার দিকে বলেও বসেছিল কর্তাকে, আচ্ছা এক্সট্রা কিছু দিলে আমায় আপনার এই ছাতটা, সিঁড়িটা আর খিড়কি দরজাটা ইউজ করতে দেবেন?

শুনে শিরিষ ঘোষ, হ্যাঁ তখন তো শিরিশ ঘোষই, হাঁ করে তাকিয়ে বলেছিলেন, ওটা? ওটা দিয়ে আপনার কী হবে?

দিতে আপত্তি আছে কিনা বলুন?

'এক্সট্রা' শব্দটা কানে লেগে রয়েছে। তাই শিরিষ বলেন, না না, আপত্তি কিসের? নেই তো?

না না, আপত্তির কী আছে? তবে হঠাৎ এই কারণটা কী?

মহিম ধাঁ করে বলে ফেলল, ধরুন বৌ নিয়ে এলাম কলকাতায়—

বৌ নিয়ে এলেন! মানে এই মেসবাড়িতে?

আহা, আপনার এদিকের দরজাটা বন্ধ রেখে আমি যদি এই দিকটাকে আলাদা একটা 'বাসা' বলে ধরি?

শিরিষ সমুদ্রে তৃণখণ্ড ধরার মত বলে ওঠেন, না না, তাই কি হয়? মা-লক্ষ্মীর অসুবিধে হবে।

'মা-লক্ষ্মী'র কথা থাক ঘোষ মশাই, আপনার কী কী অসুবিধে হবে বলুন।

আমার আবার কি, মানে আমার তো কিছু—বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন ঘোষ। এর থেকে ঘোষ মশাইয়ের বাসাতেই একখানা ঘর নিক না হালদার। তাতে মা-লক্ষ্মীকেও সারাদিন একা থাকতে হবে না। ঘোষগিন্নী মায়ের মত করে দেখ্‌ভাল করবেন। ইত্যাদি···

মহিম থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, ওসব কথা থাক। আপনার আপত্তি নেই সেটা জেনে রাখলাম।

কিন্তু সেই ছবির মত সুন্দর আর পালকের মত হাল্কা সংসারটি আর গড়া হলো কই মহিমের?

বারবারই চেষ্টা করেছেন, নানান পরিস্থিতিতে। বৌ কখনো বলেছে, 'কী যে বল!' কখনো বলেছে, 'পাগল নাকি?' কখনো বলেছে, 'তাই কি হয়?' আর কখনো বলেছে, 'এমন একটা ক্ষ্যাপার মাথা নিয়ে তুমি আপিসের অফিসারগিরি করো কী করে?'

শেষ চেষ্টা মা মারা যাবার পর।

তাছাড়া যখন নিশ্চিত ধরে নেওয়া হয়েছে, 'শুধু দু'জনের সংসারে' প্রজাবৃদ্ধির আশা অথবা আশংকা আর নেই, 'বাঁজা বৌ' বলে দেগে দেওয়া হয়েছে দেবযানীকে তখন।

তখন আর শিরিষ নেই। সতীশের আমল। মহিম বলেছিলেন, আপনার ওই ছোট ছাতটার একপাশে ছোট্ট একটা টালিখোলার ছাদের ঘর বানাতে কত খরচ পড়ে সতীশবাবু?

সতীশবাবু তাঁর পরলোকগত বাবার মতই হাঁ করে তাকিয়ে বলেছিল, ছাদে ঘর

হ্যাঁ হ্যাঁ, আট ফুট বাই আট ফুট হলেও চলবে। কী খরচা পড়ে? ও আপত্তি ওঠাবেন কিনা, সেটা জানতে পারলে—

সতীশ ঘোষ বলেছিল, কিন্তু ও ঘর আপনার কোন্ কর্মে লাগবে?

আহা আমার না লাগে, আপনার কোন কর্মেও লাগতে পারে—

তা তাই লাগছে।

নবদুর্গার রান্নাঘরের রাক্ষুসে উনুন ছুটোর পেট ভরাবার জন্যে যে বস্তা বস্তা ঘুঁটে জমা করে রাখা হয় বর্ষাকালের জন্যে, সেইগুলো আশ্রয় পেয়েছে লাল টালির ছাত ছোট্ট ঘরটায়।

মা মারা যাওয়ার পর সেই শেষ চেষ্টায় মহিম যখন বৌকে বলেছিল, এখন আর তোমার বাসায় যেতে বাধা কী? দিদি রয়েছেন, প্রতাপের স্ত্রীও যথেষ্ট বড় হয়েছেন—

দেবযানী হেসে ফেলে বলেছিল, 'এখনো তুমি বাসার স্বপ্ন দেখছ?'

কিন্তু মহিম হালদার নামের লোকটারই বা কী বুদ্ধি!

তার সেই প্রথম যৌবনের অবাস্তব কল্পনার হাল্কা হাওয়ার মত সংসারটিকে গড়তে পেল না বলে চিরদিনের মত নিজেকেই হাল্কা হাওয়ায় ভাসিয়ে কাটিয়ে দিল। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি অধিকারের দাবি তুলল না, জোর ফলাল না, রাগ দেখালো না, আবার জীবনটা বরবাদ হয়ে যাচ্ছে দেখেও নিজেকে মোটা সংসারের চাকায় বেঁধে ফেলে মানিয়ে নিতেও পারল না।

কী বলে একে? বুদ্ধিহীনতা ছাড়া আর কিছু?

কেউ কি মহিমের এই আচরণকে সমর্থন করছে?

নাঃ, তা কেউ করছে না। দেবযানীকে অসমর্থন করছে না কেউই। সকলেই বলছে, 'ঘর সংসার' নামক বস্তুটার দায়-দায়িত্ব এড়াবার জন্যে আত্মসুখী ফুলবাবু মহিম হালদার একটা হাস্যকর বাজে ওজর দেখিয়ে গায়ে হাওয়া দিয়ে কাটিয়ে দিল। আশ্চর্য!

কে আর জানতে গেল। অথচ ওই মহিম হালদার একটি সংসার পাতবার প্রবল বাসনাতেই যৌবনের প্রারম্ভ থেকে, মনের মত একখানা 'ঘর' আগলে রেখে, অবিরত আশা-আকাঙ্ক্ষায় দুলেছে।

কারণ সে ভাবেনি এই বাসনাটি তার বাস্তববুদ্ধির পরিচয় বহন করছে না।

ক্রমশই অবশ্য আকাঙ্ক্ষা বিদূরিত, আশা ধূসর, তবু মাঝে মাঝে ক্ষীণ চেষ্টা চালিয়েও এসেছে, যতদিন না দেবযানী মুখের ওপর হেসে উঠে বলেছে, 'এখনো তুমি 'বাসা'র স্বপ্ন দেখছ?'

মহিম কি হাহাকার বোধ করেছে? কই? আত্মপ্রেমীদের মধ্যে হাহাকারের শূন্যতা থাকে না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য আর কিসের জন্যে কি তা মনে থাকেনি, অবস্থাটা কেবলমাত্র অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। জানে সপ্তাহে পাঁচটা দিন দিব্যি আপন প্রেমেই মশগুল থেকে বাকি দুটো দিন নিজের বাড়িতে কুটুম হয়ে আতিথেয়তা ভোগ করে এসে আবার পরবর্তী সপ্তাহের মুখোমুখি হতে হয়।

ক্রমশ এই অভ্যাসের ছন্দটাই যেন 'জীবন'।

স্বাস্থ্যটা এতো মজবুত, এমন অটুট না হলে কী হতো বলা যায় না। হয়তো বা সেই চির-অবহেলিত ঠাঁইটিতেই গিয়ে শরণ নিতে হতো। সেখানে মহিম ভাগ্যবান। অতএব অভ্যাসের ছন্দটাই জীবন। কিন্তু শুধুই কি মহিমের? সাধারণ মানুষ মাত্রই কি নয়? দিনরাত্রির আবর্তনে আবর্তিত হওয়াটাই তো তাদের কাছে শেষ সত্য। নিত্যদিন দিনের ঋণ শোধ করতে করতে দিনগুলো কাটিয়ে চলে আশ্চর্য এক অন্যমনস্কতার মধ্য দিয়ে। এই দৈনন্দিন জীবনের ঊর্ধ্বে আরও কোন জীবনের ধার ক'জন ধারতে চায়? যে চায় তাকেই বরং লোকে 'খাপছাড়া' অথবা 'পাগল-ছাগল' বলে রায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। অথবা মার্জিত ভাষায় বলে 'খেয়ালি'। আর অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা 'কারণ ব্যতীত কার্য হয় না' নীতিতে, ওই খেয়ালের কারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে।

হালদারবাড়ির মহিমের সম্পর্কেও এসব অনুসন্ধান চালাবার চেষ্টা হয়নি তা নয়, তবে হাতেনাতে ধরে ফেলার মত কিছু যোগাড় করতে পারা যায়নি, অনুমানের ওপরই ভাসছে ব্যাপারটা।

'কিছু মধু' আছেই অবিশ্যি, তা নইলে আবার কোন মানুষ 'ভোরে উঠতে পারি না' এই ছুতোয় আজন্ম মেসবাড়িতে কাটায়? হাবাগোবা গিন্নীটাকে পেয়েছে, তাকে যা বুঝিয়ে রেখেছে, তাই বুঝে বসে আছে! হতো আমাদের ঘোষালগিন্নীর মত খাণ্ডারনী, 'ছুতো' ঘুচিয়ে ছাড়তো। ঘোষালকর্তাও তো ভেবেছিলেন তাঁর ওই বেচারী বিধবা মাসতুতো বোনের ওপর দয়াধর্মটি—লোকে 'দয়াধর্ম' বলেই ভেবে থাকে! আহা, অকালে তিনটি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বিধবা, কাছে-পিঠে একটা হৃদয়বান তুতো দাদা থাকতে ভেসে যাবে?

কিন্তু ঘোষালগিন্নী? সেই তুতো ননদের বাস উঠিয়ে ছাড়েনি এই গোপীচন্দন-পুরের চারপাশ থেকে? সে অবশ্য অনেকদিনের কথা। তবু এই বয়সে—

এখনো যখনই হীরু ঘোষাল কোন ছুতোয় কলকাতায় যাবার চেষ্টা করে, সাবিত্রী

ঘোষালও তখনই পুরাণোক্ত সাবিত্রীর মতই পতি-অনুগামিনী হবার দুর্জয় বাসনায় ফর্সা শাড়ি পরে, রবারের চটিতে পা গলিয়ে ফাঁসটানা বটুয়া হাতে ঝুলিয়ে, হাস্যবদনে দরজায় এসে হাজির হয়।

'তুমি' কোথায় যাচ্ছ!

কর্তার এই বিপন্ন প্রশ্নে সাবিত্রী একগাল হেসে জবাব দেয়, তুমি যেথা, সেথায়।

আমি তো, মানে ইয়ে পেনশন-এর ব্যাপারে—

তো আমিও নয় সঙ্গে গেলুম। বরং সনাক্ত করতে সুবিধে।

হ্যা, এই রকম মেয়েছেলেই পারে বিপথগামী স্বামীকে সুপথে আনতে এবং এনে সেই সুপথেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রেখে দিতে।

অতি-উৎসাহীরা ইসারায়-ইঙ্গিতে বলেও গিয়েছে দেবযানীকে, দেবযানী 'অবোধ সরলতায়' সে ইসারা গায়ে মাখেনি। কিন্তু এখন? এখনো কি দেবযানী হালদার অবোধ সরলতায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে? গ্রামসুদ্ধু লোকের একাগ্র কৌতূহল এখন এই হালদার বাড়ির রঙ্গমঞ্চের প্রতি। যেন দেবযানী হালদার নামের মহিলাটি লোকসভার নির্বাচনে নেমেছে। তাই সকলেই উৎকণ্ঠিত—কী হয়, কী হয়!

মহিম হালদারও অবশ্য ভেবেই রেখেছেন আজ বোধ হয় দেবযানী একটা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামবে। যদিও দেবযানীর প্রকৃতিতে সে বস্তু নেই। এই তো সেদিন পর্যন্তও, মহিমের এই শনিবারে শনিবারে অথবা কোন ছুটিছাটায় বাড়ি আসায়, দেবযানীর ছলছুতোয় স্বামীর কাছাকাছি আসার চেষ্টাটি মহিমের লক্ষ্য এড়ায়নি। সেই কাছাকাছির মুহূর্তে, সেই প্রথম যুগের মতই লোকের চোখ এড়িয়ে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ, না হেসেও সারামুখে হাসির আলো মেখে বেড়ানো, সব কিছুর মধ্যেই নমনীয় আত্মসমর্পিতারই ভঙ্গী।

আবার মহিমের অবসর গ্রহণের দিন ঘনিয়ে আসার খবরের পর দেবযানীর চোখেমুখে এবং টুকটাক সরস অথচ তীক্ষ্ণ উক্তির মধ্যেও দেখেছেন একটি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের পরম প্রশান্তি। না, দেবযানীর মধ্যে মহিম কখনো লড়াইয়ে নামার মনোভাব দেখেননি। মান-অভিমান, অভিযোগ-অনুযোগ যেটুকু করে, সেটুকু উড়িয়ে দিতে মহিমকে এক আটিও কাঠখড় পোড়াতে হয় না।

মহিমের একটুখানি হাসি, কথা, চাউনিই যথেষ্ট।

কিন্তু আজকের কথা আলাদা।

আজ অন্য পরিস্থিতিই, আজ দেবযানীর নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের স্থির প্রত্যাশার ওপর একটা পাথরের চাঁই পড়েছে।

আজ বিকেল থেকে দেবযানীর তুচ্ছ-উল্লাপহীন ব্যবহারে সেই আঘাত প্রাপ্তির প্রকাশ।

মহিমের রিটায়ার করার দিন যত আসন্ন হয়ে এসেছে, দেবযানীর মুখে তত আহ্লাদ ফুটে উঠেছে আর হেসে হেসে বলেছে, এবার? এরপর? দেখি এরপর কেমন হাতপিছলে পালাও। এতোদিনের ফাঁকি মারা সুদে আসলে উসুল করা হবে বুঝলে হে মশাই।

মহিম অবশ্য বলেছেন, ফাঁকিবাজদের কী আর স্বভাব বদলায়? দেখো ঠিকই হাত পিছলে বেরিয়ে যাবো।

বলেছেন, আমি বাবা যেমন আছি তেমনি থাকবো, মহাপ্রতাপান্বিত রাণ প্রতাপের এই রাজ্যে নাক গলাতে আসার বাসনা আমার নেই।

বলেছেন, ওরে বাবা, চিরকাল যে গাড্ডাটি থেকে গা বাঁচিয়ে কাটিয়ে দিলাম, বুড়ো বয়েসে সেই গাড্ডায় পড়ে মরব? পাগল হয়েছ? ছ'মাস এখানে একটানা থাকলেই দেখবে তোমার সোনার কার্তিক পতিদেবতাটির সোনার অঙ্গ স্রেফ কালি, এমন কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদামের ওপর ঝপাঝপ চুলের ছোপ, আর এমন একখানি ফিগারের মাঝখানে পাঞ্জাবির ভেতর থেকে ঠ্যালা মারছে একটি নেওয়াপাতি ভুঁড়ি।

শুনে দেবযানী হেসে ফেলেছে এবং হেসে কুটিকুটি হয়েছে। তবু চোখের দৃষ্টিতে ছিল নিশ্চিন্ততা। একটা সৃষ্টিছাড়া কথা বিশ্বাস করবেই বা কেন?

কখনো কখনো আবার মহিম খুব নিরীহ ভাব দেখিয়ে বলেছেন, ওঃ, যা ভয় খাওয়াতে শুরু করেছ, রিটায়ার করে বাড়ি এসে বসার নামে তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আজীবনের ফাঁকির সুদে আসলে শোধ। তা কী কী করতে হবে বল তো? কাঠ কাটা? মাটি কোপানো? উঠোন সাফ?

ওঃ! ওইসব কাজ তোমায় দিয়ে করানো হবে?

নাঃ, তা শাস্ত্রোক্ত একটা কিছু করা তো উচিত। কোন কাজটায় ফাঁকি দিয়েছি মালুম নেই তো।

কোন কাজে?

দেবযানী হেসে গড়িয়ে পড়ে বলেছে, ফাঁকি দিয়েছ আমার মুখপানে চেয়ে বসে থাকায়। এরপর সেটাই করতে হবে চব্বিশ ঘণ্টা, বুঝেছ?

ওই হাসির সঙ্গে দেবযানীর হরদম পানজর্দার ফলশ্রুতিতে কালো হয়ে যাওয়া দাঁতের সারিগুলোও দেখা গিয়েছে, যার অন্তরাল থেকে অতীতের সেই মুক্তোপাটিটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বাতুলতা।

আর রাত্রে আলো নেভানো ঘরে, যখন দুটো পরিচিত দেহ নিতান্ত নিকটবর্তী হয়, তখনো ওই জর্দার গন্ধটা যেন মহিমকে বিপরীত দিকে ঠেলতে থাকে, মহিমের বুকের ওপর এসে এলিয়ে থাকা হাত দুটোয় শাঁখা লোহা চুড়ি রুলির আধিক্য শুধু বুকের ওপরই নয়, যেন বুকের মধ্যেও আচড় কাটে।

কখনো কখনো বলেছেন, উঃ, এ যে রীতিমত অস্ত্রশস্ত্র! এতোগুলো পরো কী করতে? কী এমন সৌন্দর্য বাড়ে?

আহা, যেন সৌন্দর্য বাড়াতে নিজে নিজেই কিনে পরেছি! গিন্নীটিন্নীরা যিনি যখন তীর্থেটির্থে যান, প্রসাদের সঙ্গে আনেন, পরিয়ে দেন, পরব না?

আমি যে দুদিন থাকবো খুলে রেখো।

দুগ্‌গা দুগ্‌গা! কী যে বল!

তা তোমাদের তো এসব শুনি স্বামীর কল্যাণে, তা স্বামীর বুকের ছাল-চামড়া ছিঁড়ে ছড়ে যাওয়া ভালো?

দেখো, ভাল হবে না বলছি! কবে আবার এসব থেকে তোমার বুকের ছাল-চামড়া ছিঁড়ে ছড়ে গেছে শুনি?

বাইরে না যাক, ভেতরে যায়।

আহা, খালি কথার সর্দার!

কিন্তু শুধুই কি ওই শাঁখা রুলি লোহার গোছা? হাতে গলায় কোমরে নানা মাপের নানা গড়নের মাদুলি কবজ তাগা তাবিজের বোঝা নেই? বন্ধ্যা নারীর শাস্তি!

ক্ষুব্ধ মহিম বলেন, অবাধে যে একটু আদর করবো, তার উপায় নেই। ফুটে যাবার ভয়ে সশঙ্কিত। এত সব পরতে ভাল লাগে তোমার?

এ প্রশ্নে অবশ্য দেবযানী তার স্বভাবগতভাবে হেসে বলে ওঠে না, দেখ, ভাল হবে না বলছি! ম্লান গলায় বলে, ভাল না লাগলেই বা কী করছি? পাঁচজনে আমার হিতকামনা করে যেখানে যা পায় এনে দেয়—

ওঃ, হিতকামনা! বলতে পারো না, ফল তো হচ্ছে লবডঙ্কা! আর কেন? এসব আপদ-বালাইয়ের বোঝা কত বইব?

বাক্‌পটু দেবযানীর বাক্য হরে যায়। চোখে প্রায় জল এসে পড়ে। চুপ করে থাকে।

একদিন রুদ্ধ গলায় বলেছিল, বলব আর কোন্ মুখে, বংশে একটা সন্তান এনে দিতে পারলাম না—

মহিমও সেদিন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কে পারল না তার হিসেব হয়েছে?

দেবযানী মরমে মরে বলেছে, এর আবার হিসেব কী ? তোমার এই স্বাস্থ্য, শক্তি, সৌন্দর্য !

ওঃ, বেশ ভাল ভাল শব্দ মুখস্থ করে ফেলেছ তো ! বাংলা ভাষায় দখল আছে। কিন্তু জগতে 'রাঙামূলো', 'মাকালফল' এসব শব্দ আছে হে দেবীরাণী। কতবার বলেছি, দু-পাঁচদিনের জন্যেও একবার কলকাতায় চলো, ভালো ডাক্তারকে দেখিয়ে নিই—

দেবযানী আশা-হতাশা-মেশানো গলায় বলেছে, ডাক্তারের হাতে প্রতিকারের ওষুধ আছে ?

সে গ্যারান্টি দিতে পারি না, তবে কে দোষী, সেটা নির্ণয় করে দিতে পারবে ডাক্তার।

দেবযানী নিঃশ্বাস ফেলেছে, তাতে আর কী লাভ ?

লাভ নেই ? বাঃ ! বদনামটা বরাবর তোমাকেই বয়ে মরতে হলো, অথচ হয়তো আসল আসামী আমি। সেটা জানা যাবে।

জেনেই বা কী লাভ হবে ?

দেবযানী মুখ তুলে কেমন একটি গভীর চোখে তাকিয়ে আস্তে বলেছিল, তাতে আর নতুন কী হবে ?

দেবযানীর চোখের তারায় যখন এমন একটি গভীরতার ছায়া নামে (নামে কখনো কখনো) আর এরকম আস্তে কথা বলে, মহিমের ভেতরে যেন একটা হাহাকার ওঠে। মনে হয়, এখনো এই পরিবেশের আওতা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো এই একদার সুকুমার মেয়েটার ভিতরের বস্তুটিকে কিছুটা খুঁজে পাওয়া যেতো।

কিন্তু কোথায় সেই সুযোগ ? নিজেই সুযোগ খুইয়ে চলেছে ওই মেয়ে, কেবলমাত্র লোকসমাজে ভাবমূর্তিটি বজায় রাখতে।

ভিতরের ব্যাকুলতার হাহাকারটি চেপেই ছিলেন অবশ্য মহিম, স্বভাবসিদ্ধ হালকা গলায় বলেছিলেন, কেন হবে না ? যদি টের পেয়ে যাও, অকারণেই সংসার চিরকাল তোমায় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে, আর—

দেবযানী কথা শেষ না হতেই বলেছিল, অবশ্য আস্তেই বলেছিল, 'আর'টা থাক। কাঠগড়ায় যদি আমার বদলে তোমায় দাঁড়াতে হয়, তা হলেই কি আমার মস্ত গৌরব ? খুব আহ্লাদ ?

শুনে চুপ করে গিয়েছিলেন মহিম।

একটু পরে গভীর গলায় বলেছিলেন, কিন্তু কোনোদিন তো কোনো চেষ্টাও করা হল না—

কে বলছে হলো না!

এবার দেবযানী যেন সব ঝেড়ে ফেলার সংকল্পেই হেসে উঠে বলেছিল, এতো সব মাতুলি, বাবাতুলি, গহনার বোঝা, যা তোমায় জ্বালাতন করে মারে—

পরিস্থিতিকে হাল্কা করে ফেলবার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে দেবযানীর।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জানলা দিয়ে এসে ঢুকে পড়া এলোমেলো বাতাসটা যেন অল্প অল্প শীত ধরিয়ে দিচ্ছে। তবু এখনো উঠে জানলা বন্ধ করতে গেলেন না মহিম, অতীতের স্মৃতির মধ্যে তলিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়তেই ভাল লাগছে। স্মৃতিই অলসতার সুহৃদ! স্মৃতির রোমন্থনে অলসতাই সাহায্যকারী! মনটা কেমন বিষণ্ণ আর কোমল হয়ে উঠছে।

কিন্তু ক্রমশই যেন ঘুম এসে যাচ্ছে। কে জানে দেবযানী ছোট ছেলেগুলোর ডাকাডাকিতে ওদের কাছেই কোথাও শুয়ে পড়েছে কি-না! হয়তো 'গল্প গল্প' করে ধরেছে। না কি—

না উঠেই সুবিধে করে নিলেন মহিম। বেডকভারটা উঠিয়ে নিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে পাশ ফিরে শুলেন। আর ভাবলেন, নাকি এটাই দেবযানীর আজকের সংগ্রামের হাতিয়ার? অসহযোগ?

অহিংস সংগ্রামে অসহযোগিতাই তে অস্ত্র!

তা হলে আর এখন আপাতত কী করার আছে, একটা প্রৌঢ় বয়সের ব্যক্তির? ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া?

চাদরটা আর একটু টেনে মুড়ি দিয়ে একধারে সরে এসে বিছানার অর্ধাংশটাকে অধিকাংশ করে ফেলে, ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণের চিন্তা করছেন, এই সময় ভেজানো দরজার একটা কপাট আস্তে ঠেলে দেবযানী এসে ঘরে ঢুকল।

মহিমের শেষ ঘোষণার পর থেকে অনেক যুক্তি-তর্কের সঞ্চয়, আর অনেকখানি দৃঢ়তা, অনমনীয়তা, কঠোর কাঠিন্যের সংকল্প নিয়ে রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করছিল দেবযানী।

এই ঘোষণা যে দেবযানীর পক্ষে মৃত্যুতুল্য অপমানকর, সেটাই বুঝিয়ে ছাড়বে ওই নির্লজ্জ উদাসীন লোকটাকে। ভেবে রেখেছিল, ওকে বলতে হবে ও যদি ওর এই অকারণ ছেলেমানুষীর জেদ না ভাঙে, তা হলে দেবযানীও ঘোষণা করবে সেই অপমানের পর আত্মহত্যা ছাড়া আত্মসম্মান বজায় রাখার আর কোনো পথ নেই। লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারবে না সে।

ভাষায় খুব একটা সূক্ষ্ম কারুকার্য ফোটাবার ক্ষমতা হয়তো নেই দেবযানীর। অভ্যাসও নেই। রাতদিন এই 'গোণা লোক'গুলোর সঙ্গে বসবাস করতে করতে। তবু দেবযানী স্থির করে রেখেছিল, ঘরে ঢুকেই মহিমকে প্রথম বলবে, তোমাকে একবার স্পষ্ট করে বলতে হবে, আমি গলায় দড়ি দিলে কি কেরোসিনে পুড়ে মরলে তোমার কিছু এসে যাবে না? তা হলে আমি আর কোনো কথা বলব না।

এই কথাটাই নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাষার তারতম্য ঘটিয়ে মনে মনে শত শত বার উচ্চারণ করে চলেছিল দেবযানী। তবু বাইরে থেকে বোঝবার জো ছিল না কী ঝড় বইছে ওই ছিপছিপে ছোটখাটো মাপের মানুষটার মধ্যে।

এটাই বোধ হয় দেবযানীর জীবনের একমাত্র সাধনা। বাইরে থেকে কেউ যেন তার ভিতরের দুঃখ বেদনা ব্যাকুলতা টের না পায়।

তাই দেবযানীকে স্বামীর সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তা না হলে এই বয়েসে তো আর স্বামী সম্ভাষণের জন্যে রাত্রির অপেক্ষা করার কথা নয়। পাড়ায় দেবযানীর বয়সের গিন্নীরা তো যখন কর্তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামেন তখন পাড়া ফাটে, আকাশ ফাটে। দেবযানী ওদের মত নয়। দেবযানী ওদের মত হবার সুযোগই বা পেল কবে? দেবযানী তার নবোঢ়ার ভূমিকা থেকে উঠে পড়ে গৃহিণীত্বের অকুণ্ঠ ভঙ্গীতে প্রকাশিত হবার অবকাশ পেল কই?

দেবযানী হালদার বাড়ির 'বড়গিন্নী', সংসার-চক্রের আবর্তনে সর্বময়ী কর্ত্রী, কিন্তু বড়কর্তা মহিম হালদারের সে বৌ মাত্র! প্রায় 'নতুন বৌ'। তাই সংসারের আর পাঁচজনের সামনে নিজস্ব ভঙ্গীতে অচঞ্চল থাকতে হয় দেবযানীকে। যেন যত রাতই হচ্ছে হোক, দেবযানীর কিছু এসে যাচ্ছে না। নতুন বৌয়েরা যেমন ভাব দেখায় (মানে দেখাতো। একালে ওটা হাস্যকর)।

কিন্তু তাই বলে আজও?

আজও এত দেরি করল দেবযানী? এমনটা কি চেয়েছিল সে? প্রতিপক্ষ যদি ঘুমিয়েই পড়ে তো বক্তব্যের আক্রমণটা আছড়ে গিয়ে পড়বে কার ওপর?

কিন্তু দেবযানীর নিয়তি।

সেই নিয়তি এই মহামুহূর্তে দেবযানীর সঙ্গে একটা নেহাৎ সস্তামার্কা নির্লজ্জ রসিকতা করতে এসে বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখল দেবযানীকে।

ভেজানো দরজার একটা কপাট ঠেলে খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল দেবযানী। ঘুরে দাড়িয়ে কপাটটা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল। পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। খোলা জানলা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঝাপটা দিল।

ইস, বেডকভারটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে মহিম। তার মানে শীত করেছে। কী করে পারা যাবে মায়ায় মরে না যেয়ে? কুণ্ঠায় কুণ্ঠিত না হয়ে?

আস্তে এগিয়ে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিল দেবযানী। খাটের কাছে সরে এল। মহিমের মুখটা দেওয়ালের দিকে ফেরানো। জোড়া খাটের ধবধবে বিছানাটার অনেকখানিই খালি। যেন দেবযানীর জন্যে একখানি শুভ্র আমন্ত্রণপত্র বিছানো রয়েছে। দেবযানী কি এই আমন্ত্রণের দিকে দৃকপাত না করে অসহযোগের অস্ত্র শানিয়ে মাটিতে মাদুর পেতে শোবে, নাকি ওই অপরাধবোধহীন দুর্বোধ্য মানুষটার তন্দ্রাচ্ছন্ন অনুভূতির দেওয়ালে ধাক্কা মেরে ঠেলে জাগিয়ে তীব্র প্রশ্নে ফেটে পড়বে, তুমি কি চাও আমি গলায় দড়ি দিই?

এই প্রশ্নটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যেই তো প্রস্তুতি চলছে কতদিন থেকে। আর শেষ ঘোষণার পর সারাদিন ধরে। এতদিন মানুষটাকে 'দুর্বোধ্য' মনে হয়নি দেবযানীর। শুধু মনে হতো সুখী শৌখিন দায়ত্ববিমুখ পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন।

কিন্তু আজ এই ঘোষণার পরও ওর অকুণ্ঠভঙ্গী নির্মলহাস্যমণ্ডিত মুখ। দুর্বোধ্যই লাগছে। একটুও তো কুণ্ঠিত হবে। একটুও তো অস্বস্তি বোধ করবে। এটা কী?

অথচ দেবযানী নামের এই মেয়েটা তার স্বামীকে অন্য আর সকলের মত 'সন্দেহ' করে ফেলে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। অনেকেই তো ঠারেঠোরে ইসারায়-ইঙ্গিতে মহিম হালদারের চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে শুনিয়েও যাচ্ছে। এটা বিশ্বাস করতে পারলেই তো অঙ্ক সরল। দুই আর দুইয়ে চারের মতই। কিন্তু সেই সরল অঙ্কটার দিকে তাকিয়ে দেখে কষে ফেলতে পারছে না দেবযানী।

দেবযানী আর একবার তাকিয়ে দেখল। ও কি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? নাকি ছলনা! কম বয়সে যেমন করতো!

খাটের ধারে চলে এল দেবযানী।

আলো নেভানো ঘরে জানলা থেকে যেটুকু আকাশের আলো এসে পড়েছে তাতেই যা দেখা যায়।

সেকেলে টাইপের দশাসই মাপের উঁচু খাট গদি, সেই বিয়ের সময়ে পাওয়া। মেজে থেকে অনেকটা উঁচু, উঠতে গেলে প্রায় লাফিয়েই উঠতে হয়, তাই দেবযানী পায়ের দিকে একটা ছোট জলচৌকি রেখে দিয়েছে। বিশেষ করে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে। এই খাটটা তো তাদের খেলার মাঠ। আর নিজেও তো ছোটখাটো মানুষ।

চৌকিতে পা ঠেকিয়ে খুব সন্তর্পণে খাটের একধারে বসতে গিয়েও বিছানা নড়ে উঠলই। আর নড়ে ওঠামাত্রই দেয়ালমুখো হয়ে শোয়া লোকটা এপাশ ফিরে ঘুম-জড়ানো গলায় বলে উঠল, ভোর হতে তো বেশি দেরি নেই, যেটুকু পারো ঘুমিয়ে নাও।

এরকম কথার জন্যে তো আর প্রস্তুত ছিল না দেবযানী। ভাবছিল, এত কী কাজ? কাজ ফুরোয় না? এই রকম একটা কিছু শুনতে হবে। তাই অবাক অস্ফুট গলা থেকে একটাই শব্দ বার হলো, ভোর!

তাছাড়া আর কী?

চাদরমোড়া শরীরটার মধ্যে থেকে একটা বলিষ্ঠ হাত বেরিয়ে এলো অভাবিতই, অবলীলায় হাতের কাছে এসে পড়া হালকা ছোটখাটো দেহটাকে এক হাতে টেনে নিয়ে বেডকভারের গহ্বরের মধ্যে ভরে ফেলল। দীর্ঘ ছ'ফুট বলিষ্ঠ দেহটার সঙ্গে প্রায় সেঁটেই গেল ছোট্ট শরীরটা।

গভীর গম্ভীর মৃদু একটি কথা শুনতে পেল দেবযানী, রাতটাকে সৃষ্টি করেছেন ভগবান বিশ্রামের জন্যে দেবী। ধোপার গাধারও রাতে ছুটি মেলে।

এরপর?

এরপর আর কী করার থাকে?

বর্ষণ নামলে কী আর মেঘ ডাকে? বাজ পড়ে?

ভোরের ঘুমের আবেশময় স্বচ্ছ পর্দাটির ওপর সহসা অশনিপাত! সদ্য উষার স্নিগ্ধ স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে শাঁখ বেজে উঠল ভোঁ ভোঁ করে তিনবার! শাঁক বাজল কেন? ওটা তো সন্ধ্যায় বাজার জিনিস!

অবাক হয়ে গিয়ে উঠে বসলেন মহিম। ঘরের দরজাটা ভেজানো, বিছানার অর্ধাংশ খালি। অর্থাৎ দেবযানী যথারীতি নববধূর নিয়মে উঠে চলে গেছে।

নববধূর তুলনাটা মহিমের নিজস্ব। আকাশে আলো ফোটবার আগেই উঠে পড়া দেবযানীর নিত্য অভ্যাস। না উঠলে সংসারকে সামাল দিতে পারে না।

কিন্তু শাঁখ বাজল কেন ?

বাড়িতে কোনো পুজো-টুজো নাকি ? এতো ভোরে কী পুজো ? কিসের ? না কি গৃহের কোনো পুত্র সন্তানের আবির্ভাব ঘটলো ?

শৈশবের স্মৃতিতে তো চিড় খায় না, মহিমের মনে পড়ল, ছেলেবেলায় পাড়ায় কারো বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটলে হঠাৎ শাঁক বেজে উঠতো। অর্থাৎ পাড়াসুদ্ধ সবাইকে সুখবরটা জানিয়ে দেওয়া হয়ে গেল বিনা খাটুনিতে। তা সে রাতদুপুরই হোক আর দিনদুপুরই হোক। অবশ্য মেয়ে হলে নয়।

কিন্তু এখন তো আর শিশুরা তাদের ভিটের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয় না। ভূমিষ্ঠ হতে যায় হাসপাতালে, নার্সিং হোমে। গোপীচন্দনপুরও এ অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে নেই। প্রতাপের সন্তান-সন্ততিকুল কেউই গৃহজাত নয়।

তবে সে খবর মহিমের তেমন জানা নেই। তাই অসময়ে শাঁখের শব্দে শৈশব বাল্যের একটা স্মৃতি ঝলসে উঠল তারপরই অবশ্য হাসি পেল, তা কী করে হবে ? প্রতাপের কনিষ্ঠতমাটিকে তো দিদি কাঁথায় শুইয়ে দু' হাতে ধরে নিয়ে এসে দেখালেন তখন— মহিম ছাখ ছোট বৌয়ের কোলের মেয়েটা, কী সোন্দর হয়েছে। শীতের সময় সর্বদা কাঁথা-কম্বলমুড়ি হয়ে থেকেছে, দেখিসনি তো ভাল করে।

বাচ্চাটাকে দিদি এগিয়ে এনেছিলেন, যদি মহিম কোলে নেয়। মহিম অবিশ্যি তা নেয়নি, শুধু বাঃ, বেশ তো, বলে নাকটা একটু নেড়ে দিয়েছিলেন। হেঁটে চলে বেড়ানোর আগের বয়েসের শিশু তাঁর কাছে আতঙ্কের।

দাদ বুঝলেন ব্যাপারটা, তাই আর সে চেষ্টা না করে আরও একবার বললেন, রং দেখেছিস ? দুধে-আলতা।

মহিম ব্যতীত আর সকলেই অবশ্য হৃদয়ঙ্গম করলো, এ প্রশস্তি নিছক শিশুটির প্রশস্তিই নয়, এ হচ্ছে ছোট ভাই-ভাজকে তোয়াজ। যেটা তিন কারণে-অকারণে অহরহই করে থাকেন। কিন্তু এমনি কপাল এততেও পৌঁছেও না।

সে যাক, মহিম অনুধাবন করলেন তার ইতিপূর্বের অনুমানটা নেহাত বোকার মতই হয়েছে। আমি একটা আনাড়া।

মনে মনে হাসলেন মহিম। শাঁখ বাজার মানে খুঁজে না পেয়ে কি না যাক গে আর একটু গড়িয়ে নিলে মন্দ হয় না। ভাবলেন, আর তখনই প্রতাপের স্বভাবসিদ্ধ ঈষৎ খোলা ধরনের উচ্চকিত কণ্ঠস্বরটি উঠোন থেকে উঠে এসে খোলা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। দিদির কথা রাখো তো। তুমি চলে এসো চটপট। ছোট বৌ ! হুঃ ! ছোট বৌ করতে আসবে বরণ। ছোট বৌ, তো এখনো অ্যাডাবাসি কাপড়ে

বিছানার মধ্যে বসে। দিদির যেমন খেয়েদেয়ে কাজ নেই! তুমি এসো তো।

এসোটা কাকে?

ব্যাপারটা তো পরিচিত কিছু বলে মনে হচ্ছে না। কথাটা দুর্বোধ্য ঠেকছে। নাঃ উঠতে হচ্ছে।

উঠে এসে জানলার কাছে নীচে চোখ ফেলে দাঁড়ালেন মহিম। আর তাকিয়ে একটি অ-দৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখে তাজ্জব বনে গেলেন।

দৃশ্যটা এই —

উঠোনের মাঝখানে একটি চিকন কালো সবৎসা নধরকান্তি গাভী দণ্ডায়মানা, তার গায়ের কাছে একটা ষণ্ডামার্কা গোয়ালা গোছের লোক বাছুরটাকে এক হাতে আটকে, অন্য হাতে গরুটার গায়ে আদরের থাবড়া মেরে চলেছে। তার কাছাকাছি প্রতাপ দাঁড়িয়ে, পরনে রংজ্বলা লুঙ্গি এবং গায়ে ততোধিক রংজ্বলা একটা ব্যাপার। আশ্চর্য! ওই গোয়ালাটার সাজটা প্রতাপের থেকে ভাল। তবু একটা প্রায় ফসা ধুতি ফতুয়া।

প্রতাপকে তো মনে হচ্ছে বেশ কয়েকবার ভাল শাল ব্যাপার কিনে দিয়েছেন মহিম, নিজের জন্যে কেনার সময়। কেন যে এ রকম! দেখে দুঃখ হয় মহিমের। কী আর করা যায়!

রোয়াকের ওপর দিদি দাঁড়িয়ে, দিদির পাশে তাঁর কন্যা। তার হাতেই শাঁখ। গোটাকয়েক ছোট ছেলেমেয়ে কৌতূহলী হয়ে গরুটার কাছাকাছি না গিয়েও তার দিকে তাকিয়ে হাতমুখ নাড়ছে, আর নিজেরা ঠ্যালাঠেলি করছে। খালি পা, গায়ে স্বল্পবাস। বোঝা যাচ্ছে বারণ না মেনেই এই ভোরবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

বৌদের দেখা যাচ্ছে না, না বড, না ছোট।

ছোটকে না দেখারই কথা, তার সম্পর্কে তো ইতিপূর্বেই মন্তব্য শোনা হয়ে গেছে। ডাকাডাকিটা তাহলে বড়কেই। অথচ অনুমিত হচ্ছে দিদির এটা অনভিপ্রেত। তিনি ছোট সম্পর্কেই উৎসাহী ছিলেন, প্রতাপ সে উৎসাহে জল ঢেলেছে।

রহস্যটা কী?

নেমে গিয়ে রঙ্গমঞ্চে পৌঁছে দেখবেন না-কি।

বাতাসে বেশ ঠাণ্ডার ভাব। ভোরের বাতাস, ঠাণ্ডা তবু সুখময়। কিন্তু গায়ে মাত্র একটা জালি গেঞ্জি, তাও—অনুভব করলেন তার বুকটা এবং কাঁধটা স্যাঁতসেঁতে।

একটু বিষণ্ণ কৌতুকের হাসি খেলে গেল মুখে। গত রজনীর সেই প্রবল বর্ষণের ফল! যার জন্যে মনটাও বেশ স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছিল। এমনও ভেবেছিলেন—

দ্বিতীয় চিন্তায় নামতে হবে নাকি।

বেশ বিপন্নই লাগছিল।

মনের সেই ভিজে ভিজে ভাবটা এখন আর আছে কিনা মালুম হচ্ছে না, মালুম হচ্ছে গেঞ্জির বুকের ভিজেটা। বদলে ফেলতে হবে না চলে যাবে দেখতে গিয়ে প্রায় চমকেই উঠলেন। সেরেছে! এইভাবে নেমে গেলেই হয়েছিল আর কী!

বুড়ো বয়েসে গেঞ্জির বুকে সিঁদুরের ছোপ।

কম বয়েসে এক রকমের লজ্জা, বুড়ো বয়েসে আর এক রকমের।

কম বয়েসে মহিম এই জ্বালায় দেবযানীকে গঞ্জনাই দিতেন, তোমার ওই লুডোর ঘুঁটির সাইজের সিঁদুরটিপ পরাটা ছাড়বে?

দেবযানী ক্রুদ্ধ হতো।

টিপ পরা ছাড়ব?

তা ছাড়াই উচিত! তোমার আর কী, দিব্যি ভালমানুষের মত ভোর না হতেই সরে পড়বে। আর আমার? অবস্থাটি দেখেছ?

দেবযানী দুষ্টুহাসি হেসেছে। চোখেমুখে খেলেছে সে হাসি। বলেছে, এতোই যদি জ্বালা, তাহলে গায়ে কাঁথা-কম্বল জড়িয়ে শুয়ো। সিঁদুরটিপ পরব না! এমন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কথা বল তুমি! কল্যাণ-অকল্যাণ বলে একটা কথা নেই?

তা কল্যাণটা তো হতভাগা স্বামীরই? সেও স্বামীর অনুরোধে-অনুনয়ে সেটা বাদ দেওয়া যায় না?

মোটেই না। স্বামীর হুকুমে বরং বিষ খাওয়া যায়, কিন্তু এসবে হুকুম মানা চলে না।

মহিমের তর্ক—তা সিঁথেতেও তো বেশ খানিকটা সিঁদুর লেপা হচ্ছে, তাতে হয় না?

উঁহুঁ। টিপটা হচ্ছে 'কপালে'র ব্যাপারে। টিপ 'কপাল-রক্ষক'। অশুভ গ্রহরা কপালের দিকে তাকাতে এলে, কপালের লাল টিপকে দেখে রক্তচক্ষু ভেবে ভয় পাবে।

বটে নাকি! এর ভেতর এত রহস্য?

কতো কিছুর মধ্যেই কতো রহস্য থাকে।

তা অনেক মাইনাকে তো ঘুঁটের সাইজ টিপ পরতেও দেখি। তোমার মতে তারা কখনো বিধবা হয় না?

তর্কে হারবে না দেবযানী। অন্তত তখন হারত না।

আমার মতে আবার কী? গিন্নীরা বলেন তাই।

গিন্নীদের কথাই বেদবাক্য ?

নয় কেন ? তাঁদের চিরকালের কত বিচার-বিবেচনা, কতকালের অভিজ্ঞতা থেকে এসব ধারণা।

আর আমি যদি বলি, এ সমস্তই মুখ্যুমি, বোকামি, কুসংস্কার—

এরকম কথায় দেবযানী বেশ উত্তেজিত হতো।

তুমি বললেই হবে ? তুমিই জগতের সেরা পণ্ডিত ? আদি-অন্তকাল ধরে লোকে যা বিশ্বাস করে আসছে—

মহিম হতাশের ভান দেখিয়ে বলতো, ওঃ আদি অনন্তকাল ! তা হলে আর তোমার উদ্ধারের আশা নেই হে দেবীরাণী ! তুমি তোমার ওই সুন্দর ভুরু দুটির মাঝখানে একখানি ঘুঁটের সাইজের টিপই পোরো।

পরবই তো।

ঠিক আছে। একটি শর্ত, কপালটিকে সব সময় আমার গেঞ্জি পাঞ্জাবির থেকে তিন ইঞ্চি তফাতে রাখবে।

বয়ে গেছে। এই তো এই- -

আচ্ছা, ঠিক আছে। আমিও এই গেঞ্জি গায়ে দিয়েই সকলের সামনে ঘুরে বেড়াব।

তা তুমি পারো। যা বেহায়া !

হায় অদৃষ্ট ! এত নিরীহ থেকেও এই অপবাদ ! না, এ যুগে জন্মানো উচিত হয়নি তোমার। একশো বছর আগে জন্মানো উচিত ছিল।

তোমারও উচিত হয়নি বিলেতে না জন্মে এই গণ্ডগ্রামে জন্মানো।

তা এসব অবশ্য তামাদিকালের কথা।

এখন আর এ নিয়ে তর্কের কথা ওঠে না।

আজও দেবযানীর কপালের 'লুডোর ঘুঁটি' অক্ষয় মহিমায় বিরাজিত। যেমন অক্ষয় মহিমায় প্রবাহিত মহিম হালদারের জীবনযাত্রার ধারা।

গণ্ডগ্রাম তো শহরে ছাঁট পেয়ে গেছে কবে থেকে, আরো পাচ্ছে, কিন্তু মহিম হালদারের তো হেরফের হলো না !

আলনা থেকে একখানা লম্বা-চওড়ায় প্রকাণ্ড মোটা তোয়ালে টেনে নিয়ে (এ বাড়িতে এহেন শৌখিন জিনিস ব্যবহার হয় একমাত্র মহিমের দ্বারাই।) গায়ে জড়িয়ে নীচের তলায় নেমে এল মহিম, পুরনো আমলের দুদিক চাপা সিঁড়ি দিয়ে।

আর দালানে নেমেই দেখতে পেল, বোধহয় ডাকাডাকিতে বিব্রত হয়েই দেবযানী দালান থেকে বেরিয়ে, রোয়াকে বেরিয়ে পড়ে আস্তে আস্তে উঠোনে নামছে।

দেবযানীর পরনে চওড়া লালপাড় গরদ শাড়ি, হাতে একটা থালায় মোটা একগোছা দূর্বো, দুটো পাকা কলা, আর একটা সিঁদুরকৌটো এবং একটা পূর্ণ ঘট।

দেবযানী সাবধানে গরুটার কাছে গিয়ে ঘটের জলটা চতুষ্পদ প্রাণীটির চারখানি পায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে একটু একটু করে ঢেলে দিল। ঢেলে দিল বাছুরটার পায়েও। তারপর কৌটো খুলে বেশ খানিকটা সিঁদুর নিয়ে গরুর কপালে লেপে দিল।

এই সময় ভাগ্নী তনু আবার ভো ভো করে তিনবার শাঁখ বাজিয়ে দিল।

অতঃপর সেই দূর্বোর গোছা আর কলাটা সমেত থালাটা গরুর মুখে ধরল।

দিদি বলে উঠলেন, ও কি বড় বৌ থালা সমেত কেন? হাতে করে খাওয়াও।

দেবযানীর মুখে বিপন্ন হাসি। দেবযানীর মুখে সদ্য ওঠা ভোরের সূর্যের আলো। দেবযানীর মুখ আহ্লাদে উদ্ভাসিত। বলল, ভয় করছে যে!

তবু সাবধানে দিল মা এবং সন্তানকে কলা আর দূর্বো।

নাঃ। গতরাত্রের বর্ষণের চিহ্নমাত্র নেই সে মুখে।

বড়কর্তা মহিম হালদারের মুখে ফুটে উঠল একটু ব্যঙ্গের হাসি।

নাঃ। 'দ্বিতীয় চিন্তায় নামবার প্রয়োজন নেই।

প্রতাপের মুখেও আহ্লাদ আহ্লাদ ভাব যা দুর্লভ দৈবাতের ব্যাপার।

মহিমকে দেখে মুখের পেশীতে হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল, দাদার বোধহয় শাঁখের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল?

প্রশ্নের উত্তরটা অবশ্য একটু হাসি দিয়েই মিটিয়ে দিলেন মহিম, আর সেই হাসিটুকুর জের টেনেই বললেন, কী ব্যাপার? কোনো পুজো-টুজো নাকি?

এ প্রশ্নের উত্তর প্রতাপের বদলে দিলেন সুরবালা। গদগদভাবে বললেন, তা একরকম পুজোই। কতকাল গোয়াল শূন্য পড়ে আছে, আবার মা ভগবতী এলেন আজ। কালো গাই, খুব সুলক্ষণযুক্ত। প্রতাপ কিনল।

দিদির কণ্ঠে সেই সুধা।

মহিম একবার কটাক্ষপাত করলেন গরদের শাড়ির আঁচল গলায় জড়ানো লাল পাড়ে ঘেরা মুখটির দিকে। আহ্লাদের দীপ্তি অম্লান।

আর একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের হাসি মনের মুখে ফুটে উঠল মহিমের।

প্রতাপ তাড়াতাড়ি বলল, কেনাকিনি মানে, গরুটি আমার এক ছাত্রের ঠাকুর্দার, ছেলে বৌ কানপুরে। ইনিই নাতিটিকে নিয়ে আর গরুটিকে নিয়ে দেশের বাড়ি

আগলে পড়েছিলেন, তা ছেলে বৌ চাপ দিচ্ছে নাতিকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে ভাল ইস্কুলে দেবে বলে। তাছাড়া বুড়োরও বয়েস হয়েছে। তাই বলতে গেলে জলের দরেই দিয়ে গেল।

মহিম হঠাৎ স্বভাবতভাবে খোলা গলায় হেসে উঠলেন, 'দরে'? সৎ ব্রাহ্মণ দেখে দান করে ফেললেই পারতো!

প্রতাপ মুচকি হেসে বলল, দানের কথা ওঠে না, মিঞার ব্যাপার।

ওহো-হো! তো তাতে বিশুদ্ধতা হানি হয় নি? দিদি রাজী হয়েছে?

কী যে বলিস মহিম!

দিদি ঝলসে ওঠেন, আজন্মকাল আবদুল আমাদের দুধ দিয়ে যেত না? তুই এতটুকু ছেলে একটা ছোট্ট ঘটি বাটি যা পেতিস নিয়ে এসে পেতে দিতিস, ও আলাদা করে তোকে দুধ খেতে দিতো।

যাক বাবা বাঁচা গেল! ভাবছিলাম, দিদি হয়তো বলবে 'ওদের' ঘরে কেন খেয়েছে, জাত নেই?

দিদিকে রাগানো মহিমের এক মজার খেলা। বেশী ছোট-বড় নয়, তবে চিরদিন দিদিকে খেপিয়ে মজা পায় মহিম।

কে জানে, হয়তো এই জন্যেই সুরবালা চিরকাল বড় বৌয়ের প্রতি বিরূপ। প্রতাপ তো দিদিকে পাত্তাই দেয় না, 'নীরেট' বলে হ্যানস্তা করে, তবু প্রতাপের দিকেই তাঁর 'ঢল'।

এখন সেই ষণ্ডা লোকটা বলে উঠল, এবার তাহলে এনাদের ঘরে তুলুন মা ঠাকরোন। ওবেলা থে' আমিই আসবো দুধ দোয়াতে।

প্রতাপ বলল, সে তো আসতেই হবে। অন্যের হাতে তো দুধ দেবে না। ও বলল, মা ঠাকরোন, অগ্রে অগ্রে চলেন, আমি সঙ্গে চলছি। একেবারে গোয়ালে থুয়ে আসি। তো দেখবেন বাছুরের দড়িটা যেন খাটো থাকে, আর মায়ের থেকে খোঁটাটা দূরে থাকে। ভারী চালাক এটা, ফাঁক পেলেই পিইয়ে নেয়।

এতক্ষণ দেবযানী নীরবেই কর্তব্য কাজ করে যাচ্ছিল, এখন বলে উঠল, বাঃ, ওর মায়ের দুধ ও খাবে না?

তবেই হয়েছে!

লোকটাও ভাঙা ভাঙা গলায় জোর তলবে হেসে উঠল, তবেই আর দুধ খেয়েছেন কত্তা। মায়ের যা মায়ার প্রাণ দেখছি! মা ঠাকরোন, আপনার কাপড়ের আঁচলটা ভুঁয়ে লুটিয়ে গোয়ালে ঢুকুন। তালে ইনি লক্ষ্মী মেয়ে হবে।

দেবযানী অবলীলায় সেই গরদের শাড়ির আঁচলের কোণ মাটিতে ফেলে লুটোতে

লুটোতে এগিয়ে গেল গোয়ালের দিকে, গরুর পায়ে জল ঢালতে ঢালতে। ভারী মানানসই দৃশ্য।

মহিম হালদার কৌতুকের হাসিমাখা মুখে তাকিয়ে থাকলেন সেদিকে।

নাঃ। মনের মধ্যে আর অপরাধবোধ থাকছে না মহিম হালদারের।

এই। এইটিই ছিল গতরাত্রে দেবযানীর পরাজয়ের কারণ।

রাত দশটার সময় গরুর মালিক বৃদ্ধ সাদাত আলি এসে হাজির হয়েছিলেন প্রতাপের কাছে। ভোরের গাড়িতেই চলে যেতে হবে তাকে, গাভীটিকে তাঁর ভৃত্যের সঙ্গে প্রতাপের বাড়ি রওনা করে দিয়েই চিরদিনের মত পাটিবাটি তুলে চলে যাবেন, তাই শেষবারের মত গাভীর নতুন মালিককে বুঝিয়ে দিতে এসেছিলেন, তার প্রাণতুল্য পোষা প্রাণীটির মর্জিমেজাজ কেমন, সে কী পছন্দ করে আর কী না করে। চোখ দিয়ে জল পড়ছিল বুড়োর। প্রতাপ হালে পানি না পেয়ে অগত্যাই অগতির গতি বৌদিকে ডেকে এনেছিল বাইরের দালানে।

তুমি শুনে নাও বৌদি আলি সাহেব যা বলছেন।

বলার কিছু নাই মা. মনে করুন মেয়েটাকে শ্বশুর ঘরে রেখে যাচ্ছি। আপনি একটু স্নেহমমতা করবেন। আর আমার ওই নাণ্টিলাল, সেই আছে রাখবেন, ও ওরে বোঝে। এই কথাটুকুন বলতেই আসা।

কিন্তু সেই কথাটুকুন বলতেই ঘণ্টা কাবার। শতবার আশ্বাস দেওয়ার পরও আরও শতবার সে তার প্রাণতুল্য কন্যাটির গুণ বর্ণনা করতে থাকে।

মনের মধ্যে উথাল পাথাল অস্থিরতা, তবু ভাগ্যের হাতে নিরুপায় আত্মসমর্পণের মতই দাঁড়িয়ে থাকা।

ইস। দেবযানীর দেবা দেখে মহিম তো একবার নেমে গেলও পারতো। দেখতো বেচারা দেবযানীর বেহাল অবস্থা। কিন্তু তেমন আর ঘটে কই?

আর ঘটবেই বা কেন?

দেবযানী একদা তো নিজেই সেই সম্ভাবনা-তরুর মূল উৎপাটন করে রেখেছে। নেমে এসেছিল মহিম, তখনো মা বেচে। বলে উঠেছিল, আচ্ছা মা, তোমাদের ঘড়ির কাঁটা কী থেমে বসে আছে? এতো কী কাজ তোমাদের বল তো?

মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ওই দেখলে তো বৌমা। সেই থেকে বলছি, কুটনো থাক, কাল সকালে হবে। তা তোমার আর হয় না। হপ্তায় দুটো দিন মাত্তর বাড়ি থাকে ছেলেটা--

লজ্জার মাথা খেয়ে 'দুটো রাত' না বলে 'দিনই' বলেছিলেন। আর দেবযানীও লজ্জা বজায় রাখতে নেপথ্যে সোচ্চার হয়েছিল, তিনশো পঁয়ষট্টি দিন থাকতে কে বারণ করেছিল?

অতঃপর আর কোনোদিন দেখতে আসেনি এতো কি কাজ দেবযানীর? আজই বা হঠাৎ আসতে যাবে কেন?

যতবারই দেবযানী চলে আসতে চেষ্টা করছিল, ততবারই 'আর একটা কথা' শুনে যেতে ফিরে দাঁড়াতে হচ্ছিল।

কিন্তু, এসব বুঝবে সেই অবুঝ লোকটা?

বললে, বলে কিনা যে স্বখাত সলিলে ডুবে মরতে চায়, তাকে বাঁচানোর সাধ্য ভগবানেরও নেই।

এই যে এই ঘটনা, এটা দেবযানীর স্বখাত সলিল?

দেবযানী নিজের শখে 'গরু কিনব' বলে নেচেছিল? তবে হ্যাঁ প্রতাপের নিতান্ত ইচ্ছুক মুখটার ওপর থাবড়া বসিয়ে বলে উঠতে পারেনি বটে সেদিন, না না, ওসব গরু-ফরুর অনেক ঝঞ্ঝাট ভাই, ও সাধ ছাড়ো। আমি ওসব দায়িত্ব নিতে পারব না।

বলা সম্ভব?

যে মানুষটা অকূলে কূল বলতে বৌদিকেই বোঝে, হালে পানি না পেলে বৌদিরই শরণ নিতে আসে এবং তার যাবতীয় ইচ্ছা পূরণে বৌদির সহায়তাকেই বিশ্বাস করে।

মহিম বলবে এ হচ্ছে স্বখাত সলিল।

বললে আর কী করা যাবে?

অবশ্য প্রতাপ যে দেবযানীকে যথেষ্ট মান্যভক্তি করে, এটা বোঝে মানুষটা এই যা ভরসা দেবযানীর।

'ভগবতী বরণে'র পর্ব তো অনেকক্ষণ মিটে গেছে, তবু বরণকর্ত্রীর সাড়া-শব্দ নেই যে! চা খাবার সময় তবুই হৈ-চৈ করল, শুধু চা? তোমার এই একটা দোষ বড়মামা! সকালবেলা খালি পেটে শুধু চা খাওয়া খুব খারাপ।

মহিম অবশ্য হেসে উঠলেন, এইসব দোষ আর খারাপ-টারাপ নিয়েও তো মন্দ কাটিয়ে দিচ্ছি না মা জননী! তোমার ওই ছোট মামাটিকে তো তুমি মানুষ করছ, কেমন দেখছ?

মনে করলেন হাসিটা যদি অলক্ষ্যে কোথাও পৌঁছয়।

মনে হল না পৌঁছেছে।

বেরিয়ে পড়লেন, মনে মনে একটু ক্ষোভ ব্যঙ্গ আর তিক্ত হাসি হেসে।

খুব সম্ভব মহিলা এখন গোসেবারূপ পুণ্য অর্জন করছেন।

এখন সকালের রোদ উঠে গেছে। কোথা থেকে যেন কাঁঠালীচাঁপা আর নিম-ফুলের মিশ্রিত গন্ধ ভেসে আসছে।

বাইরে বেরোতেই চোখে পড়ল গাছভর্তি মুকুল ধরেছে শশাঙ্কদের পাঁচিল ধারের আমগাছটায়।

কী আশ্চর্য, কোথা থেকে যেন কোকিলের ডাকাডাকির স্বর ভেসে আসছে। অর্থাৎ সবাই এক 'আদি অনন্তকালের নিয়মে' বিশ্বাসী। যেমন দেবযানী।

আবার একটু কৌতুকের হাসি মুখে ফুটে উঠল, নাঃ। আর কিছু করার নেই।

কিন্তু বেচারী দেবযানীর কপাল। কপালের চক্রটি যদি তাকে নিয়ে ডাংগুলি খেলতে থাকে, কী করবে সে? আশ্চর্য! সেই হতভাগাটা কিনা এতকাল পরে, আজই এই সময় এসে উদয় হয়? আর কিনা সেই গোয়ালের ধারে গিয়ে হানা দিয়ে নিজস্ব ভঙ্গীটিতে ডাক দিয়ে ওঠে?

ইস! আজ এখন আসতে ইচ্ছে হল ওর? আর দিন পেল না? অথচ কত দিন ধরে দেবযানী এই ডাকটির প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হয়ে থেকেছে।

মহিমকে দেখেই শশাঙ্ক হৈ-চৈ করে উঠল, আরেব্ বাস! কী ব্যাপার? নবাব বাহাদুর, নবকার্তিকটি যে সকালবেলায় এই গরীবখানায়! ওরে গোপলা, একটা চেয়ার-ফেয়ার এনে দে ঝটপট।

শশাঙ্কর চেহারাতেও সেই একই দৃশ্য।

পরনে বিবর্ণ একটা লুঙ্গি, গায়ে একটা ঘাড়ছেঁড়া ফতুয়া। হাতে শাবল। উঠোনের ধারে একটা খুঁটি পুঁতছে।

মহিম হাসলেন, থাক থাক চেয়ার লাগবে না। তা এটা কী হচ্ছে?

আর কী! গিন্নীর পুঁইমাচা বানাতে হচ্ছে। রবিবার হলেই তো একটা না একটা ফরমাশ।

দালানের ভিতর থেকে একটি নারীকণ্ঠের কর্কশ উক্তি সোচ্চারিত হলো, তাই তো! রবিবার হলেই গেরস্থর ফরমাশ খাটছেন উনি! গোপলা জিজ্ঞেস কর্ তো এক্ষুনি ছিপ ঘাড়ে নিয়ে ঘোষের পুকুরে ছোটা হবে কিনা।

গোপাল একটা নড়বড়ে চেয়ার এনে উঠোনের এবড়ো-খেবড়ো বাঁচিয়ে বসিয়ে

দিল।

মহিম হেসে ফেলে বললেন, থাক বাবা, আমি দাঁড়িয়েই থাকি। তোর ওই চেয়ারে বসতে গেলে আমিও যাব, চেয়ারও যাবে।

গোপাল বলল, কিছু হবে না। বসুন না আপনি, আমি ধরে থাকছি।

সর্বনাশ! তুই ধরে রাখবি, আর আমি বসে থাকব! থাক থাক। কি রে শশাঙ্ক, কাল মাছ পেয়েছিলি?

কাল? কাল আর কতটুকু বসলুম? বেলা তো পড়ে এসেছিল। নেশার দায়ে একবার গিয়ে বসামাত্তর। আজ এখন গিয়ে বসবো—

মহিম গোপালের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, তা হলে তো আজ রাত্তিরে তোদের দারুণ ভোজ রে গোপাল?

গোপাল মুখ বেঁকিয়ে প্রায় ভেঙচি কেটে বলল, ভোজ না কাঁচকলা। কতই মাছ ধরতে পারে! হয়তো দুটো সিঙ্গি কি আডবেলে, নচেৎ চারাপোনা।

শশাঙ্ক বিপন্ন হাসি হেসে বলে ওঠে, তা কী করব বল? চামার রাখাল ঘোষটা যে ঠিক বুঝে বুঝে শনিবারের সকালে পুকুরে জাল ফেলিয়ে পুকুর ফর্সা করে রাখবে!

আবার সেই নারীকণ্ঠ উচ্চকিত, না রাখবে না! তার পুকুর সে উসুল করবে না!

জ্ঞাতি সম্পর্কে মহিলাটি মহিমের খুড়ি, তাই এমন দরাজ গলার উক্তি।

শশাঙ্ক নেপথ্যের উদ্দেশ্যে বলে, মিনি-মাগনায় তার পুকুরে কেউ বসতে যায় না।

বলেই তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বলে ওঠে, মাছ উঠুক না উঠুক, এ এক মজার নেশা রে মহিম! আঃ, নেশাটা যদি একবার ধরাতে পারতুম তো বুঝতিস!

মহিম একবার তার শাবল হাতে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাকিয়ে দেখেন তার জীর্ণ শ্রীহীন বাড়িটার দিকে, তার ছেলে গোপালের দিকে, আর গোপালের হাতে চেপে ধরে রাখা নড়বড়ে চেয়ারখানার দিকে।

চেয়ারটাই এদের জীবনের প্রতীক।

মহিম হেসে উঠে বললেন, আমার আর বুঝে কাজ নেই বাবা!

শশাঙ্ক অবশ্য অপ্রতিভ হল না, বলল, তা বটে। এই নবকার্তিকটি হয়ে ঘুরে বেড়ালেই তোর সার সত্য।

তা হলে বুঝেছিস সেটা? তা যাক আসল কথাটাই বলতে ভুলছি, দিদি বলে দিল আজ রাত্তিরে ও-বাড়ি খাবি।

হঠাৎ?

তা জানি না। আমি হুকুম পালন করতে এসেছি মাত্র। আচ্ছা চলি। যাও

নিশ্চয়। না গেলে দিদি ভাববে আমি বলতে ভুলে গেছি। আচ্ছা চলি –

মহিম চলে যেতেই বেরিয়ে এল শশাঙ্কর বৌ। ঘ্যানঘেনিয়ে বলে উঠল, হঠাৎ নেমন্তন্ন কেন বুঝেছি। একথা আমায় বলেছিল ওবাড়ির ভাসুরঝি।

তা কথাটা কী?

অবহেলায় বলে শশাঙ্ক।

এই তোমার নবকার্তিকটি তোমার বন্ধুমানুষ, যদি তোমার অনুরোধ-উপরোধ শোনে।

শশাঙ্ক পোঁতা খুঁটিটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে তার শক্তত্বটা পরিমাপ করতে করতে বলল, তা উপরোধটা কিসের?

আহা! জানো না বুঝি? ন্যাকা! ওনার মেসবাড়ি ছাড়ার জন্যে, আর কিসের?

ওঃ! এই কথা! তা হলে আজ সুরবালার নেমন্তন্নটা গচ্চা গেল। হ্যাঁ! হ্যাঁ! হ্যাঁ! কেরোসিন ঢেলে আগুন নেভাতে চেষ্টা!

বৌ বলল, তার মানে?

মানে বোঝবার মতন ঘিলু মগজে থাকলে তো?

গোপাল আবার সেই ভাঙা চেয়ারটা টানতে টানতে দালানে নিয়ে যেতে যেতে বলে ওঠে, বুঝতে পারলে না? ও-বাড়ির ওই বড়দাদাবাবু এখানের সব কিছুই অছেদ্দার চোখে দেখে। বাবাকেও। কাজেই বাবার অনুরোধে আরও বিগড়ে যাবে। চেয়ারটাকে ঠুকে বসিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাড়ায় ছেলেটা, ন্যাংপেতে পায়জামাটার ঢিলে দড়িটা এঁটে বাঁধতে বাঁধতে বলে ওঠে, ঠিকই করে। আমার অবস্থা থাকলে আমিও তাই করতুম। মানুষ হয়ে জন্মে, মানুষের মতন থাকতে চাইবে না মানুষ? জীবন তো একটা বৈ দুটো পাবে না।

জীবন একটা বৈ দুটো পাবে না।

শশাঙ্ক একটু চমকে উঠল।

জীবন একটা বৈ দুটো পাবে না।

কথাটা কে বললে? গোপাল!

তবে চমকানিটা বেশীক্ষণ থাকল না শশাঙ্কর। বৌয়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, বাবুর বুঝি আজকাল খুব সিনেমা থিয়েটার দেখা হচ্ছে? তাই এমন নাটুকে কথা শেখা হচ্ছে।

বৌ অবশ্য এর উত্তর দিল না, তার বদলে বলে উঠল, কী, বাঁশ-বাখারি গোটানো

হচ্ছে ? হয়ে গেল কাজ ? ছেলের ব্যাখ্যানা হচ্ছে ! বলি, আমড়া গাছে কি ল্যাংড়া ফলবে ?

ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মহিম একটু লক্ষ্যশূন্যভাবেই পথ চলতে লাগলেন, নিতান্ত পরিচিত বাড়িটা এড়িয়ে। কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। রোদ চড়ে উঠেছে। হঠাৎ হঠাৎ দমকা বাতাসে নিমফুলের গন্ধ ভেসে আসছে।

স্টেশনের পথ ধরলেন মহিম। আর হঠাৎ সামনের একটা গাছের দিকে চোখ পড়তে যেন চমকে উঠলেন। পুরো গাছটা মুকুলে ভরে গেছে। গতকাল কোথায় ছিল এ গাছটা ? রিক্সায় আসবার সময় তো কই এই সমারোহ চোখে পড়েনি ! রাতারাতি হয়ে উঠল নাকি ?

হাসলেন একটু মনে মনে। ভাবলেন, আমরা কত অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলি। এই পথ দিয়েই গিয়েছি কাল, এ দৃশ্য চোখে পড়েনি। হঠাৎ চোখে ধরা দিল।

তা জীবনের পথেও হয়তে এমনিই হয়। আশপাশে কী রয়েছে, কে রয়েছে চোখে পড়ে না। আশ্চর্য, এই দৃশ্যটা যেন ছেলেবেলাকে মনে পড়িয়ে দিল।

আমের মুকুল ব বোল্-এর দর্শন মেলার পরই শুরু হয়ে যেত 'কচি আম' সংগ্রহের অভিযান। কিন্তু তখন কি তার 'আম' পদবাচ্য হয়ে উঠেছে ? না ওঠবার আগেই তো তাদের গায়ে ঢিল ছোড়ার পালা। প্রধানত শশাঙ্কই এর নেতা। স্কুলফেরত বালকের দলের এই অভিযানে মহিমের ভূমিকা গৌণই ছিল। অথচ মহিম ছেলেটা যে লেখাপড়াতে শশাঙ্কর থেকে উচ্চমানের ছিল তাও নয়। শশাঙ্ক বরাবরই ক্লাসে প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ক্লাসে সে মনিটারও হয়েছে, মহিমের তখন ধারণা শশাঙ্ক একটা কেষ্ট-বিষ্টু হবেই।

এখন শশাঙ্ককে দেখে দুঃখ হয়। আজ তো আবোই হল তার সাজ এবং কাজ দেখে।

রোদ থাকলেও, মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝলক এসে তাতটাকে চামড়ায় বিঁধিয়ে দিতে সমর্থ হচ্ছে না। আজকের মত এমন অলসভাবে হেঁটে এ পথে আসা বড় একটা হয় না। রবিবারের সকালটা তো 'দরবার দিবস'।

পাড়াপড়শী কেউ না কেউ এসে হানা দেবেন, নারীপুরুষ নির্বিশেষে। সেই নারীরা অবশ্যই পাড়ার বৃদ্ধারা। যাঁরা এখনো ইসারায় ইঙ্গিতে দেবযানীর 'বন্ধ্যাত্ব' প্রসঙ্গটি তুলে মহিমের জীবনের অপূর্ণতার জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন। অথবা মহিমের যা চেহারা, স্বাস্থ্য, তাতে যে এখনো টোপর মাথায় দিয়ে ছাঁদনাতলায়

দাঁড়ালেও বেমানান হয় না, এই কথাটি ঘোষণা করেন।

আর পুরুষরা, সেও কর্তারাই।

তাঁরা ছাড়া এত অবসর আর কার? অবসর-বিনোদনের জন্যেই তাঁদের অন্যের বাড়ি এসে ঢুকে পড়া, আর সেই অন্যের হাঁড়ির খবর নেওয়া।

এদের কবলে পড়ে গিয়ে ছুটির সকালটা বরবাদে যায়। অবশ্য তার মাঝখানে মাঝখানে তনু দু'একবার চা সাপ্লাই করে যায় এবং তার সঙ্গে ছুটির সকালের বিশেষ প্রাতঃরাশ। মুখরোচক এবং মহিমের প্রিয় বস্তুসমূহ।

আর সে সব গাড্ডায় না পড়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন মহিম। দিদির ইচ্ছানুসারে শশাঙ্ককে নেমন্তন্ন করবার দায়টা স্বেচ্ছায় ঘাড়ে নিয়ে। দিদি তো বলছিল, তনু তোর হাত খালি হলে, একবার ওবাড়িতে বলে আসিস তো খুড়ো শশাঙ্ক আজ ওবেলা এখানে খাবে।

মহিমই বলে উঠলেন, আচ্ছা আমি বলে আসছি।

ও মা তুমি আবার কেন?

তনু চেঁচিয়ে উঠেছিল, ও বড়মামা জলখাবার খেয়ে যাও! মা কপির বড়া ভাজছে।

আসছি এক্ষুণি।...

মহিম হেসে বলেছিলেন, ইতিমধ্যে সবগুলো যেন সেঁটে ফেলিস নে, মায়ের কাছে ঘেঁষে বসে।

উঃ, বড় মামার যা কথা!

হি হি করে হেসে উঠছিল তনু, এক্ষুনি আসবে কিন্তু।

কিন্তু সেই 'আসা'টার কথা আর মনে পড়েনি মহিমের। শশাঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে কেমন একটা বিতৃষ্ণা আর অন্যমনস্কতার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলেন।

হাঁটতে হাঁটতে ছেলেবেলার স্মৃতির ঝলক। শশাঙ্কর সেই সম্ভাবনাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দুঃখ আসছিল মহিমের। অমন ছেলেটা, কিছুই হতে পারল না! কী এক সাপ ব্যাঙ মাছ হয়ে বসে রইল!

হঠাৎ আয়নার মুখটা ঘুরে গেল।

মহিম সেই আয়নায় নিজেকে দেখতে পেলেন।

আচ্ছা, আমিই বা কী এমন হাতী-ঘোড়া হতে পারলাম? স্কুলের পরীক্ষায় শশাঙ্কর থেকে কম নম্বর পেলেও, নেহাত বাজে ছাত্রও ছিলাম না। হলামটা কী? বাহাদুরির মধ্যে ওদের মত ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে, আর বাকি সময়টা মাছ ধরে

তাস খেলে না কাটিয়ে মেসে বাস করে আর অবসরকালে বেহালা বাজিয়ে, বই কাগজ পড়ে, আর 'স্বপ্ন' দেখে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম।

ভাবনার মাঝখানে থমকে গেলেন মহিম হালদার, জীবনটা কাটিয়ে দিলাম? কী আশ্চর্য! হয়তো বলা যায়, জীবনটাকে অপচয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এলাম।

এতদিনে সেই বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে জমিয়ে রাখা সম্পত্তিটিকে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করবার দিন পেলাম।

দাসত্বের চাকা থেকে মুক্তি ঘটেছে।

মহিম হালদার নামের মানুষটা এখন বন্ধনহীন!

অবশ্য এই 'মুক্ত অবস্থাটি'র জন্যে মহিমের যে একটা নিজস্ব মনোবৃত্তি অনুসারে একটি ছাঁচ গড়া ছিল, সে ছাঁচটা আর কাজে লাগবে না। সেই 'স্বপ্নীয়' ছাচটি ভেঙে ফেলে, নতুন করে কিছু গড়ে নিতে হবে। যদিও এতদিনের যত্নে লালিত ছাঁচটি ভেঙে ফেলে দিতে হবে ভেবে মনের মধ্যে একটা শূন্যতা আসছে। কিন্তু কী আর করা যাবে?' সেই 'স্বপ্নজীবনে'র সঙ্গিনীটি তো হাত পছলে পালিয়েই গেল। কোনো একদিন তাকে ঠিক ধরে ফেলতে পারব, এমন ভ্রমাত্মক ধারণাটি আর বজায় রাখা গেল না তো!

মহিমের সেই কাল্পনিক জীবনের সঙ্গিনী এখন মহিমময়া সম্রাজ্ঞীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ঘরসংসার রান্না-ভাঁড়ারের ঘর, বাগান-পুকুর, দেব-দ্বিজ, বার-ব্রত, গোয়াল-দোহাল সম্বলিত আদিগন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে মহিম হালদার নামক লোকটা একটা তৃণগুচ্ছমাত্র। যেমন তৃণগুচ্ছটি, ওই মহিমময়ী, পরম পুলকে সদ্য আবির্ভূতা গোমাতা ও তস্য বৎসটির মুখে ধরেছিল। না, ওই মহারাণীর রাজ্যে তুচ্ছ একটি প্রজামাত্র হয়ে থাকার বাসনা নেই মহিমের। তাকে আবার একটা নতুন ছাঁচের কথা ভাবতে হবে, যে ছাঁচটাকে সম্পূর্ণতা দিতে কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

উপায় কী? ফেলেছেড়ে অপচয় করে বরবাদ করে ফেলবার তো নয় জিনিসটা। একবার ভিন্ন দু'বার তো পাওয়া যায় না এ বস্তু!

ব্যাপারটা আশ্চর্য! এই একটু আগে শশাঙ্কর মুখ্যসুখ্যু ছেলেটা ঘোষণা করে যে কথাটা বলে উঠেছিল, বিদ্বান বুদ্ধিমান বয়স্ক মহিম হালদারের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হল।

. অনেক বরবাদ গেছে, আর নয়। জীবন একবার ভিন্ন দুবার পাওয়া যায়?

. আচ্ছা, 'জীবনটাকে পাওয়া' কথাটার অর্থ কী?

খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে ভেসে চলেছেন মহিম, নিজেকে নিজে হাতে পাওয়া, আর অপরের স্বত্ব-স্বামিত্বহীন সেই 'আমি'টাকে উপভোগ করার নিশ্চিন্ত সুখ এই নয় কী ?

চিরদিনের আত্মপ্রেমী মহিম হালদার এখন জীবনকে পাওয়ার এটাই ব্যাখ্যা করলেন। মহিমের অফিসের শরদিন্দুবাবুর এক ভায়রাভাই আছে, সে না-কি বলে, 'সুখ' কথাটার মানে জানো তোমরা শরদিন্দু ? জানো না, কী করে জানবে ? তার ধারপাশ দিয়েও তো হাঁটোনি কখনো। সুখ হচ্ছে, আমি শালা যা ইচ্ছে করব, কেউ খবরদারি করতে আসবে না, যত ইচ্ছে মদ খেয়ে নর্দমায় পড়ে গড়াগড়ি দেব, কেউ চোখ রাঙাবে না, শাসন করতে আসবে না, প্যানপ্যান ঘ্যানঘ্যান করবে না, তাকে বলি 'সুখ'।

কাজেই 'জীবন পাওয়া'র হিসেব সকলের সমান নয়।

কিন্তু গান গাইছে কে কোথায় ?

হঠাৎ কে পাশ থেকে ডেকে উঠল, দাদা আপনি পায়ে হেঁটে ইস্টিশনের দিকে ?

তাকিয়ে দেখলেন পানের দোকানের বিনোদ। হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে ওঠে, কলকাতায় যাচ্ছেন নাকি ?

নাঃ ! আজ যাব কেন ? যাবার কথা তো 'আসছে কাল'।

অ ! তা এদিকে ?

এই সকালে একটু হাঁটলাম।

তা ভাল। সকালে হাঁটা ভাল।

আচ্ছা বিনোদ, কে কোথায় যেন খুব গলা খুলে গান গাইছে মনে হচ্ছে না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। দীনু কুমোরের পাগলা-ছাগলা ছোট ছেলেটা বলে মনে হচ্ছে। ছোঁড়ার গলাটা খুব তেজী। অনেকদিন তো নিরুদ্দেশ ছিল। আবার একবার ফিরল বোধহয়।

দীনু কুমোর নামটা যেন পরিচিতই মনে হল মহিমের, তবে চেহারাটা ঠিক মনে পড়ল না। হাসলেন একটু। এখানের কাকেই বা বিশেষ চিনি ! নেহাত যারা এসে হানা দেয়, তারা ব্যতীত।

'পাগলা-ছাগলা' শব্দটা ভেবে আর একটু হাসলেন। এই সব গ্রাম্য শব্দটব্দর অভিব্যক্তি খুব প্রাঞ্জল।

বললেন, নিরুদ্দেশ হয়ে গিছল ?

ওই তো, ওই তো রোগ ছোড়ার। আছে আছে বেশ আছে, হঠাৎ একদিন

উধাও। বাপটা কেঁদেকেটে মরে, ভাইরা লোকদেখতা একটু খোঁজে, তো আবার হঠাৎ একদিন এসে উদয় হয়। তো এবারে অনেকদিন বাদ ফিরেছে। কুমোর তো আশা ছেড়েই দিয়েছিল।

কথার পিঠেই কথা বলেন মহিম, মা নেই?

সেই তো কথা। মা নেই। থাকলে কি আর এমনটা হতে পারতো? মা মরেছে ছেলেটাকে জন্ম দিয়েই।

মহিম কানটা পাতলেন।

গানের কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না, স্বরটা ভেসে আসছে।

বিনোদ বলল, একটা মজা দেখেছেন? কানা অন্ধ পাগলছাগল, এদের ভেতর কিন্তু প্রায়ই গান গাওয়ার শক্তিটা দেখতে পাওয়া যায়। ভগবান একদিকে মারেন, আর একদিকে দেন। তা দেখেন নাই ওরে?

আমি? আমি কোথা থেকে দেখব?

তা অবিশ্যি ঠিক। আপনি আর গ্রামে-ঘরে থাকেন ক'দিন? তো আপনাদের বাড়ি যায় খুব। বড় বৌদিদি খুব স্নেহ করেন।

বড় বৌদিদি!

অর্থাৎ দেবযানী।

মহিম একটু কৌতুকের হাসি হাসলেন। মহিমময়ীর ভাবমূর্তিটি নিখুঁত।

হেসে বললেন, তাই নাকি?

বিনোদ অবিশ্যি নেহাতই দীনহীন মানুষ, তবে মহিম ডেকে কথা বলেন বলেই সাহস করে কথা বলে। আর বিনোদের নিজের দাদা মহিমের কোনো একদার সহপাঠী বলে মহিমকে 'দাদা' ডাকতে সাহস পায়।

এখন সোৎসাহে বলে উঠল, ওঁর যে বড্ড মায়ার শরীর! পাগলাছাগলা বলে সবাই হ্যানস্থা করে, উনি তা করেন না। যখন আসে থাকে, আপনাদের বাড়িতেই তো ওর খাওয়ার বরাদ্দ বাঁধা।

মহিম আর একটু কৌতুকের হাসি হাসলেন।

মমতাময়ীর মমতাটুকু এতো ভাগ হয়ে গিয়েই অভাগা মহিম হালদারের এই হাল। অবস্থাটা যেন এক মস্ত বড় লিমিটেড কোম্পানীর এক পয়সার অংশীদার!

আর একটা কথা ভেবে জোরে হেসে উঠলেন মহিম। বলে উঠলেন, তা উনি না হয় খুব স্নেহময়। কিন্তু হালদারবাড়ির আর সবাই? সবাইকে তো খুব স্নেহপরায়ণ বলে মনে হয় না।

বিনোদও হাসল। তবে ছোট মুখে বড় কথা কয় না সে। শুধু বলল, ওঁর ইচ্ছের ওপর কথা কইবে কার সাহস?

এখন মহিম আবার মনে মনে হাসলেন, ভাবলেন বুঝলাম। নেশাটা খুবই জবর। বোতলের মদের থেকে কিছু কম নয়।

গানটা যেন থেমে গেল।

কিছুক্ষণ আর একটু থামার পর ঘুরে ফিরে প্রথম লাইনের ধুয়োটা শোনা গেল না।

মহিম দেখলেন রিকশা স্ট্যাণ্ডের পাশ দিয়ে কে একটা লোক জোরে জোরে দুটো হাত দোলাতে দোলাতে চলে গেল। রোগা হাড্ডিসার গড়ন, দাড়ি-জঙ্গলে মুখ।

বিনোদ বলে উঠল, ওই দেখুন। ওই মোনা। সাধে আর লোকে পাগল-ছাগল বলে। দীনুর আর চারটে ছেলে দিব্যি তুখোড়, ঘোড়েল, ধুরন্ধর, ধান্দাবাজ। অথচ এই শেষেরটাই—

বিনোদের আক্ষেপের সুরে মনে হলো, যেন আরো একটা ছেলেও ঘোড়েল ধুরন্ধর ধান্দাবাজ হলেই দীনু সুখের সাগরে ভাসতে।

কথাটা সত্যি। দীনুর পাঁচ ছেলের মধ্যে আর চারটেই দিব্যি করিৎকর্মা। বড়টা তো একটা ইট ভাঁটা খুলে বসে দিব্যি পয়সাকড়ি করছে, মেজটা কেমন করে কে জানে এই চাক ঘুরনো কুমোরের ঘরের ছেলে হয়েও একটি খানদানী কুমোরের ঘরের মেয়ে বিয়ে করে ফেলে জাতে উঠে গিয়েছে। এখন সে হাওড়ার পঞ্চাননতলায় তার শালার সঙ্গে আর্টের ঠাকুর গড়ে। বড় বড় প্রতিমার পার্শ্বচরিত্রগুলো গড়তে দেয় তাকে শালা।

আর শ্বশুর তাকে একমাত্তর জামাই বলে বাড়িতে থাকতে দিয়েছে।

দীনুর সেজ ছেলেটাও নিজের চেষ্টায় শোলার কাজ শিখে দিব্যি করে খাচ্ছে। কলকাতার বাজারে তার কাজের চাহিদা আছে। চতুর্থ ছেলেটা পিতৃপুরুষের লাইন থেকে একেবারে সরে গিয়ে সিনেমা হাউসে টিকিট বেচার কাজ যোগাড় করে ফেলে বহাল তবিয়তে আছে। তলে তলে আরো কিছু বেচাকেনা করে সে। অনেক ধান্দায় ঘোরে সে।

শুধু ছোট ছেলেটা। সে যেন সৃষ্টিছাড়া।

এ রকম অবোধগম্য লোককে সাধারণ মানুষ 'পাগল-ছাগল' আখ্যাই দিয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের যে একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি সর্বসম্মতিক্রমে গড়া আছে, তার মধ্যেই তাদের গড়ন, আর চলাফেরা। সেই মাপকাঠির বাইরে তার ঊর্ধ্বে যে আরও কোনো জীবন আর জগৎ থাকতে পারে এমন অনাসৃষ্টি কথা মানতে রাজী নয় তারা।

অতএব কেউ যদি ওই মাপকাঠির বাইরে ছিটকে সরে যায়, কেউ যদি সেই 'আর এক' জগতের সন্ধানে ঘুরে মরতে যায়, তাকে 'পাগল' বলে দেগে না দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কী করে?

জন্মকালে মা মরা 'মোনা'কে কে যে মানুষ করার দায়িত্ব নিয়েছিল কে জানে, বাড়িতে তো আর দ্বিতীয় মেয়েছেলে ছিল না। হয়তো ওপর দিকের দাদা চারটেই হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে টেনে বড় করে তুলেছে।

অথবা কাউকেই কিছু করতে হয়নি। মরেনি বলেই বেঁচে থেকেছে, এবং বেঁচে থেকেছে বলেই বাড়বৃদ্ধিটা ঘটেও চলেছে যথানিয়মে। যে নিয়মে ডোবার ধারের বনকচু গাছের ঝাড়ের বাড়বৃদ্ধি।

কিন্তু ওই এক রোগ ছেলের, সবদা খাপছাড়া, দাদারা বলে 'বদমাস'। বাপ বলে, 'ন্যালাক্ষ্যাপা' আর পাড়ার পাঁচজনে বলে 'পাগল-ছাগল।' সকলেই ধরে নিয়েছে ওটার কিছু হবে না।

তবু দীনু তাকে ছোট থেকেই কাছে ডেকে ডেকে নিজের সঙ্গে বসিয়ে জাত ব্যবসাটায় লাগাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু চেষ্টাই সার। কোথায় কোন্‌খানে খেলে বেড়ায় নিপাত্তা হয়ে, টেনে এনে এনে কাজে বসানোই দায়।

আবার বসালেও, হাত না চালিয়ে, মুখ চালায় বেশি। হরেক প্রশ্ন তার, মাথার মধ্যে হরেক জিজ্ঞাসা। অবিরত, 'আচ্ছা বাবা'—এটা কেন? আচ্ছা বাবা, ওটা কেন?···আচ্ছা বাবা, এরকম কেন?···কেন? কেন? কেন?

জবাব দিতে দিতে হঠাৎ এক সময় রেগে গিয়ে বলে ওঠে দীনু, যা বেরো। তোকে আর আমার কাজের সাহায্য করতে হবে না। কেবল ক্যানো ক্যানো ক্যানো! মাথা খারাপ করে দিলো।

দীনু অবশ্যই বিশেষ উচ্চমানের কুমোর নয়, জাত ব্যবসা হাঁড়ি কলসী গড়ার ঊর্ধ্বে আর উঠল না কখনো। তার বাপ কাকা বরং কিছু মেটে পুতুল-টুতুল গড়তো। উঁচু খোঁপা বাঁধা 'বেনেবৌ' পুতুল, নাকে কানে নথ মাকড়ি পরবার ফুটোদার গোদা গুমসো 'গিন্নী পুতুল', দেওয়ালীর সময় হাতে মাথায় পিদ্দিম বসানো 'গয়লামেয়ে' পুতুল। দীনু ওসবের ধার ধারে না। ধারবেই বা কোথা থেকে? জোয়ান বয়েসে বৌ মরেছে, মা-মরা বাচ্চাটাকে নিয়ে নাজেহাল, তাছাড়া ছেলেগুলো সব উচকা অন্যমুখী! সাহায্যকারী বলতে কেউ নেই।

তাছাড়া দীনুর বাপ-ঠাকুর্দার আমলে কাজের কী রমরমা ছিল। চাকের চাহিদাই ছিল অনেক। প্রাণে উৎসাহের জোয়ার খেলতো।

এখন মাটির বাসনের চলন ক্রমেই কমে আসছে। মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধার পাট তো কোন্ জন্মে উঠে গেছে, গ্রামে গঞ্জে শহরে বাজারে কোথাও আর কারো হাঁড়ি ফাটবার ভয় নেই। রাস্তার ভিখিরিটাও একমুঠো চাল ফুটিয়ে নিতে একটা তাল-তোবড়া অ্যালুমিনিয়ামের বাটি সংগ্রহ করে রাখে।

কাজেই এখন আর চাঁদ-সূর্যিতে 'গ্রহণ' লাগলে কুমোরের ঘরে দু' পয়সা আসে না।

মাটির কুঁজো কলসীর জায়গা দখল করেছে প্লাসটিকের বালতি। 'টিউবেল' থেকে ঘচাং ঘচাং জল নিতে ওটাই সুবিধে। আরো সুবিধে জল গড়িয়ে খাবার খাটুনি নেই, ছোঁয়াছুঁতের বালাই নেই। যেখানে সেখানে বসিয়ে রেখে, ঘণ্টাভোর লাইন দিয়ে গাল-গল্প করা যায়।

আবার টিউবওয়েলের আধিক্যে পাতকুয়োও মর্যাদাহীন, 'কুয়োরপাট'-এর অর্ডারও কম।

গরুগুলো আগে ইয়া ইয়া মাটির গামলায় জাবনা খেতো, এখন কী গেরস্ত, কী গোয়ালারা তার বদলে কাঠের পীপে, লোহার ড্রাম ব্যবহার করে। আর গ্রামে বিজলীবাতি এসে পর্যন্ত প্রদীপের চাহিদাও নেই বললেই চলে। লক্ষ্মীর ঘরেও তো সুইচ টিপলেই আলো। নেহাত যারা ঘরে বিজলীবাতি এনে উঠতে পারেনি, তাদের ভরসা কেরোসিন।

কুমোরবাড়ির কাজ বাড়তো রথের সময়ও। মোটা মোটা চাকা লাগানো খেলার রথ বানাতে হতো গাদা করে, তাদের গায়ে গোলাপী রং, তাতে অভ্রর গুঁড়ো ছড়ানো, ভিতরে জগন্নাথ বসানো।

কালক্রমে সেই মাটির রথও এখন বিলুপ্তপ্রায়, ছেলেপুলের খেলার জন্যে কাঠের থ, টিনের রথ!

কাজেই ক্রমশ শেষ বেশ ঠেকেছে মাটির খুরি গেলাস, দইয়ের খুরি, মিষ্টির ভাঁড়ে। গুলোর নিত্য চাহিদা। এইসব বৃত্তিজীবীর উত্থান-পতনের ইতিহাসের মধ্যে সমাজ-জীবনের বিবর্তনের ইতিহাস নিহিত থাকে।

তা যাক, মোনা এগুলো বানাতে শিখেছিল, হাতও মন্দ নয়। একই চাক ঘুরিয়ে নানা গড়নের জিনিস বেরিয়ে আসে শুধুমাত্র একটু হাতের কারসাজিতে এটা প্রথম প্রথম মোনাকে খুব উদ্দীপ্ত করতো, সেই ঝোঁকেই শিখে ফেলা।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কী হ'ল, বাপ এসে দেখে, মোনা মাথা মাটির তাল নিয়ে চুপচাপ বসে আছে।

বাবা বলে উঠল, হাত গুটিয়ে বসে আছিস যে ?

মোনা অনায়াসে বলে উঠল, মাটিরা আর ভাঁড় খুরি হতে চাইছে না বাবা।

অ্যাঁ ! কী বললি ?

বাপ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, মাটিরা আর ভাঁড় খুরি হতে চাইছে না ?

তাই তো বলছে।

এরপর আর কোন বাপ ধৈর্য বজায় রাখতে পারে ? তাছাড়া 'ঠাণ্ডামেজাজ' বলে দীনুর কিছু আর খ্যাতি নেই।

দীনু তেড়ে উঠে বলল, মাটিগুলো তোরে বলেছে ? ফাঁকিবাজ লক্ষ্মীছাড় হারামজাদা শুয়োর। আবার আজগুবি কথা বানাতেও শেখা হয়েছে।

মোনা বলল, বানাচ্ছি না বাবা। স্পষ্ট শুনলুম গুনগুন করে বলতেছে, আর ভাঁড় খুরি হতে পারছিনে বাবা।

বটে ! বটে ! কাজের ভয়ে ন্যাকা পাগল সাজ হচ্ছে ? তোর স্পষ্ট শোনা বার করছি। মিথ্যুক পাজা।

ঠাস ঠাস চড় পড়ে মোনার চড়ানে গালে।

মা-মরা ছেলের প্রতি ভেতরে সাতখানা প্রাণ থাকলেও, বহিরঙ্গের আবরণে দীনু এই রকমই।

'ঠাস এর ধাক্কায় মোনা ছিটকে উঠে বলল, নিজেদের কান নাই তাই শুনতে পায় না, আর আমারে বলতেছে মিথ্যুক।

তীরবেগে বেরিয়ে গেল মোনা।

গেল, গেল তো গেলই। পাঁচ-সাতটা দিন একদম না-পাত্তা।

দীনু মাথা চাপড়ালো, বুক চাপড়ালো, বড় মেজো, সেজো, ন' ছেলেদের ধিক্কার দিল হারিয়ে যাওয়া ভাইটাকে খুঁজতে সম্যক 'গা' করছে না বলে, আর ছেলের বাপকে পাল্টা ধিক্কার দিল, পাগল-ছাগলটাকে মার লাগানোর জন্যে এবং যখন পাড়ার লোক বলতে লাগল, 'একবার 'জানবাড়ি' গিয়ে শুণিয়ে আসা হচ্ছে না কেন ?' তখন হঠাৎ একদিন মোনার আবির্ভাব।

রুক্ষ মাথা, ধুলো ধুসরিত পা, খড়িওঠা গা, পরনের কাপড়খানা থেকে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে।

ঘরে পরে সবাই ছেঁকে ধরে, গিয়েছিলি কোথায় ?

মোনা সবিনয়ে নিবেদন করে, গেছিলুম বসবাসের জন্যে একটু ঠাঁই খুঁজতে, তে মনের মত হলো না। বাপের জন্যে মনটাও কেমন করে উঠলো, চলে এলুম।

বসবাসের জন্যে ঠাঁই খুঁজতে ? কেন, এখানে এই সাত পুরুষের ভিটে, চারচালা ঘর, পাকা দালান কোঠা, (মেজদা তার ইঁট ভাঁটার ঝড়তি-পড়তি ইঁট দিয়ে একখানা দালান কোঠা বানিয়েও ফেলেছে।) এতে তোর কুলোচ্ছে না ?

মোনা মাথা চুলকোয়, সমিস্যে তো সেইখেনেই। কুলোচ্ছে, আবার কুলুচ্ছেও না। প্রাণের মধ্যে বসে কে যে ধাক্কা মারে, ঘর খোঁজ মোনা ঘর খোঁজ।

সেই প্রথম।

তারপর দেখা গেল, বাপের বকুনি, ভাইদের গঞ্জনা, ভাজেদের অবহেলা, এসব কোনো কারণই নয়, এটাই মোনার ধাতে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে যায়, কোনোদিন বাড়া ভাত ফেলে, চান করতে বেরিয়ে, কোনোদিন ভোর সকালে ঘুম থেকে উঠেই, কোনোদিন বা এখান-সেখান ঘুরতে ঘুরতে কখন কোন-মুখো।

কোথায় গেল ? কোথায় গেল ? কখন গেল ? শেষ কে দেখেছে ? কী বলেছিল কাকে ?

বাস। বেপাত্তা।

প্রতিবারই মনে হয়, যাঃ এই বোধহয় শেষ। আর বোধহয় আসবে না। আর 'জানবাড়ি' ছোটা, গণৎকার ডেকে খড়িপাতানোর উৎসাহ থাকে না।

কিছুকাল পরে আবার একদিন এসে উদয় হয়। ধূলিধূসর চেহারা, জাটলে মুখ, অথচ সে মুখে হাসির ঘাটতি নেই।

কী রে মোনা, তোর ঘর যোগাড় হল ?

মোনা প্রশ্নকর্তাকে নস্যাৎ করার ভঙ্গীতে অবজ্ঞার হাসি হেসে উত্তর দেয়, শোনো কথা ! পেলে আবার এখেনে ফিরে আসি ?

দীনু অবশ্য প্রতিবারই প্রথম দর্শনে একবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলে, কোনদিন এসে দেখবি বাপটা নাই।

মোনা বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলে, তা নেয়তি যদি তাই মেপে থাকে, কে খণ্ডাবে !

হুঁ। নির্মায়িকের ঝাড। বড়টি থেকে ছোটটি সব সমান। তা এই যে এতো এতোদিন বাড়িছাড়া হয়ে থাকিস, থাকিস কোথায় ? খাস কি ? পরনের কাপড় জোটে কোথায় ?

উরেব্বাস। সে হিসেব দিতে গেলে তো মহাভারত !

তো চেহারা দেখে তো মনে হয় না নেয়েছিস খেয়েছিস ঘুমিয়েছিস।

মোনা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, তাহলে তো দীনু কুমোরের ব্যাটা মোনা কুমোরকে

'সিদ্ধোপুরুষ' বলতে হয়। ছ' মাস দশ মাস না খেয়ে না লেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

এবারে আর যাসনে বাপু! কথা দে।

মোনা বলে, কথা দিই কেমন করে? ভেতরে ছপটি মারলে?

তবু থাকেও হয়তো কিছুদিন!

ভাজেরা ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক খাওয়া-দাওয়ার যত্নটা করে। যতই হোক খেঁকি বুড়ো শ্বশুরটি তো এখনো বর্তমান। নড়ে বসবার ক্ষমতা না থাক, গলা চড়াবার ক্ষমতা আছে। এবং পাড়ার লোকের জোড়া জোড়া কান আছে।

তবে মোনা ওই ভাজেদের যত্ন-আত্তির ধার বড় ধারে না, তার আসল ভরসা হালদার বাড়ির বড়গিন্নী। লোকে দেবযানীকে বলে, 'তোমার পুষ্যিপুত্তুর'।

যতদিন পরেই আসুক, এসেই একেবারে গোয়ালের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে উঠোনে ঢুকে হাঁক পাড়ে, কই গো মা জননী কোথায়? খিদেয় যে পিত্তি নাড়ি চুঁইয়ে গেল।

সাড়া পেলেই দেবযানী যেখানেই থাকুক বেরিয়ে এসে বলে ওঠে, এতোদিন ছিলি কোথায়? কী চেহারা হয়েছে? দেখগে যা আর্শীতে।

দেবযানীর এই আদিখ্যেতা অবশ্য বাড়ির কেউই আহ্লাদের চোখে দেখে না। না ননদ, না ভাগ্নী, না জা! এমনকি ছোট ছেলেপুলেগুলো পর্যন্ত (হয়তো এঁদেরই মনোভঙ্গীর প্রভাবে) মোনাকে আসতে দেখলেই আড়ালে গিয়ে মুখ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে বলে, আবার এসেছে পাগলটা। এখন বড়মা গাদা গাদা খাওয়াতে বসবে।

কিন্তু তাতে কি এসে যাচ্ছে? খোদ মালিকেরই যে বেশ একটু প্রশ্রয় ভাব অর্থাৎ প্রতাপ হালদারের। মানে তাকেই তো সবাই এ সংসারের হর্তা-কর্তা বিধাতা বলে জানে।

প্রতাপও মোনার সাড়া পেলে বেরিয়ে আসে। আর তার কোলকুঁজো শরীরটার সঙ্গে মানানসই ঈষৎ খোনা খোনা গলায় ডাক দেয়, এই যে বৌদি, তোমার হারানো মানিক এসে গেছেন। একেবারে খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখছেন। তা এই চোখে আঁধার দেখা পর্যন্ত ঘুরে মরিস কেন রে ব্যাটা? একটু সময় থাকতে আসতে পারিস না?

মোনা অবজ্ঞার গলায় বলে, কাজ ফেলে খ্যাঁট মারতে আসবে, মোনা এমন পেটুক না।

ও বাবা, তাও তো বটে। তা এতো কি কাজ রে তোর?

মোনা আরও অবজ্ঞার গলায় বলে, শোনো কথা। কাজ নাই? বিনে কাজে ভগবানের রাজত্বে কারো নিস্তার আছে? নিজে বোঝেন না?

তাও তো বটে।

প্রতাপ হেসে ওঠে। বলে, তা এখন তো কিঞ্চিৎ ফুরসৎ হয়েছে? খা ভালো করে।

বাড়ির মহিলাকুল প্রতাপের এই স্বভাববিরুদ্ধ উদারতা দেখে ভিতরে ভিতরে রাগে ফোঁসেন। সেই অবাক্ত কথাটি বাক্ত করলে এই দাঁড়ায়, হুঁ এ হচ্ছে বড়গিন্নীকে তোয়াজ। চিরদিন এই মানুষটিকে তোয়াজ করে করেই এতো বাড বাড়ানো হয়েছে ওঁকে। সংসারে আরো যে তিনটে মেয়েমানুষ রয়েছে তারা যেন ফালতু। সকল পরামর্শ বড়গিন্নীর সঙ্গে। কিসের এতো মান রাখা বুঝি না বাবা।'

'বুঝি না' বললেও প্রতাপের ভাগ্নী মনে মনে বলে, 'বুঝি বাবা।' মান রাখাটি আর কিছু না, মন রাখা। দু'জনাই দু'জনকে মান রাখার কৌশলে মন রাখছেন। ছোট মামাও যেমন ন্যাকাচণ্ডী। এদিকে তো ছোট মামার হাত দিয়ে জল গলে না, কিন্তু বড মামীর এই পুষ্যি পুত্তুরটির ব্যাপারে দিলদরিয়া।'

তা ভাগ্নী কিছু ভুল ভাবে না। মোনা সম্বন্ধে প্রতাপ যেন একটু দিলদরিয়াই। অনায়াসেই হেসে হেসে বলে উঠতে পারে, তা এখন তো একটু ফুরসৎ হয়েছে রে ব্যাটা, খা ভালো করে।

'ফুরসৎ' শব্দটা মোনা সম্পর্কে হাস্যকর অবশ্যই, তবে মোনা বোঝে না এটা ঠাট্টা। তাই বলে, সেই লেগেই তো চলে এলুম মায়ের কাছে।

কিন্তু আশ্চর্য, দেবযানী যখন মোনাকে সামনে বসিয়ে পরিতোষ করে খাওয়াতে খাওয়াতে প্রশ্ন করে, এত কী কাজ রে তোর মোনা?

মোনা তখন মাথা চুলকে বলে, মোনা নিজেও তো তাই ভাবে গো বড়মা। কিন্তু কাজ তো আছে নিয়াস। নচেৎ সর্বক্ষণ পিঠে ছাট মারতেছে ক্যানো? মাথার মধ্যে উলিঝুলি করে ক্যানো?

দেবযানী গম্ভীর ভাবে বলে, কাজের বয়স হয়েছে, তবু কোনো কাজ করিস না, এতেই অমন হয় রে মোনা। একটা কিছু কর্ দিকি নিয়ম করে।

তো কী করব আপনি বলে দ্যাও তো? ওই ভাঁড খুরি গড়া? ওতে আমার মন নাই, মাটিগুলা আপত্তি জানায়।

দেবযানীর তো হেসে ফেলার কথা, তবু হাসে না। বলে, তুই মাটিগুলোর কথা বুঝতে পারিস?

তা স্পষ্ট শুনতে পাই যে।

তবে, তোর কোন্ কাজটা ইচ্ছে বল্ তো?

আজ্ঞে সেটি তো এখোন বলতে পারছিনে। আগে মনের মতোন একটা বাসো-স্থান ঠিক হোক।

তো, তোর যদি তোদের নিজেদের বাড়িটা ভালো না লাগে, এখানে এসে থাক না? অনেক কাজ দিতে পারব তোকে।

মোনা হঠাৎ ফস করে জ্বলে ওঠে, না না, ওসব চাকর-ফাকরের কাজ করতে পারব না।

দেবযানী আহত গলায় বলে, আমি কি তোকে তাই বলছি? বাড়ির লোক কাজ করে না? আমি করি না? ছোটবাবু করে না?

মোনা লজ্জিত গলায় বলে, মুখ্যু মানুষ কী বলতে কী বলে বসি! তো এখেনে থাকা মানেই তো সেই 'গোপীচন্দনপুরে'ই থাকা হ'ল?

দেবযানী একটা নিঃশ্বাস ফেলে। বলে, গোপীচন্দনপুরটা অ্যাতো কি খারাপ রে মোনা? এটা তোর জন্মভূমি।

মোনা অনায়াসে বলে, তো সেই লেগেই তো পচা। কী জন্মটাই জন্মেছি! হুঁ! অন্যত্তর গিয়ে একটা নতুন জন্মের বাসনা। মা জননী! সেই লেগেই তো মনের মতোন ঠাঁই খুঁজে বেড়াই!

দেবযানীর চোখে একটা গভীর ছায়া নামে।

এইভাবেই মোনা দু' দশ দিন আসে যায় গল্প করে, (অথবা বলা যায় দেবযানীই গল্প ক'রে) হঠাৎ একদিন শোনা যায়, দীনু কুমোরের ছোট ব্যাটা আবার নিরুদ্দেশ।

তুচ্ছ একটা প্রাণী।

তবু দেবযানীর মনের মধ্যে গভীর একটা শূন্যতা বোধ ভেসে আসে তার অভাবে।

খেতে বসে যখন একগাল হেসে বলে, মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হয় বটে মা জননী, তোমার নিকটেই থেকে যাই বড়মা, এমন যত্ন কোরে আহারটি করায়, এমন লোক তো ত্রিভুবনে আর দেখিনে—

তখন মুখে কী পরিতৃপ্তির আহ্লাদ ফুটে ওঠে ছেলেটার।

একটা মাত্র পেটের মধ্যে যে কতখানি মাল চালান করা সম্ভব, সেটা মোনাই দেখিয়ে দিতে পারে।

সেই ছেলেটার অভাব একটা বন্ধ্যা মেয়ের পক্ষে পরম শূন্যতা বৈকি।

তা এবারে ক্রমশই সে শূন্যতা বাড়তে বাড়তে, একটা নৈরাশ্যের গভীর গহ্বর সৃষ্টি করে ফেলেছিল। ঘরে পরে সবাই বলতে থাকে, নাঃ, এবার আর আসবে না!

দীনু ও শণের নুড়ো মাথাটাকে দু' হাটুর মধ্যে গুঁজে বসে থাকে, আর হঠাৎ হঠাৎ বলে ওঠে, নাঃ আর আসবেনি।

দীনুর অন্য ছেলেরা বলে, তবে তোমার ছোট ছেলে এবার মনের মত ঠাঁই খুঁজে পেয়েছে।

দীনু উদাসভাবে বলে, 'আছে' কি নাই তারই ঠিক নাই।

কিন্তু হালদারবাড়ির দেবযানী হঠাৎ হঠাৎ শুনতে পায় ওই বুঝি কে কোনখান থেকে ডেকে উঠল, এই যে আপনার হতভাগা ছেলেটা এসে গেল বড়মা। ভাত ক'টা তাড়াতাড়ি দিয়ে স্নান। পেটের মধ্যে আগুনবিষ্টি হতেছে।

সাত জায়গায় ঘুরে ঘুরে, অনেক রকম কথাও শিখেছে ছেলেটা।

তা হঠাৎ সেই প্রত্যাশিত ডাকটি শুনতে পেল দেবযানী।

কিন্তু বড় অসময়ে নয় কী?

নতুন আসা গরুটাকে গোয়ালে প্রতিষ্ঠিত করেই দেবযানীর তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে চলে আসবার কথা। গত রাত থেকে মহিমের কাছে অপ্রতিভ অপ্রস্তুত হয়ে রয়েছে। অথচ ব্যাপারটা উল্টোই হবার কথা। দেবযানীরই তো 'কেস' স্ট্রং ছিল। অপ্রতিভ হবার কথা মহিমেরই। পাকে-চক্রে পাশার দান ঘুরে গেল। তবু দেবযানী আশা করছিল, মহিমকে তার অবস্থাটা বুঝিয়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ।

গোয়ালের দরজায় দাঁড়িয়ে চলে আসার আগে শেষমেষ একবার 'মা ভগবতী'কে নমস্কার করে সরে আসছে, সেই ভাঙা ভাঙা গলা বেজে উঠল, চলে এলুম মা জননী।

তবে স্বর তেমন উদাত্ত নয়, একটু চাপা।

দেবযানী চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, মোনা!

মোনা বলল, মোনার ভূতও বলতে পারো আজ্ঞে।

এতদিন কোথায় ছিলি?

এই ভগবানের রাজত্বের কোন একখানে। তো—পান্তো-টান্তো আছে না কি? না থাকে মুড়ি-চিড়ে যা আছে। নাড়ু থাকে তো দিও গণ্ডা দুই।

কিন্তু তুই এদিকে কেন?

কেন? মোনা চাপা গলায় বলে, বড়বাবু ঘরে রয়েছে না?

রয়েছে তা কী?

ওনারে আমার কেমন ভয় লাগে।

দেবযানী হেসে ফেলে।

কেন ভয় কিসের ? বাঘ না ভালুক ? না কি দত্যি-দানো ?

মোনা গম্ভীরভাবে বলে, অধম হতভাগাদের ভগবানকে ভয় লাগে। তো কথা পরে হবে গো মা। আগে রাবণের চিতেটা ঠাণ্ডা করো।

অতএব সেই কাজেই ব্যস্ত থাকতে হলো তখন দেবযানীকে। যখন মোনা কাঠা-খানেক মুড়ি-মুড়কি, গোটা দশেক নাড়ু, একছড়া কলা, আর আধসেরটাক গুড় দিয়ে ফলার সেরে পরিতৃপ্ত গলায় বলল, তালে এখন যাচ্ছি বড়মা। বুড়োটার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নাই।

বলে চলে গেল, তখন দেবযানী ঘরে এসে দেখল মহিম বেরিয়ে গেছে।

মুরারি মুখুয্যে, শশাঙ্ক ঘোষ, নীলরতন পাড়ুই 'হাঁ-করা' ভাবে বললেন, আপনি সত্যিই আবার সেই সোমবারেই ফিরে এলেন মহিমবাবু ?

মহিম নিজস্ব ভঙ্গীতে বললেন, ফিরে আসার কথাই তো ছিল। না কি ছিল না ?

মানে তা নয়। ইয়ে অফিস তো আর নেই, দু'দিন পরেও তো আসা যেত।

দু'মাস পরেও আসা যেত। কিন্তু কার কি লাভ হতো ?

লাভ-লোকসানের কথা নয়, মুরারি একটু গার্জেনের গলায় বলে উঠল, সংসারের প্রতিও তো আপনার একটা কর্তব্য আছে।

আই সি। সেটা তো ভেবে দেখি নি। আচ্ছা সেটাই না হয় এখন ভাবা যাক।

এরপর আর কে ওই ভদ্রলোকের মত দেখতে ছোটলোকটার সঙ্গে কথা বলবে ? দাঁড়াবে তার ঘরে ?

সতীশ ঘোষ একটু ইতস্তত করে বলল, রাত্তিরে আপনার খাবারটা কী রকম হবে হালদারবাবু ?

মহিম অবাকের ভানে বললেন, কীরকম মানে ?

না, মানে, এযাবৎ তো সোমবার অফিস ফেরত আসতেন। আজ তো সোজা বাড়ি থেকেই এলেন, তাই শুধোচ্ছি।

মহিম সাবান-তোয়ালে হাতে নিতে নিতে বললেন, সোজা বাড়ি থেকে, একথা আবার আপনাকে কে বলল ?

তা'হলে ? মানে—

মানের কিছু নেই, বাড়ি থেকে যেমন অফিস টাইমে বেরিয়ে আসি তেমনিই এসেছি।

হ্যাঁ, তেমনিই এসেছেন মহিম।

আশ্চয ! তেমন লজ্জাও তো করল না। যথারীতিই বেরোবার সময় ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে ডেকে বলে উঠেছেন, বল, তোমাদের কার কী চাই ? বাবু, বুট্, ডলি, ভুটান, ছোটন—

সুরবালা রাগের গলায় বলে উঠেছিলেন, এবার একটু হাত সামাল করো মহিম। আর অতো আদিখ্যেতা বাড়ালে চলবে কেন ?

মহিম হেসে উঠে বলেছিলেন, অচল হলে আর চলবে না।

তো এই সাতসকালে গিয়ে মেসে ঢুকে সেই মেসের হাঁড়ির ভাতকটা না খেলে চলত না ? বাড়ি থেকে খেয়ে বিকেলের গাড়িতে গেলেই হতো।

এক্ষুণি মেসে গিয়ে ঢুকবো একথা কে বলল তোমায় ?

তবে ? সারাদিন থাকবি কোথায় ?

মহিম হেসে বলে উঠেছিলেন, এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর থাকার জায়গার অভাব ?

কথাটা মোনার।

এবং গতকাল মোনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

মহিম যখন বিকেলে বেরোচ্ছিলেন, মোনার সঙ্গে মুখোমুখি।

ছুটে পালাতে গিয়েও কী ভেবে মোনা হঠাৎ টিপ করে একট প্রণাম ঠুকলো মহিমকে।

আর তারপরই কী আশ্চয তাড়াতাড়িই এই সম্পূর্ণ বিপরীত দুটে মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

বিপরীত বলে বিপরীত।

কোথায় হালদার বাড়ির বড়বাবু মহিম হালদার, আর কোথায় দীনু-কুমোরের পাগল-ছাগল ছেলেটা মোনা।

ইত্যবসরে অবশ্য ভাগ্নী তনু অনেক তথ্য সরবরাহ করে ফেলেছিল, বড়মামীকে ডাউন করতেই বোধহয়।

বুঝলে বড়মামা, বড়মামীর সেই হারানো মাণিক আজ আবার এসে গেছেন। এসেই ডাকহাঁক, পেটের মধ্যে অগ্নি জ্বলতেছে—হি হি।

অতঃপর মোনার রীতি-প্রকৃতি, মোনার এ বাড়িতে আধিপত্য আর আদিখ্যেতার বহর, সব মহিমের কর্ণগোচর করে ছেড়েছে তনু।

বুঝলে বড়মামা, চাকের মাটিরা নাকি ওর সঙ্গে কথা কয়। বলে, আর ভাঁড়-খুরি

হতে পারছিনে রে বাবা ! হি হি ! কি শয়তান ফাঁকিবাজ বোঝো। বাপের হাত থেকে রেহাই পেতে—হি হি, পুষ্যিপুত্তুর করবার আর লোক পেল না বড়মামী।

মহিম কিন্তু শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, কবিরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন বলেই অমর সৃষ্টি হয়ে থাকে—'হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনো-খানে।' কিন্তু ওই নিতান্ত গ্রাম্য নেহাৎ নিরক্ষর কুমোরের ঘরের ছেলেটার মধ্যেও জন্ম নিয়েছে অন্য কোনো খানের পিপাসা।

ছেলেটা কুমোরের চাক-এর মধ্যে থেকে মাটির আর্তনাদ শুনতে পায়। যে মাটি বলতে চায় 'আমি আর এই গতানুগতিক ছাঁচের একজন হয়ে উঠতে পারছি না।'

এদের মতই এক নিরক্ষর বিবাগী পাখিই তো গেয়ে উঠেছিল, 'আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।'

কি জানি কেন ছেলেটার সঙ্গে কেমন একটা একাত্মতা অনুভব করেছিলেন মহিম।

দেবযানীকে দেবতুল্য জ্ঞান করে ছেলেটা। ভেবে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল মুখে।

দেবী হতে হতেই রক্তমাংসের দাবিটা হারিয়ে গেছে।

পরদিন মহিম যখন যথারীতি খাবার টেবিলে এসে বসলেন, সতীশ ঘোষ হাঁ হয়ে বললেন, টাইম মাফিক ভাতও খাবেন ?

মহিম হাসলেন, বললেন, লোকসানটা কী ? খামোকা বেটাইমে খেয়ে শরীর বিগড়োবার কোনো মানে আছে ?

সতীশ ঘোষ জিভ কাটল। না না, তা তো নিশ্চয়ই নয়। আপনার কাছে তো দেখছি 'শরীর'ই ইষ্ট দেবতা। তবে বলছিলাম কি সাত সকালে খেয়ে কত ঘুমোবেন, কতো বই পড়বেন, কতো ব্যায়লা বাজাবেন ?

মহিম হাসলেন।

দেখি কতটা কী করতে পারি।

আচ্ছা, আমিও দেখিয়ে দেবো কী করতে পারি। দেবো ! দেবো ! দেবো !

ভয়ঙ্কর একটা মোচড় দেওয়া যন্ত্রণার মধ্যে থেকে উঠে আসছে এই শপথবাক্যটি নিঃশব্দে নিরুচ্চারে। দেখো দেখো। কবেই দেখিয়ে দিতে পারতাম, শুধু প্রাণের মধ্যে মায়া-মমতা আছে বলেই সংসারের সুখ চেয়ে সহ্য করে এসেছি তোমার এই নিষ্ঠুরতা। ঠিক আছে। তোমারও যখন মায়া-মমতা নেই, আমারও নেই। তুমিও যদি আমার

'মুখ' রাখলে না, আমারই বা কী দায় তোমার মুখ রাখবার।···

···নিয়মিত নিয়মে যখন সোমবার ভোরে পরিচিত রিকশাখানা হালদার বাড়ির দরজা থেকে স্টেশনের দিকে চলে গেল, আর তন্ত্র দু' হাত উল্টে বলে উঠল, উঃ দেখালো বটে বড়মামা। যাই বলো বাবা, বড় নির্মায়ক প্রাণ!

তখন দেবযানা নামের প্রাণীটা ভিতর দালানে আনাজপাতির ঝুড়ি চুপড়ি ডালা ইত্যাদি ছড়িয়ে বঁটির সামনে বসে।

না, হ্যাংলার মত অথবা বেহায়ার মত সদর দরজা অবধি ছুটে যায়নি দেবযানী। কখনোই যায় না। আজকে তো প্রশ্নই ওঠে না।

তবে তন্ত্রর মন্তব্য শুনতে না পাওয়ার কথা নয়, কারণ, তন্ত্র কথাটা বেশ সোচ্চারেই উচ্চারণ করতে করতে ভিতরে ঢুকে আসছে, যাই বলো বাবা, এমনিতে ছোটমামাকেই বরং রাগী খেঁকি মায়ামমতাহীন মনে হয়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা উল্টো।

দেবযানীর কানের মধ্যে কি কেউ গরম সীসে ঢেলে দিচ্ছে? সেই দাহের যন্ত্রণায় দেবযানীর রক্তের মধ্যে আগুনের হল্কা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে না? দেবযানী কি সেই অগ্নিবাহী রক্তটাকে শরীর থেকে বার করে ফেলতে সামনের এই সাবেককালের বৃহৎ বঁটিটাকে কাজে লাগিয়ে বসবে?

এই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর এই ইচ্ছেটাই মনে এসে যাচ্ছিল, তবু নিজেকে সামলে নিল দেবযানী।

পরবর্তী দৃশ্যটাকে বঞ্চনার চোখে দেখে নয়ে শিউরে উঠল। নাঃ! সেই বীভৎস দৃশ্যের মাঝখানে নিজেকে ভাবা যায় না।

তবে? জল? আগুন? দড়ি? বিষ? স্তব্ধ দুপুরে, পুকুরের সারাক্ষণ পীড়িত নিষিদ্ধ ঘাটটা যখন একটুক্ষণের জন্যে নির্জন হয়েছে, তখন?

কিন্তু?

কিন্তু দেবযানী শুনেছে, সাঁতার জানা মানুষ নাকি ডুবে মরে না। দেবযানী যে বাহাদুরি দেখাতে সাঁতার শিখে মরেছে।

তা হলে? শুধু কেলেঙ্কারী! তার থেকে দড়ি? শ্রেয়। রাতের অন্ধকারে, যখন সারা বাড়ি ঘুমে নিঃঝুম, তখন নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে—

ভেবেই বুকটা কেঁপে উঠল দেবযানীর। ঘরে তো বাবু কুটু ভলি ভুটান ছোটনরা! হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে যদি দেখে 'জ্যেঠি' বিছানায় নেই! ডাকাডাকি চেঁচামেচি করে কী যে করে বসবে কে জানে!

তাছাড়া কোন্ ঘরে ?

বাড়ির কোনো ঘরকেই দেবযানী 'ভয়ে'র করে রেখে যেতে চায় না। চিরদিন সংসারের ইষ্টই দেখে এসেছে দেবযানী। তা হলে বাগানে বেরিয়ে একটা শক্ত গাছের ডালে—

কিন্তু হাতের কাছে খিড়কির বাগানে তেমন শক্ত গাছ কই ? পেয়ারা ? আতা ? জাম ? জামরুল ? সবই তো ছোট ছোট। কার ডালটা একটা মানুষের দোদুল্যমান দেহের ভার বহনে সক্ষম ? বাকি তো সবই কলাগাছের ঝাড় !

গাছের ডালের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে দেবযানী আগুনের চিন্তায় চলে এল।

এটাই বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। না হলে শত শত দুঃখী অভাগিনী অভিমানী মেয়ে এই পথটাই বেছে নেয় কেন ? ঘরে কেরোসিনের অভাব নেই। একবার শুধু শাড়িটা তাতে ভিজিয়ে নিয়ে দেশলাই হাতে—কিন্তু কোথায় ? কোথায় ? শোবার ঘরের কথা ওঠেই না। যদি ঘরের জিনিসে আগুন ধরে যায় ! মরণকালে কি দেবযানী গেরস্তর ক্ষতি করে দিয়ে যাবে ?

রান্নাঘরে ? উঁহু। তা হলে আর ও রান্নাঘর ব্যবহার করা চলবে না। অপবিত্র হয়ে যাবে। তবে কি ভাঁড়ার ঘরে ? না না, সেখানে দেওয়াল জুড়ে তেত্রিশ কোটি দেবতার ছবি, মেঝেয় সত্যনারায়ণের চৌকী, লক্ষ্মীর ঘট। সেখানে এ কাজ হতেই পারে না। আর যদি দেবযানী দগ্ধে গিয়েও না মরে ? তার থেকে ভয়ানক আর কী আছে ?

যদিও মনে মনে এইসব দৃশ্য দেখে চলেছিল দেবযানী, তবু দেবযানীর আঙুলগুলো নির্ভুল নিয়মে দ্রুত চলে চলছিল সরু সরু করে লাউ কুটে কুটে ডাঁই করতে। অনেকখানি বড় লাউটা। তা হলেও আজই খেয়ে ফেলতে হবে। কাল নবমী, লাউ নিষেধ। পরশু শুকিয়ে যাবে।

লাউয়ের থালা সরিয়ে রেখে দেবযানী কুমড়ো ডাঁটায় হাত দিয়ে মনস্থির করে ফেলল, বিষ। বিষই সব থেকে সুন্দর উপায়। দেহের বিকৃতি ঘটবে না, 'ফেলিওর' হওয়ারও আশঙ্কা নেই। এই গ্রামে তিন-চারটে মেয়ে বৌ 'ফলিডল' খেয়ে মরেছে। একদম পুরোপুরিই মরেছে। দেবযানীর জানা।

'ফলিডল' তো আনাই রয়েছে ! থাকে। গাছ-গাছড়ার গোড়ায় গোড়ায় দেয় প্রতাপ। তার যে কিছু কিছু শখের চাষ আছে।

প্রতাপের আছে মানেই দেবযানীর এক্তিয়ারেই আছে। দেবযানী ছাড়া আর কে জিনিসটার ভয়াবহতার গুরুত্ব বুঝে সাবধানতা অবলম্বনের ভার নেবে ?

মনস্থির করে ফেলে বাকি কুটনোগুলো গুছিয়ে কুটে ফেলল দেবযানী।

মৃত্যুটা যখন হাতের মুঠোয় এসেই গেছে, তখন এই দণ্ডেই ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার নেই। নারকেল গাছ দুটো ঝাড়ানো হয়েছে, একগাদা নারকেল ঘরে জড়ো করা। ওগুলোকে নাড়ু করে রেখে যেতে হবে। নচেৎ ওগুলো পচে ফেলাই যাবে। ননদ জা ভাগ্নী, কার তেমন গা আছে? আর পারেই বা কই তেমন ভাল নাড়ু বানাতে?

ছোটবাবু বলেছিল, জম্পেস করে একদিন দইমাছ কোরো তো বৌদি। অনেকদিন খাওয়া হয়নি।

কালই বলা যাবে ভুবনকে ডেকে পুকুরটায় একবার জাল ফেলাতে। ভাল পাকা রুই ভিন্ন তো দইমাছ জমবে না। ভুবনের মা নিত্য যে মাছের যোগান দিয়ে যায়, সে তো বেশির ভাগই চারা পোনা, সরল পুঁটি, ট্যাংরা, খলসে।

দু'একদিনের মধ্যে আর কার জন্যে কী কী করতে হবে, সেটা ভাবতে থাকে দেবযানী। যাবার আগে যেন কারো কাছে কোনো ত্রুটি থেকে না যায়।

দিদি বলেছিলেন দিনের বেলা গায়ে দেবার পাতলা কাঁথাখানার একটা ওয়াড করে দিতে। আজই দুপুরে করে ফেলব। তন্তুর ক'টা সায়া ব্লাউজ কিনে দিয়ে যাওয়া দরকার। ও যা মেয়ে, মুখ ফুটে তো বলবে না, জামাকাপড় ছিঁড়েছে, হয়তো ছেঁড়াটা পরেই ঘুরে বেড়াবে। ভাবে ওতেই লোকে বুঝবে। আরে বাবা অত বুঝ-মান আর কে আছে সংসারে।

ছোট ছেলেমেয়েগুলোর কথা ভাবতে একটা অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস উঠে এলো চোখের পর্দার ভিতরে। ওদের চোখ আর মন দিয়ে ভাবতে আর দেখতে গিয়ে, নিজের মৃত্যুশোকেই নিজের উথলে উথলে কান্না আসতে লাগল দেবযানীর।

আর তখনি মনে পড়ল, ওদের বলেছে দেবযানী নতুন গরুর দুধ থেকে ক্ষীরের ছাঁচ করে দেবে বেশি করে। অনেক করে। গরুটা? সেও তো দেবযানীর ভরসাতেই এসেছে।

মহিমের রিক্‌শাটা চলে যেতে প্রতাপের বোধকরি অজ্ঞাতসারেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল।

মনের মধ্যে চিন্তা চলছিল, শেষ অবধি পরিস্থিতি কোন্ মোড় ঘুরবে। থেকেই যাবে কিনা মহিম মেসে থাকার সংকল্প ত্যাগ করে।

আচ্ছা, তা হলে কি প্রতাপ সিনেমায় খলনায়কের মত? যারা ভাইকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার তালে অনেক পাপকর্ম করে, আর সেটা করতে পারলে উল্লসিত হয়।

না. না, তেমন দোষ দেওয়া যায় না প্রতাপকে। প্রতাপ সম্পত্তি গ্রাসের চিন্তাতেও যায় না, প্রতাপ শুধু 'রাজত্ব' করতে চায়। নিরঙ্কুশ রাজত্ব।

প্রতাপের স্কুলের চাকরিটা নামমাত্র বজায় রেখে যেসব নানাবিধ ধান্দা এবং মিতব্যয়িতার পদ্ধতি, সেটির মধ্যে নিমগ্ন থেকে প্রতাপ বড় শান্তিতে আছে। কিন্তু দাদা? দাদা তার খুবই ভালবাসার, তবু পরম ভীতিকর। দাদার সামনে পড়লেই প্রতাপ কেমন সঙ্কুচিত হয়ে যায়, মনে হয় দাদা তার সমস্ত কাযকলাপকে নেহাৎ হাস্যকর ভেবে ব্যঙ্গদৃষ্টিতে দেখবে। সারা পাড়ায় প্রতাপ মহাপ্রতাপান্বিত, পাড়ার লোক ঝগড়া-কাজিয়ায় সালিশ মানতে আসে প্রতাপের কাছে। কিন্তু দাদা এসে দাঁড়ালেই প্রতাপ যেন তাঁর ছায়ায় ম্লান হয়ে যায়। মনে হয় আর বুঝি তাকে কেউ মান্যের দৃষ্টিতে দেখছে না।

সামান্য ছুটিছাটায় আসে দাদা, তাতেই এরকম মনে হয়, পাকাপাকি এসে বসবাস করলে প্রতাপকে আর পুঁছবে কেউ?

প্রতাপ সেই গভীর শূন্যতার দিকে তাকিয়ে অহরহ প্রার্থনা করে চলেছিল, দাদার যেন মন ঘুরে না যায়। বিশ্বসুদ্ধ লোক তার দাদার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেও প্রতাপ নিশ্চিত জানে দাদা খাঁটি সোনা। শুধু দোষের মধ্যে একটু খেয়ালি। তা ছেলেবেলা থেকেই তো প্রতাপের কাছে সেটা শাপে বর হয়েছে। দাদা যদি দিদির কাছে গিয়ে কলকাতায় থেকে পড়াশোনা না করতো প্রতাপ কী এখানে এমন করে পেত? সেই ছেলেবেলা থেকেই তো প্রতাপ কী বাড়িতে, কি বাইরে, নিজের প্রতাপ বিস্তার করতে সুযোগ পেয়েছে দাদার অনুপস্থিতির সুযোগে।

আর বৌদি?

দাদা এখানে থাকলে বৌদি কি কোনোদিন এমনভাবে প্রতাপের সহায়িক সাহায্যকারিণী হয়ে উঠতে পারত? সত্যি বলতে বৌদিই তার একমাত্র ভরসাস্থল প্রতাপের সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী! প্রতাপের সর্ববিধ সমস্যা বোঝে। আর ওই তো অকর্মার ঢেঁকি বৌ প্রতাপের, কে দেখতো প্রতাপের ছেলেমেয়েগুলোকে? সময়কালে দাদার সঙ্গে যদি 'বাসায়' চলে যেতো বৌদি, প্রতাপ তো স্রেফ ডুবতো!

ভয়ে কাঁটা হয়ে প্রতাপ দাদার রিটায়ারের দিন গুণছিল। সেই অনিবার্যতাকে তো ঠেকানো যাবার কথা নয়।

আশ্চর্য। ভগবান তার সহায় হলেন।

ভগবানকে সময় বিশেষে খুবই মানে প্রতাপ। যেমন এখন। রিক্‌শাটা বেরিয়ে

যাবার পর প্রতাপ মনের হাত দুটো জোড করে অদৃষ্টের উদ্দেশ্যে একটা কৃতজ্ঞ প্রণতি জানালো।

তবে বৌদির মনের অবস্থা ভেবেও মনটা একটু হু হু করে উঠল বৈকি।

এ ব্যাপারে যে দেবযানী আহত অপমানিত হয়েছে, সেটা বোঝবার মত বুদ্ধির অভাব নেই প্রতাপের। জানে, উনি একটা মানুষের মত মানুষ, সামলে নেবেন।

তবুর ওই 'দেখালো বটে বডমামা' উক্তির পর প্রতাপ ভুরুটা কুঁচকে কিছুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এল।

দিদি বলে উঠলেন, দেখলি তো মহিমের কাণ্ড। চিরকেলে একবগ্‌গা। ভাঙে তো মচকায় না।

প্রতাপ ভুরুটা কুঁচকে রেখেই বলল, ভাঙল আবার কখন?

আহা, ভেতরে ভেতরে কি আর—

ওঃ। ভেতরের কথা তো সবই বোঝো।

ললিতা বলল, যাই বলো বাবু, বটঠাকুরের মধ্যে একটুও মায়া-মমতা নেই।

প্রতাপ একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলল, তাতে তোমার লোকসানটা কী? বটঠাকুরের ভাইয়ের মধ্যে তো আছে? তা হলেই হলো।

ওঃ! আছেই বটে! ললিতা মুখ ঘুরিয়ে বসল।

এদিকে এসে দেখল রান্নাঘরে জলন্ত উনুনের সামনে রাশীকৃত কোটা কুটনো তরকারি নিয়ে গোছগাছ করছে দেবযানী।

একটু ইতস্তত করে বলল, এ কাজগুলো আজ কেউ করতে পারত না?

এই সহানুভূতির স্পর্শে দেবযানীর চোখে প্রায় জল এল। তবু প্রায় হেসে ফেলেই বলল, কেন আজ কী?

প্রতাপ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, না মানে, হিসেব-পত্তর, পরামর্শের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। তা এতোসব উদ্ধার হতে—

দেবযানীও সত্যি এতো বোকা নয় যে, এই সামলে নেওয়াটা বুঝল না। তবে হেসেই বলল, আহা ক' ঘণ্টা সময় চাই তোমার? বল না। ডালটা চড়িয়েই বসে যেতে পারব তোমার পরামর্শ সভায়। ডালের পর চচ্চড়িও আছে।

হেসে উঠল।

নাঃ, সাত সকালে ভাত খেয়ে মহিম ঘরে গিয়ে শুয়েও পড়লেন না, বই পড়তেও বসলেন না, বেহালায় ছড টানতেও হাত লাগালেন না।

যথারীতি সাজসজ্জা করে ঠিক অফিস টাইমেই বেরিয়ে পড়লেন। পিছনে যে অনেক জোড়া চোখ নানা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেটা অনুভব করলেন। আর এও অনুভব করলেন নানা মন্তব্যও চলতে থাকবে এখন বেশ খানিকক্ষণ ধরে।

মন্তব্যগুলোও আন্দাজ করছেন, শুধু শুধু হাওয়া খেতে সেজেগুজে বেরিয়ে গেলেন। এইটি বিশ্বাস করতে হবে? কলকাতার রাস্তায় হাওয়া খাবারই সময় এটা বটে। হুঁঃ, এক্সটেনশন নেননি। ঘাসের বিচি খাই আমরা।

সবকটা মুখ চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে এক একটি মন্তব্যের বাহন হয়ে, তা নিয়েছিস নিয়েছিস, এতো লুকোছাপা কিসের? পেলে ছাড়ে কেউ?···তা নয়, ভাব দেখাচ্ছেন, নির্লোভ মহাপুরুষ, এসবে ওর তাচ্ছিল্য!

মহিমের যা বেশভূষা, তাতে সকাল ন'টার সময় অফিসপাড়া অভিমুখী বাসে চড়ে বেশভূষাকে অক্ষত রেখে অফিস পর্যন্ত পৌছবার কথা নয়, অথচ মহিম কে জানে কোন অলৌকিক মন্ত্রবলে শুধু যে সবটি অটুট রেখে অফিসে পৌছেছেন তাই নয়, ফিরেছেনও প্রায় অক্ষতই। হয়তো পাঞ্জাবীর গিলেকুঁচিটা একটু ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, হয়তো বা কোঁচার আগার ফুলটা কিছুটা বিধ্বস্ত হয়েছে। তা সে এমন কিছু না, পরদিন চালিয়ে দেওয়া গেছে। দু'দিনের বেশি তো পরেন না মহিম।

অথচ এ যুগে যানবাহন দুর্দশার দাপটে অনেক কর্তাব্যক্তিও চিরকালের ধুতির অভ্যাস ছেড়ে শার্ট পেণ্টুন ধরেছে। আহা কী সাজই আবিষ্কার করেছিল ওরা! শার্ট আর প্যাণ্ট! সারা পৃথিবীর ভদ্র পুরুষের সাজ।

'থ্রী পীস'-এর পাট নেই, কায়দাকানুনের বালাই নেই, ইচ্ছে করলে জুতো যেমন তেমন পরতে পারো, কেউ লোকসমাজ থেকে উঠিয়ে দেবে না। এই সুবিধেটা লুফে নিয়েছে জগতের পুরুষ সমাজ। ক্রমশ মেয়েরাও। মাপে খাপ খেলে কর্তার পোশাকটা গিন্নী অথবা গিন্নীর পোশাকটা কর্তা টেনে নিয়ে পরে বেরিয়ে পড়তে পারেন। দাদারটা ছোট ভাই, বাবারটা ভাইপো। সুবিধেটি বোঝে।

এই সুবিধেটা লুফে নিয়েছে দুনিয়াসুদ্ধ লোক। মালিক আর শ্রমিকের পোশাকের ভেদ নেই।

বাহান্ন ইঞ্চি ধুতি, গিলেকুচি মিহি আদ্দির পাঞ্জাবীতে এ সুবিধে নেই। সুবিধে নেই বলেই কি আভিজাত্য রয়েছে?

মহিম চট করে কোনো বাসে চড়ে বসবার চেষ্টা করেন না। হাঁটতে লাগলেন। যদিও উত্তর কলকাতার এইসব রাস্তাটাস্তা হাঁটবার যোগ্য নয় এ সময়, (কোন্ সময়ই বা?) তবু লোকের গায়ে গা ঘষা বাঁচিয়ে ধীরে-সুস্থে হাঁটতে লাগলেন।

খুব মজা লাগল।

সবাই ছুটছে। যেন এক সেকেণ্ড দেরী হয়ে গেলে ট্রেন ফেল হয়ে যাবে, অথবা যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাবে। আর এই অরুচিকর দৃশ্যটার মধ্যে থেকে মহিম হালদার ধীরে-সুস্থে হেঁটে চলেছেন। মহিম হালদারের কোনো কাজ নেই, কোনো তাড়া নেই।

মহিম অবশ্য কোনোদিনই মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করেন নি, করেন না, কিন্তু কাজ তো ছিল। তাঁর দায়িত্বটি ছিল। মন এতো হালকা থাকেনি কোনোদিন।

মহিম এখন ইচ্ছে করলেই ফুটপাতের পাশের ওই পানের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে পান কিনতে পারেন, পানের বোঁটার ডগায় একটু চুন লাগিয়ে আলতো করে দু আঙুলে ধরে জিভে ঠেকাতে পারেন, দোকানে টাঙানো আয়নাটায় মুখ দেখতে পারেন, পানওয়ালা খুচরো পয়সার ঘাটতি দেখিয়ে গোটাকতক পয়সা মেরে দিল দেখে বকাবকি করতে পারেন, পথচারী কোনো ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বলে উঠতে পারেন দেখছেন তো মশাই, সরকার কেমন বেমালুম বাড়তি আর একটি দুর্নীতির দিগন্ত খুলে দিয়েছে। খুচরো নেই ছুতোয় একধার থেকে সবাই আপনার থেকে কিছু মেরে নেবার তাল করে চলেছে। দৈনিক কতগুলো করে পয়সা আপনার এইভাবে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে হিসেব রাখছেন, রিকশাওলা ট্যাক্সিওলা থেকে শুরু করে দোকানী পসারী, এমনকি—

বলার সঙ্গে সঙ্গেই, এই দুরন্ত ব্যস্ততার মধ্যে আশপাশে দু'চারজন লোক দাঁড়িয়ে পড়বে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই সেই দু'চারজনের পাশে পাশে মাথা ফুঁড়ে উঠে পড়বে একটি ছোটখাটো জনতা। যার ডাক নাম পাবলিক।

পাবলিক এসে দাঁড়ালেই অনিবার্য নিয়মে রাজনীতি এসে হাজির হবে। জায়গাটা একটা বক্তৃতামঞ্চে পরিণত হয়ে যাবে। পানওয়ালার পাঁচটা পয়সা মেরে দেবার তাল থেকে সারা দুনিয়ার দুর্নীতির আলোচনা হতে থাকবে, আর এই দুর্নীতির বিশাল সমুদ্রেই যে অদূর ভবিষ্যতে একদিন দুনিয়াটা তলিয়ে যাবে, তাতে আর মতভেদ থাকবে না।

কিন্তু মহিম হালদার এসব কিছু হতে দেবেন না। কারণ মহিম হালদার পান কিনতে যাবেন না।

আরো হাঁটতে থাকেন মহিম হালদার কোঁচার আগাটা হাতে তুলে নিয়ে। এমনিতে তিনি ওটা হাতে নেন না—ঝুলিয়েই রাখেন, কিন্তু এখানেই ফুটপাতের চেহারা যে অবর্ণনীয়। ফুটপাতের বিশাল বাজার স্বীকার করে না এটা একদা মানুষের নিরাপদে হাঁটবার জন্যে।

মহিম হালদার দেখলেন একটা লোক একটা বাড়ির রকের ওপর এক ঝোড়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট পাকা কলা নিয়ে বসেছে। আর কাছে দাঁড়িয়ে তার থেকেও হৃষ্টপুষ্ট একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটির পর একটি কলা ছাড়িয়ে খেয়ে চলেছেন। ছাড়াবার সময় তাঁর কলার মতই মোটা মোটা আঙুলে পরা লাল, নীল, সাদা আংটির পাথরে আলো পড়ে চিকচিক করছে। বুড়ো আঙুল বাদে সব ক'টা আঙুলেই আংটি।

আশ্চর্য তো! লোকটা এতগুলো কলা খেয়ে চলেছে কেন? ডাক্তারের নির্দেশ? পুষ্টির দরকার? দেখে তো মনে হচ্ছে তার উল্টোটাই হলে ভালো হয়।

কিন্তু তাই যদি হয়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন? হঠাৎ মনের মধ্যে একটু সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেল মহিমের। বাড়িতে বসে এতগুলো কলা একা খাওয়ার চক্ষুলজ্জা আছে। হলেও ডাক্তারের নির্দেশ।

তাহলেও এ সময় কেন? সাজসজ্জা দেখে তো মনে হচ্ছে অফিসটফিস যাবার পথে। যদিও বেলা হয়ে গেছে, তা কত লোকের কত রকম অফিস থাকে। এমন অফিসও তো থাকে, যেখানে ঘড়ির কোন মা-বাপ নেই, হাজরে খাতাটা টেবিলে ফাইলের পাহাড়ের নীচে চাপা পড়ে থাকে, টেনে বার করা হয় না।

তা অফিস টাইম চুলোয় যাক, লোকটা এ সময় এতগুলো কলা খাচ্ছে আর খোশাগুলো দিগ্বিদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

ফুটপাথের ওপর বলতে গেলে বড়বাজার। নেই হেন জিনিস নেই। এই পাহাড়ের মধ্যে থেকে লোকটার কাছাকাছি যাওয়া শক্ত। তাড়াতাড়ি যেতে পারলে বলা যেত, ব্যাপারটা কী মশাই, এতো কলা খেয়ে চলেছেন কেন? কলাওলার সঙ্গে কোনো বাজি-টাজি ধরেছেন নাকি? ঝোড়াসুদ্ধ সব মেরে দিতে পারলে, কলার দাম দিতে হবে না, এমন কোনো শর্ত?

তা কাছে যাবেন কী? পায়ের কাছে বেলের, ফাটাফাটা ফুটির, শুকনো শুকনো খরমুজার, বুড়ো বুড়ো শশার, হলদে হয়ে যাওয়া পাতিলেবুর, কানাকুঁজো শুকনো শুকনো টোপাকুল আর ফালিকাটা এঁচোড়ের ঝুড়ি-চুপড়ি, ডালা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখান থেকে গোনবার চেষ্টা করছেন, কটা খাচ্ছে। হঠাৎ মাথাটা চড়াৎ করে উঠল মহিমের।

এই লোকের চক্ষুলজ্জার কথা ভাবছিলেন তিনি?

রাগের জোর বড় জোর।

মহিম হালদার সেই জোরেই কোঁচা সামলে ওই গন্ধমাদন পর্বতের ফাঁকফোকর দিয়ে চলে এলেন এদিকে।

ততক্ষণে ভোজনপর্বে ইতি টানা হয়েছে, লোকটা ময়লা রুমাল দিয়ে কলা চটচটে আঙুলগুলো মুছছে ঘষে ঘষে।

গোলগাল মুখটি বেশ হৃষ্ট।

মহিম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, এটা কী হলো আপনার?

ভদ্রলোক অবহেলার ভঙ্গীতে বললেন, কী হলো?

কলা খেয়ে খোসা ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেললেন যে?

পকেট থেকে পার্স বার করে কলাওলার দিকে একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে ধরে বললেন, হিসেবটা ঠিক কর। গেল দিনেরটা বাকি আছে।

তারপর মহিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, খোসাগুলোও খেয়ে ফেলার অব্যেস নেই বলে, ফেলতে হয়েছে।

শুনে মাথার রক্ত আরো চড়ে উঠল মহিমের। তবে চেঁচামেচির লোক নন তিনি, তাই বললেন, অভ্যাস না থাকার তো কথা নয়। যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মনে তো হচ্ছিল গাছ থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াই অভ্যাস।

কী? কী বললেন?

কিছু না। বলছি রাস্তায় এভাবে কলার খোসা ফেলবেন কেন? অ্যাঁ? জবাব দিন।

ভদ্রলোক কলাওলার কাছ থেকে ফেরত পয়সাটি ধীরেসুস্থে গুনে নিতে নিতে তাচ্ছিল্যের গলায় জবাব দিল, ওঃ, জবাব দিতে হবে! বলি, জবাব চাইবার আপনি কে, সে জবাবটা দিন দিকি আগে।

এ জবাব চাইবার অধিকার প্রত্যেকটি নাগরিকেরই আছে। আপনাকে দিতেই হবে জবাব। এটা লোকের বিপদের কারণ হতে পারে জানেন না আপনি?

বিপদ!

হে হে হে করে বিচ্ছিরিভাবে হেসে উঠল ভদ্রলোক। কলকাতার রাস্তায় বিপদ! তুচ্ছ একটু কলার খোসা আর কতটুকু কী করবে?

মহিমের মনে হলো, লোকটার ওই ছড়ানো দাঁতের ওপর একটা ঘুঁষি বসিয়ে দেন।

ইচ্ছেটা পূরণ করলেন না অবশ্য। শুধু কড়া গলায় বললেন, বোকার মত হাসতে লজ্জা করছে না আপনার?

কী? কী বললেন? বোকার মত?

নিশ্চয় বোকার মত। রাস্তায় যত ইচ্ছে কলার খোসা ফেলে লজ্জিত না হয়ে দাঁত

বার করে হাসে বোকা খোকারা, আর হনুমানেরা। যাদের মত কলা চালাচ্ছিলেন।

তবে রে শালা!

কলাখাওয়া ভদ্রলোক হঠাৎ ঘুষি বাগিয়ে 'আপনি' থেকে 'তুই'তে নেমে বলে ওঠে, এক ঘুঁষিতে নাক ফাটিয়ে দেব তা জানিস।

ওই নাড়ুগোপাল মার্কা লোকটার গোলগাপ্পা'র মত গোলালো ঘুষিটির বহর দেখে এত রাগের মধ্যেও হাসি পেয়ে গেল মহিমের।

এবং জীবনে যা না করেছেন (না, যৌবনে একবার করেছিলেন। খেলা দেখতে গিয়ে পাশের একটা লোকের মুখে মোহনবাগানের উদ্দেশে হ্যানস্তাস্চক কথা শুনতে পেয়ে মহিম তৎক্ষণাৎ জামার আস্তিন গুটিয়ে মুঠো বাগিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তবে ঝটপট কয়েকজনের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা বেশি দূর এগোতে পারে নি।) তাই করলেন। চট করে মিহি পাঞ্জাবীর চুড়িদার হাতার বোতামটা খুলে ফেলে হাতটা মুঠো করলেন। বলিষ্ঠ হাতের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল। ফর্সা রঙের ওপর নীল রেখাগুলো বেশী স্পষ্ট দেখাল।

লোকটা কিছু কিঞ্চিৎ মিইয়ে গেল। মুঠোটা অ লগ হয়ে গিয়ে বলে উঠলো, কাকে চোখ রাঙাতে আসছেন তা জানেন?

জানি। একজন সমাজবিরোধীকে।

কী কী! আমি স-সমাজবিরোধী। রাগে তোৎলা হয়ে গিয়ে বলে, মু-মুখ স-স-সা সামলে কথা বলবেন।

মহিমের হঠাৎ বেশ মজা মজা ভাব এসে গেল। ঘুষিটা তার নাকের সামনে দুলিয়ে নিয়ে বললেন, তার আগে আপনি আপনার নাকটা সামলান। আপনি একশোবার সমাজবিরোধী। যে লোক পাব লকের সুবিধে-অসুবিধের কথা ভাবে না, সে হাজারবার সমাজবিরোধী। আপনাকে পুলসে দেওয়া উচিত। কিন্তু তার থেকে বরং আইনটা নিজের হাতেই নিচ্ছি—

আবার ঘুষি বাগানো হাতটা চিত করে বাড়িয়ে ধরলেন। পেশীগুলো আরো শক্ত দেখাল।

ভদ্রলোক এখন হঠাৎ সেই ফুটপাথে পাতানো জঙ্গল বাজারের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ার চেষ্টা করতে শুরু করেছে। বেলের ঝোড়া, টোপাকুলের ডালা পার করে ঘুষির আওতা থেকে সরে এসে বলে উঠল, বেশী ফটানি দেখাতে হবে না। কপালে দুঃখ লেখা হয়ে যাবে।

তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে মহিমের দোলানো ঘুষির আওতা থেকে দূরে সরে

গিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, নটবর সেজে যেখানে যাচ্ছিলি যা না শালা·····যাঃ। যাঃ।

মহিম যে এই ঝুড়ি-ঝোড়া টপকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন না, সেটা বুঝেই বোধহয় এত সাহস।

মহিম দেখতে পান রাস্তার ওপারে একটা গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে, লোকটার লক্ষ্য সেই দিকে। যদিও গাড়িটার চেহারা কাদাখোঁচা, মাডগার্ডটা তোবড়ানো, বডিতে জায়গায় জায়গায় রং চাঁচা, ঘষা। তবু গাড়ি তো। নিজেরই খুব সম্ভব।

একটা গাড়িবান লোকের এমন হনুমানের মত ব্যবহার। তার ওপর আবার এমন অসভ্য ভাষা।

লোকটাই যে ওই গাড়িটার মালিক, এটা অবশ্য মহিমের অনুমান। ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করেই। ওর পালানোর ভঙ্গীটা হাস্যকর। এগোতে গিয়ে পিছু ফিরে দেখছে। এই ফড়েরা, দোকানীরা মজা দেখে দাত বার করে হাসছে।

লোকটা বোধহয় এতক্ষণ নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পেরে, এই সব পরিচিত লোকগুলোর সামনে আরো বীরত্ব দেখাতে চেঁচিয়ে বলল, নতুন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিস বুঝি? দ্বিতীয় পক্ষ? না তৃতীয় পক্ষ?

বাজার লোকগুলো আরো হ্যা হ্যা করে উঠল। আর মহিম বিনা বাক্যব্যয়ে কলাগুলোর ডালা থেকে দুটো কলা তুলে নিয়ে ধাঁ করে লোকটার ওই ফেরানো মুখটা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। যেন ঘুষির বিকল্প।

সাহস মহিমেরও অন্যদিকে। জানেন এটা মহিমের যৌবনকালের যুগ নয় যে, কেউ কারুর উপর ঘুষি তুললে পাঁচজনে ছুটে আসবে মধ্যস্থতা করে উদ্যত ঘুষিটা নামিয়ে দিয়ে ঝগড়াটা থামিয়ে দিতে। এ-যুগ একচুলও না নড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর দাঁত ছড়িয়ে দু'পক্ষের উত্তেজনাটি উপভোগ করবে। আর যদি দেখে একপক্ষ লাট খেয়ে গিয়ে প্রহার খাচ্ছে, তখন সকলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের সুখ করতে শুরু করবে।

দু'পক্ষের কলহ কোঁদলের উপলক্ষটা কী, তা জানবার দরকার নেই, কে দোষী, কে নির্দোষ তা বোঝবার দরকার নেই, কে মার খেয়েছে সেটা দেখতে পেলেই ছোটো 'মার শালাকে' বলে।

কাজেই ঘুষির বিকল্পে পাকা মর্তমান ছুঁড়ে শঙ্কিত হলেন না মহিম, জানেন যার ব্যাপার তার।

কদলীসেবী ভদ্রলোক এই আকস্মিক আক্রমণে অবশ্যই চোখে অন্ধকার দেখলেন। কারণ মনে হচ্ছে কলার শাঁস চোখের মধ্যে ঢুকে গেছে।

লোকটা সেই ময়লা রুমালখানা বার করে চোখে-মুখে ঘষতে ঘষতে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই হারামজাদা বক্কা, মানকে, পটলা, দরকারের সময় থাকিস কোথায় ? ব্যাটা তোমাদের আমি—

বলতে বলতে আর চোখ ঘষতে ঘষতে সেই 'খানদানী' গাড়িটায় উঠে গিয়ে বসে স্টার্ট দিল।

ব্যাটা পালাল।

বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন মহিম। তারপর কলাওলাকে বললেন, কলার জোড়া কত হে ?

অর্থাৎ যেটা ছুঁড়েছেন সেটার দামটা মিটিয়ে দেবেন।

কলাওলা বিমনাভাবে বলল, এক টাকা ষাট।

তারপর বলল, কাজটা ভাল করলেন না বাবু। এই বেলা মানে মানে সরে পড়ুন। ওই ভদ্দরলোক এখানের এম-এল-এ। চুনীলাল সাহা। অনেক চেলা-চামুণ্ডা আছে ওঁর। গিয়েই পাঠিয়ে দেবে নিঘ্‌ঘাত।

লোকটা এখানের এম এল এ।

মহিম সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন।

একজন এম এল এ-র এই আচরণ! অদ্ভুত তো!

সকৌতুকে বললেন, উনি বুঝি তোমার রোজের খদ্দের ?

আজ্ঞে না রোজের না। হপ্তায় এই একদিন। সোমবার সোমবার। এই দিনে উনি ভোলেবাবার বার করেন, স্রেফ নির্জলা। মাত্র একুশটি করে কলা খেয়ে।

মাত্র একুশটি! হা হা হা! দেখে তো ভাবছিলাম একশটি।

আজ্ঞে না একুশটি। আমার কলাটাই পছন্দ করেন। তা আপনাকে তো এদিকে দেখি নাই কোনোদিন। পাড়ায় নূতন এয়েছেন।

নাঃ। এমনি বেড়াতে এলাম।

লোকটার গল্পের মন, তবু ব্যস্ত গলায় বলে, তাহলে বাবু আপনি এদিক থেকে সরেই যান। ওই সাহাবাবুর অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ আছে। গিয়েই লেলিয়ে দেবে। অপমানী হয়ে গেছে তো —

মহিমের এখন নিজের ছেলেমানুষী ভেবে হাসি পেয়ে যায়। তবে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলেন, একটা বয়স্ক লোক, তায় আবার শুনছি দায়িত্বশীল পোস্টে রয়েছেন, এভাবে রাস্তায় কলার খোসা ছড়ালে, কিছু শিক্ষার দরকার।

কলাওলা নিজের ডালাটা গুছিয়ে মাথায় তোলবার তোড়জোড় করতে করতে

বলে, সে কথা বলেছিলুম বাবু ফার্স্টে, তো শুনলুম ওটাই না কি ওনার নিয়ম। দশ-দিনের পাখিপক্ষী গরু-কুকুর ওর দ্বারা পরিতুষ্ট হবে।

বাঃ! চমৎকার! শাঁসটা খেয়ে খোসায় জগৎকে পরিতুষ্ট করা! মন্দ নয়।

বাবু, আমার কলা চেখে দেখবেন না?

না হে। কলা আমি খেতে পারি না।

তাহলে বাবু অন্য পথ ধরে চলে যান। ওনার ওই পটলা কোম্পানী যদি এসে পড়ে, বিপদে পড়ে যাবেন। রগচটা মস্তানমার্কা ছেলে সব। ভোটের সময় খুব খেটেছিল। ওনার কথায় উঠে বসে। আপনি বরং ওই গ্রে স্ট্রীটের মোড়টা ধরে ওদিকে চলে যান।

ভালাটা মাথায় তুলে চলে গেল লোকটা।

ওর উপদেশটা মহিমের রুচিকর হচ্ছিল না। ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার মত। কিন্তু আপাতত এখন একদল মস্তানের হাতে পড়ারও ইচ্ছে হল না। লোকটা চলে যেতেই তার নির্দেশিত পথের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মনে মনে একটু হাসলেনও।

যাক 'স্বাধীনতার সুখ' উপভোগের প্রথম দিনটায় বউনি মন্দ হল না।

কিন্তু বেলা বারোটায় রোদে আর লক্ষ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়ানো চলে না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে হাত তুললেন।

ড্রাইভার গাড়ির থেকে মুখ বাড়িয়ে হাত নেড়ে জানিয়ে দিয়ে গেল, যাবে না। খাবার টাইম হয়ে গেছে।

খাবার টাইম হয়ে গেছে। অতএব সাত খুন মাপ।

মহিম মনে মনে একটু হেসে দাঁড়িয়ে রইলেন পরবর্তীর প্রতীক্ষায়।

বেশ একটা ভাললাগা ভাললাগা ভাব।

নিয়মভাঙার কি একটা পুলকিত উল্লাস আছে? তাই আজীবনের ঘড়ির কাঁটায় বেঁধে রাখা জীবন থেকে হঠাৎ একদিন সরে এসে এলোমেলো বেড়ানোর মধ্যে আহ্লাদের রস পাচ্ছেন মহিম হালদার?

আর একটা খালি ট্যাক্সিকে আসতে দেখে মহিম দূর থেকে হাত তুললেন।

ড্রাইভার যথারীতি গাড়ির গতিবেগ না কমিয়েই হাত নেড়ে চলে যেতে গিয়ে কী ভেবে গতিটা কমালো।

মহিমের চেহারার আকর্ষণে? অথবা এই 'ফিনফিনে সাজ' বাবুটির রোদে লাল হয়ে যাওয়া মুখটা দেখে দয়াপরবশ হয়ে?

গতি কমিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে সরে এসে বলল, যাবেন কোথায় ?

মহিম একটু হেসে বললেন, আপনার যেদিকে সুবিধে।

আমার সুবিধেয় আপনি যাবেন ?

আপাতত তাই ঠিক করলাম। দেখছেন তো আপনাকে আসতে দেখে ঊর্ধ্বাহু হয়ে পড়েছিলাম।

তাকিয়ে দেখছেন, সভ্য-ভব্য একটি ভদ্র বাঙালী ছেলে। এখনো বোধহয় ততো ঝুনো হয়ে ওঠেনি। তাই ভেবেই এ রকম কথা বলতে পারা গেল।

ছেলেটা অথবা যুবকটি বলল, আমি তো ফিরছি। শেয়ালদার দিকে গাড়ি গ্যারেজ করব।

বাঃ। বাঃ অতি উত্তম। আমায় ওই শেয়ালদা স্টেশনের মধ্যে ছেড়ে দিলেই হবে।

আসুন।

বলে দরজাটা খুলে ধরল ছেলেটা।

গাড়িতে উঠে বসে মহিম যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন। মনে মনে হাসলেন। দীনু কুমোরের ছেলের জীবনদর্শনটা, কৌতূহলোদ্দীপক। অবশ্যই কেমন একটা আকর্ষণও বোধ করেছিলেন। কিন্তু মহিম হালদারের কর্ম নয় ওই জীবন দর্শনের খাঁজের মধ্যে জীবনকে সমর্পণ করে ফেলা।

গাড়িটা একটু চালাবার পর ছেলেটা একটু ইতস্তত করে বলল, আমার কিন্তু এখন একটু খাওয়ার দরকার ছিল।

মহিম অবাক হয়ে শুনতে পেলেন। মহিম হালদারের কণ্ঠস্বর উল্লসিত সুরে বলে উঠল, অ্যাঁ। তাই না কি ? একেই বলে যোগাযোগ। আমারও মনে হচ্ছে ওই একই দরকার। চলুন তাহলে খেয়ে নেওয়া যাক কিছু।

ট্যাক্সি ড্রাইভার কণ্ঠা কাটিয়ে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, সে জায়গায় আপনি খেতে পারবেন না। সে হচ্ছে—আমাদের মত হতভাগাদের জন্যে। আপনি স্টেশনের মধ্যে খুব ভাল খাবার জায়গা পাবেন।

মহিম একটু হাসলেন। বললেন, আহা একদিন না হয় দেখলামই হতভাগারা কী খায়।

ছোকরা একটু বিমনাভাবে বলল, সে পরিবেশ আপনার ভাল লাগবে না।

মহিমের বোধ করি আজ রোখ চেপেছে চিরদিনের স্বভাব অতিক্রম করবার, তাই বললেন, না লাগলে খাব না, চলে এসে গাড়িতে বসে থাকব। আপনি খেয়ে

আসবেন। আমার কোনো তাড়া নেই।

নাঃ থাক। ছেলেটা একটু জোর দিয়ে বলল, আমি আপনাকে আগেই ছেড়ে দিয়ে আসি। যাবেন কোথায়?

কোথাও যাবো ভেবে বেরোইনি। এখন ভাবছি—হেসে বললেন, সেই যে কী বলে যেদিকে দুচক্ষু যায় তাই যাব।

ছেলেটাও এখন একটু হেসে (যদিও গায়েপড়া ভাবে নয়) বলল, রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে না কি?

মহিম বললেন, বাড়ি থেকে পালিয়ে বলতে পারো তবে রাগ করে নয়। এমনি। পালিয়ে বেড়াতে কেমন লাগে দেখতে।

মহিম দেখছিলেন ছেলেটি সুকান্তিও নয়, সুপুরুষও নয়, কিন্তু এমন একটি মার্জিত ভাব আছে মুখেচোখে যে, সমীহ আসে।

নামবার সময় মহিম হঠাৎ জিগ্যেস করে উঠলেন, আপনাকে বেশ ভাল লাগল। কিছু যদি মনে না করেন আপনার নামটা জানতে চাইতে পারি?

ছেলেটা তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, মনে করবার কিছু নেই। বলবারও কিছু নেই। ট্যাক্সি ড্রাইভারের আবার নাম! ড্রাইভার এটাই আমাদের নাম।

নেমে পড়ল। মিটার দেখল, মহিমের দেয় টাকার অঙ্কটা বলল। তারপর হঠাৎ একটু হেসে বলে উঠল, আমার নাম, সুভাষ বোস।

চলে গেল গাড়ি নিয়ে।

সুভাষ বোস। বেশ মজা তো।

মহিম বুঝলেন, তাই এক কথায় নামটা বলতে চায়নি।

অথচ না হবার কিছু নেই। বোসবাড়িতে জন্মেছিল এবং একজন বিখ্যাত জনের নামে ছেলেব নামকরণ হয়েছিল।

বাঙালীর ঘরে আগে যেমন ঠাকুর-দেবতার নামটাই শিশুর নামকরণের সময় চালু ছিল, পরে খ্যাতনামাদের নামে নাম রাখার প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামটি চট করে না পাওয়া গেলেও, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ বোস, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ ঘরে-ঘরেই মিলতে পারে। আবার শখের দৌড় হাস্যকরও হয়ে যায় অনেক সময়। মহিমের অফিসের এক ভদ্রলোকের নাতির নাম 'মোহনবাগান রায়'।

মোহনবাগান সমর্থনের একথানি মজার নমুনা সন্দেহ নেই।

মহিমের গতিবিধি চবদিনই ছকে বাঁধা। শেয়ালদা স্টেশনে কদাচিৎ এসেছেন। দেখলেন স্টেশনের চেহারার অনেক উন্নতি হয়েছে।

হরদমই গাড়ি রয়েছে।

খুব বেশীদূর যাবার বাসনা নেই, খোঁজ নিলেন শিগ্‌গিরির মধ্যে কোন গাড়ি ছাড়ছে। কল্যাণী যাচ্ছে একটা গাড়ি, এক্ষুণি উঠে পড়লেন তাড়াতাড়ি একটা টিকিট কিনে। ইলেকট্রিক ট্রেন। ফার্স্ট ক্লাসও যা সেকেণ্ড ক্লাসও তা।

কিছু খাবার দরকার ছিল, সেটা তখন মনে পড়ল না।

অথচ দরকার ছিল। এ সময় অফিসের ক্যান্টিনে ভাল মত টিফিন করেন বরাবর।

ট্রেনটা ছাড়ল।

মহিম একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন যেন। দু'একটা পরিচিত দৃশ্যের আশা করেই হঠাৎ মনে পড়ল, না গোপীচন্দনপুরে যাচ্ছেন না তিনি।

তারপর ভাবলেন ছেলেটার নাম সুভাষ বোস। কত বয়স হবে ছেলেটার? সাতাশ-আটাশ? ত্রিশ-বত্রিশ? সকলেরই যে চেহারা দেখেই বয়েস বোঝা যায় তা নয়। ছেলেটার মুখে যেমন একটা মার্জিত সৌকুমার্য আছে, তেমনি আবার জীবন-যুদ্ধের রুক্ষতার ছাপ রয়েছে।

নিশ্চয় ওর জীবনের কোন বিশেষ ইতিহাস আছে।

ভাবলেন মহিম

তারপর ভাবলেন, প্রত্যেকটি মানুষেরই তো তা থাকে। যারা সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মায় তাদের জীবনেও কিছু ব্যর্থতা, কিছু দুঃখ, কিছু অসহায়তা থাকতে পারে।

আচ্ছা আজকের দিনটা না হয় এইভাবে কাটল, কিন্তু রোজ রোজ? প্রোগ্রামটা কী?

ভেবেই হাসি পেল।

বিনা প্রোগ্রামে ছন্নছাড়াভাবে ঘুরলে কেমন লাগে, সেটাই তো ছিল দেখবার।

কল্যাণীতে নেমে পড়া মাত্রই কে পাশ থেকে বলে উঠল, বড়মামা না?

মহিম তাকিয়ে দেখলেন। মুখটা খুব চেনা, কিন্তু নামটা চট করে মনে এল না।

মেয়েটি পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতে নীচু হল।

মহিম পিছিয়ে গিয়ে বললেন, আহা হা রাস্তায় এসব কেন?

মেয়েটি অবশ্য এতে নিবৃত্ত হল না। প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চিনতে পারলেন না তো? আমি মিঠু। আপনাদের নারুর মেয়ে।

নারুর মেয়ে! তাই এত চেনা চেনা লাগল। অবিকল মায়ের মত মুখ। মিঠু নামটাও মনে পড়ল। নারু মহিমদের মাসতুতো বোন। বয়সে সামান্যই ছোট-বড়। কৈশোরকালে নারু সম্পর্কে কিছু কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল মহিমের। অবশ্য এমন কিছু না। কৈশোরকালে সব ছেলেমেয়েরই এমন তুতো ভাইবোন সম্পর্কে এক-আধ সময় দুর্বলতা জন্মায়। হয়তো মামা মাসির বাড়ির বিয়ে-টিয়েতে, যেখানে সবাই এক হয় এবং হৈ-হুল্লোড় করার সুযোগ ঘটে।

বিশেষ একটু গভীর দৃষ্টি, অথবা ঠাট্টাতামাসা আর ক্ষ্যাপানোর সূত্রে বেশি কথা বলা, কিছু কাছাকাছি হওয়া, এই আর কি। ক্ষ্যাপানো একটি প্রধান উপায় বেশি কথা বলার।

সেই নারুর মুখটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

চোখ ভুরু পাকিয়ে বলছে, ভাল হবে না বলছি মহিমদা। আমায় ক্ষ্যাপাতে এসো না!

যদিও মহিম তাঁর পারিবারিক জীবনে আত্মীয় সমাজ সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহাল নন। কার কখন ছেলেমেয়ের বিয়ে হচ্ছে, ভাত পৈতে সাধ ষষ্ঠীপুজো হচ্ছে, এসব মনে রাখার আর কোথায় কি করণীয় তা বোঝবার সব দায় দেবযানার। তবে সপ্তাহে একটা-দুটো রাত বরকে হাতে পেলেও, দেবযানা মহিমকে ধরে যতটা সম্ভব অবহিত করতে চেষ্টা করে। বলে নেমন্তন্ন-পত্তরগুলো তো তোমার নামে আসে, তুমি জানবে না কার কখন বিয়ে-টিয়ে হচ্ছে। কলকাতার ব্যাপার হলে নেমন্তন্ন রক্ষার দায়টাও মাঝে মাঝে চাপিয়ে ছাড়ে। নিকট আত্মীয় হলে এখান থেকে প্রতাপ যায়, ওখান থেকে মহিম।

তা দেবযানার মাধ্যমেই কবে যেন মহিম শুনেছিলেন—নারুর ছোট্ট মেয়ে সেই ফুটফুটে চুলবুলে মেয়েটা, সে নাকি স্কুলের গণ্ডি না ছাড়াতেই প্রেম-ট্রেম করে একটা অব্রাহ্মণের ছেলেকে বিয়ে করে বসেছে। সেই সূত্রে বাড়ি থেকে বিতাড়িত। বাপ বলেছিল, ও মেয়ের মুখ দেখব না। আবার অপর পক্ষও, হলেও কনে উচ্চকুল, বিশেষ প্রসন্ন নয়।

তারপর কার কী হল, তা আর মহিমের জানা নেই। সেটা কতদিনের কথা?

হয়তো অনেক দিনই।

মিঠুর চেহারায় তো বেশ ঘর-সংসারী গিন্নী গিন্নী ভাব।

মহিম বললেন, বাবাঃ! কত বড় হয়ে গেছ, চিনব কী করে?

তা কথাতেই তো আছে বড়মামা দিন যায় না জল যায়। কিন্তু আপনি এখানে?

মহিম হেসে বললেন, এমনি ঘুরতে ঘুরতে। বেকার হয়ে পড়েছি তো।

মহিম খেয়াল করেননি, ঈষৎ দূরে একটা সুটকেস হাতে একটি যুবক চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বলে উঠল, এক্ষুণি রিটায়ার করেছেন?

পরিচয় বুঝতে দেরি হল না। মিঠুও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, এই, আগে প্রণাম করবে তো!

মহিম খেয়াল করেননি।

মহিম বললেন, থাক থাক। এই আমাদের একটা মস্ত দোষ। যেখানে-সেখানে ভক্তি দেখানো।

মিঠুর বর বলে উঠল, প্রথা। আবার অন্য সব দেশের প্রথা হচ্ছে যেখানে-সেখানে ভালবাসা দেখানো।

তার মানে ছেলেটা কাজিন আছে।

তবে মহিমের রাগ হল না। হয়তো যেমন হতে পারতে প্রতাপের—মহিম হেসেই উঠলেন।

বয়েস বেশি নয় মিঠুর বরের। বড়জোর বছর ত্রিশ-বাত্রিশ। আর মিঠুর বোধ-হয় পঁচিশ-ছাব্বিশ।

মহিম দেখলেন দু'জনের মুখই যেন আহ্লাদে ঝলমল।

মহিমও ঝলমলে মুখেই বললেন, কেন, খুব ভাল সময়ে রিটায়ার করা হয়েছে?

দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু রাস্তায় দাড়িয়ে কথা কেন? মিঠু, বাড়িতে নিয়ে চল!

মিঠু ঝঙ্কার দিয়ে বলল, সেটা শুধু মিঠুই বলবে? দুটো রিকশা ডাকো।

মহিম তাড়াতাড়ি বললেন, আরে আমি তো এক্ষুণিই ফিরে যেতাম।

যেতেন কিন্তু যাবেন না।

মিঠু বলল, আপনাকে পেয়ে ছাড়ব না কি? চলুন চলুন।

মহিম তবু বললেন, আরে আর একদিন না হয় আসব। এমনি কী খেয়াল হলো ট্রেনে চেপে বসলাম।

হঠাৎ মিঠুর বর বলে উঠল, কিন্তু মিঠু, ওঁর হয়তো আপত্তি থাকতে পারে। তুমি

তো তোমাদের আত্মীয় সমাজে পতিত!

মহিম খপ করে তার কাঁধটা চেপে ধরে বলে উঠলেন, ইস! ছেলেটা তো দুর্দান্ত রে মিঠু! নাঃ বাবা, চল চল। এখানেই বুঝি বাড়ি তোদের? স্টেশনে নামান মনে হল!

রিকশায় উঠেই কথা চালিয়ে যায় মিঠু। সে উঠে পড়েছে বড়মামার সঙ্গে। বরকে হুকুম দিয়েছে, তুমি বোঁ-বোঁ করে চলে গিয়ে অতিথির জন্যে ব্যবস্থা করে ফেলোগে। মনে রেখো রাজ-অতিথ।

কলকলিয়ে কথা বলে চলেছে মিঠু।

আর মহিমের কেবলই নারুর কম বয়সের ভঙ্গীটা মনে পড়ছে। কম বয়েসেরই। বড়-বয়েসে তুতোরা আর কে কার কড়ি ধারে?

মহিমের মা মারা যাবার সময় বোধহয় এসেছিল নীরু বনলতা মাসির সঙ্গে। তখন মিঠু নেহাৎ বালিকা।

তবু মিঠু বলছে, বড়মামা, আপনাদের ছাতে সেই ছোট্ট ঘরটা আছে এখনও? যাকে সবাই চিলে কোঠা বলত? সেই ঘরের দেয়ালে সেই ছোট ছোট কুলুঙ্গী? কুলুঙ্গীর মধ্যে কত কী যেন রাখা থাকতো। বড়মামা, বড়মামী এখনও সেই রকমই দেখতে আছেন? মোটেই গিন্নিবান্নী নয়, বেশ যেন বৌ বৌ। জানেন বড়মামা ছোট-মামাকে আমার যা ভীষণ ভয় করতো।

ওই কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে থেকেই জানা গেল মিঠুর বর সন্দীপ সাহা কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক। এখানে কলেজের হাতার মধ্যেই মিঠুদের কোয়ার্টার, মিঠুর একটি ছেলে, চার বছরের, সেই ছেলেকে গরমের ছুটি পড়েছে বলে কলকাতায় তার ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কাছে রেখে এল—সপ্তাহ খানেকের জন্যে। পরের সপ্তাহে মিঠুর বর গিয়ে নিয়ে আসবে।

মিঠু বেশ সোচ্চারেই বলতে বলতে চলে, সেই সবই হলো। এখন তো নাতি অন্ত প্রাণ। শুধু আমরা দুটো বেচারা বিয়ের পর কতগুলো দিন কত দুর্গতিতেই কাটালাম। যেন চুরির কি খুনের আসামী! এ বাড়িতেও ভাগো হিঁয়াসে ও, বাড়িতেও ভাগো হিঁয়াসে।

এ বাড়িতে আপাত্ত ব্রাহ্মণ কন্যে বৌ হয়ে এলে, তার প্রণাম-ট্রনাম নিতে হবে, তার হাতের সেবা-টেবাও নিতে হবে, অপরাধ লাগবে। আর ও বাড়িতে ঠিক তার বিপরীত চিন্তা।

বুঝলেন বড়মামা, যেই না খোকন জন্মালো, সব যেন মন্ত্রবলে বদলে গেল। দু'-পক্ষই স্নেহের অবতার। দু' বেলা হাসপাতালে আসছেন দেখতে, গাদাগাদা জিনিস আনছেন। আসলে আমাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল আর কি। অথচ মান খোওয়াতে এগিয়েও আসতে পারছিলেন না। এই একটা ছুতো পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। এঁরা খুব ঘটা করে বলতে লাগলেন, ওরে বাবাবে বংশধর। আর ওঁরা মানে আমার বাপের বাড়িরা, যেন আমার বাঁচন মরণ অবস্থা শুনেই ছুটে এসেছেন এইভাবে। অবিশ্যি বাবা তখনো কাঠ-কবুল ছিলেন। আর সবাই আসতো, বাবা আসতেন না। মা একদিন আমায় বলল, তুই তোর বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে একটা চিঠি লেখ্। তাহলেই সব মিটে যায়। কিন্তু খামোকা কেন ক্ষমা চাইতে যাব বলুন বড়মামা? সত্যি তো আর চুরি-ডাকাতি করিনি। আমিও বাপকা বেটি। বললাম, ক্ষমা চাইবার মত কোনো দোষ করিনি। তারপর দেখি এসেছে বাবা একদিন—হি হি মার আঁচলের আড়ালে সোনার আংটি দিয়ে নাতির মুখ দেখে গেল। তাই বলছি—সেই তো সব মিটে গেল শুধু শুধু জীবনের একটা বিশেষ ভাল সময়ের কতকগুলো দিন বৃথা নষ্ট হয়ে গেল। এইটুকু তো জীবন বড়মামা, তুচ্ছ কারণে, অকারণে, তার দিনগুলিগুলো নষ্ট করা কি বোকামি নয় বড়মাম? দেখতে দেখতেই তো মানুষ বুড়ো হয়ে যায়।

মেয়েটা পাশে বসে আছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু অনর্গল কথাই শোনা যাচ্ছে। তবু মহিম হঠাৎ চকিত হলেন। দেখতে দেখতেই তো মানুষ বুড়ো হয়ে যায়।

দেবযানীর চেহারাটা হঠাৎ সামনে ভেসে উঠল। রগের কাছে ঈষৎ কয়েকটি রূপোলী রেখা, মুখের রেখায় ক্লান্তি।

কিন্তু বুড়ো হব না ভাবলেই কি বয়স বসে থাকে। মহিমের জন্যে বার্ধক্য পিছিয়ে থাকলেও বয়সটা তো পিছিয়ে থাকবে না। তা হ'লে? অকারণে জীবনটাকে অপচয় করে চলেছে কে?

মেয়েটা যে কত কথা কয়।

মেয়েটা কি মহিমকে শোনাবার জন্যে কিছু বলল?

তাই কি? ও কতটুকু জানে মহিমের জীবনের?

ও ওর মায়ের মত হয়েছে।

মহিম একবার ওর নিশ্ছিদ্র কথার মাঝখানে একটু বলে উঠলেন, তোর মা তোর কাছে আসে-টাসে?

মাঝে মধ্যে। এখনো পর্যন্ত সংসার করেই মরে তো! বৌদি দুটো তো বেশ পাকা

পোক্ত হয়ে গেছে, তবু মা ভাবে, মা না থাকলেই বুঝি মার সাধের সংসার রসাতলে চলে যাবে। এই ক'দিন আগে দু'দিনের জন্যে ঘুরে গেল।

মহিমের হঠাৎ মনে হল, মহিমের যেন কী একটা লোকসান হয়ে গেল। সেই 'দু-দিনে'র একটা দিন তো আজও হতে পারতো। তবু মহিম হেসে উঠলেন। বললেন, সব মহিলারই দেখছি একই রোগ।

ঝড়াং করে থেমে গেল রিকশাটা।

বোঝা গেল চেনা রিকশা। এবং লোকটা বাঙালী, দিব্যি সব কথাই শুনতে শুনতে আসছে।

আর ক'দিনের মত আজও মনে হলো মহিমের গাড়ির চালককে গাড়ির আরো-হীরা মানুষ বলে গণ্য করে না। যেন ওর শুধু হাত পা-ই আছে, চোখ কান মন মাথা অনুভব উপলব্ধির ক্ষমতা-টমতা নেই।

মিঠু বলল, এসে গেলাম। নামুন বড়মামা!

মহিম তাকিয়ে দেখলেন।

চোখ জুড়িয়ে গেল।

ছবির মত সুন্দর একখানি ছিমছাম ছোট্ট বাড়ি। সামনে এক টুকরো বাগান, এল-শেপ্ বাড়ির সামনের ঘরটায় সুন্দর রঙের পর্দা ঝুলছে। গেট ঠেলে ঢুকতেই প্যাসেজের পাশে পাশে টবে বসানো ফুল গাছ। বারান্দায় উঠতেই দু'খানা হালকা বেতের চেয়ার সামনে তেমনি হালকা ছোট্ট টেবিল। বড়র মধ্যে কোণে দাঁড় করানো একটা মস্ত বড রকিং হর্স। বোঝা গেল মিঠুর খোকনের বাহন।

মহিমের মনে হল ঠিক এই রকম একটি ছবির মত একটি বাসার ছবিই যেন মহিমের বাসনার জগতে গাঁথা ছিল।

মহিম বলে উঠলেন, বাঃ!

কৃতার্থম্মন্যের হাসি হাসল মিঠু। সেই হাসি মুখে মেখেই এগিয়ে এল সন্দীপ সাহা।

মহিমকে শেয়ালদা স্টেশনের সামনে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার সুভাষ বোস একটা মাংস পরোটার দোকান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার গাড়িতে উঠে খানিকটা

এগিয়ে একখানা পুরনো একতলা বাড়ির সামনে এসে হর্নটা বাজাতে লাগল দু'-চারবার।

অবশ্যই সাঙ্কেতিক ব্যাপার।

একটা মেয়ে বেরিয়ে এল দরজা খুলে।

কিছু না বলে চলে এল গাড়ির কাছে।

গলিটা এত সরু যে গাড়িখানা কষ্টেই ঢুকেছে। কোনো ভাড়াটে ট্যাক্সি এর মধ্যে কিছুতেই ঢুকতে রাজী হয় না। গাড়িতে রুগী আছে, বুড়ো আছে, মালপত্তর আছে বলে মিনতি করলেও না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আলাদা।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াবার জায়গা নেই, গালর একটা পাশে তো কাঁচা নর্দমা।

মেয়েটা রোগা লম্বা একটু কাঠ কাঠ গড়ন। মুখটাতেই যা ঈষৎ লালিত্য। কাছে এসে বলল, কী ঠিক করলে?

সুভাষ শান্ত গলায় বলল, কী ঠিক করব। মাকে, বাবাকে রাজী করিয়ে এক্ষুণি তো তোমায় ত্রিবেণীতে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারি। কিন্তু তাতে তোমাকে চাকরিটা ছাড়তে হবে, আর শালা সুভাষের সেই মাংস পরোটা চালাতে চালাতে লিভারের বারোটা বেজে যেতেই থাকবে।

এদিকে দাদা বৌদি যা করছে বলবার নয়।

মেয়েটা বলল গলা নামিয়ে।

সুভাষ একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, বসে দুটো কথা বলবার দিনই যে কবে আসবে। আজ এক ভদ্রলোককে সোয়ারী করেছিলুম—

আঃ! আবার তুমি ওই সোয়ারী সোয়ারী বলছ?

পাইজীর দোকানে ওই খানা খেতে খেতে কি আর মুখ দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেরোবে?

তা হোক। নিজেকে নষ্ট করতে পাবে না বলে দিচ্ছি।

সুভাষ মেয়েটার গাড়ির ধারে রাখা হাতটার ওপর হাত চেপে বলে উঠল, দীপালী, আমাদের মত জীবন আর কারো আছে?

দীপালী কিছু বলল না। শুধু হতাশ নিঃশ্বাস ফেলল একটা।

এখন মনে হচ্ছে তোমাকে আমার সঙ্গে জুড়ে ফেলে খুব ভুল করেছি।

দীপালী মুখ তুলে বলল, ফের ওই কথা?

দীপালীর দাদার কাল নাইট ডিউটি ছিল, আজ দুপুরে বাড়ি বসে আছে। বসে

নয় অবশ্য, শুয়েই। নাইট ডিউটির সময় ও মনে করে, পরদিন সারাদিন ঘুমোনো এবং গড়ানো তার ন্যায্য প্রাপ্য।

ছোট্ট ছোট্ট দু'খানা ঘর। খাঁচাও বলা যায়। তার একটার মধ্যে সে আর তরলা, অপরটায় সংসারের যাবতীয় জিনিস, মায় বর্ষার দিনে গুল, ঘুঁটে, তোলা উনুন, ভাঙা-চোরা বাক্স-তোরঙ্গ আর দীপালী। তাও যে চৌকিটার ওপর শোয় দীপালী তার দেয়ালধারের আধখানা জুড়ে রাজ্যের ছেঁড়া আস্ত লেপ-তোশক গাদা মারা। চৌকিটা বড। একদা এই আধখানায় দীপালীর মা শুতো, আর তার সঙ্গে আইবুড়ো দীপালী।

দুর্দান্ত অসম সাহসিকতায় মায়ের অজানিতে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিস থেকে আই-বুড়ো নামটা ঘুচিয়ে এসেছিল দীপালা। কিন্তু নাম ঘোচানোই সার। ভালবাসার পুরুষের বিছানায় ভাগীদার হওয়া আর হলো না এতোদিনে।

মা মরে গেছে ইতিমধ্যে এবং চৌকিতে মায়ের জায়গাটায় সংসারের সব আপদ বালাই এসে চেপেছে। তা দীপালীর দাদা বিজন ঘোষের কাছে প্রায় তাই-ই ছিল। চিরদিন ভুগেছে, আর ভুগিয়েছে।

খাওয়া হয়ে গেছে। তরলা একটা পান গালে দিয়ে বরের গা ঘেঁষে সবে বলতে শুরু করেছে—দীপালী তার কি কি অসুবিধে ঘটাচ্ছে, এই মহা মুহূর্তে সেই হাড়-জ্বালানো মেজাজ চড়ানো 'হর্ন'-এর পরিচিত শব্দটা ঘরে এসে ঢুকলো। যদিও এখন ট্যাক্সির অভ্যস্ত হর্ন-এর অশালীন তীব্রতাটা অনুপস্থিত। চাপা এবং ঈষৎ বিরতি দিয়ে দিয়ে দু'-তিনবার। মানে সাঙ্কেতিক। আর সে সঙ্কেত কার এদের বর বৌ দু'-জনেরই জানা।

বিজন উঠে বসে বলল, রাস্কেলটা আবার এসেছে।

তরলা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, আহা আসবে না? এখানে ওর যথাসর্বস্ব পড়ে রয়েছে না?

ফেলে রাখতে কে বলেছে। বলে দিয়ে এসো না শালাকে। নিয়ে যা তোর পরি-বারকে আমার বাড়ি থেকে।

তরলা আরো বিষ-বিষ ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে, আহা-হা, সম্পর্কের ভুল কোরো না। কে কার 'শালা' তা মনে রেখো। তা তুমি তো সেদিন বলেছিলে আমি আর নতুন কী বলতে যাব?

আমায় কী বলেছিল রাস্কেলটা মনে আছে তো?

মনে আবার নেই? ওর প্ররোচনায় তোমার মাস্টারনী বোনও তো আমায় শুনিয়ে দিয়েছে। বাড়িখানা যখন তোমাদের মায়ের নামে, আর মা যখন আলাদা

করে তোমার নামে লিখে-পড়ে দিয়ে যাননি মেয়েকে বঞ্চিত করতে, তখন এ-বাড়িতে থাকবার অধিকার তার আছে।

বিজন চাপা গর্জন করে বলে, না, নেই! আমাদের স্বপন বলেছে, বর থাক মেয়ের সে অধিকার নেই। বিধবা হতো আলাদা কথা।

তরলা মুখ বাঁকিয়ে বলে, তোমার বাবা যেমন বেটাছেলেটি ছিলেন! পরিবারের নামে বাড়ি! পড়শীরাও তোমারই বিপক্ষ। বলে কিনা, মাতৃধনে মেয়ের অধিকার বেশী!

ওঃ! সবাই উকিল-ব্যারিস্টার! তা যাক, অধিকার-ফধিকার না তুলে তুমি মিঠে-কড়া করে কিছু শুনিয়ে দিয়ে এসো না। যদি অপমানের জ্বালায়—

শুনিয়ে! হুঁঃ! গণ্ডারের চামড়ায় ফোসকা পড়ে না। তোমার বোনটিকে তো আর শোনাতে কিছু কসুর করি না। মনে হয় যেন শুনতে পাচ্ছে না। নচেৎ একটা-দুটো টিপ্পুনি ঝেড়ে চটি পায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়। এইজন্যেই বলে মেয়েমানুষকে স্বাধীনতা দিতে নেই!

এই আপ্তবাক্যটি প্রয়োগ করে জ্ঞানগরবিনী তরলা আর একটা পান মুখে দেয় কৌটো খুলে।

তারপর আবার বলে, যে মেয়েমানুষ জলজ্যান্ত একটা মা বেঁচে থাকতে লুকিয়ে নিজে নিজে বিয়ে করে নেয়, তার অসাধ্য কিছু নেই। হয়তো বেশি বললে রাগের চোটে ওর ওই 'ডেরাইভার' বরের চেলাচামুণ্ডো দিয়ে রাস্তায় ধরে তোমায় ধোলাই দিতে পারে।

এ চিন্তা যে বিজনের একেবারে আসে না, তা নয়। ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের যতসব লরা ড্রাইভারের সঙ্গে দোস্তি থাকে। আর সেই দোস্তরা যে কী পরিমাণ গোঁয়ার হয় তা জানা আছে বিজন ঘোষের। তার ওরিয়েন্টাল প্রেসের সজনীবাবুকে একটা লরী ড্রাইভার কী জন্যে যেন 'খতম করে দেব' বলে এমন ভয় দেখিয়েছিল যে, সজনীবাবু চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে পালিয়ে গিয়ে এখন নাকি ধান-চাল দেখছে।···ওই ধিঙ্গি অবতার বাড়ি দখল করে বুকে বসে দাড়ি উপড়ে যাবে।

বাড়ি তো ভারি! এই দু'খানা খাঁচার মত ঘর, ভেতর দিকে একফালি সরু রক্ আর কোণাচে একটু শেওলা-পড়া উঠোন। কলের জল আছে, এই মহিমা। তো ওয়াশার কেটে যাওয়ার পর থেকে সারাক্ষণ একটু একটু করে জল পড়ে উঠোনের পিছল মেঝেয় পা দেওয়া দুঃসাধ্য! তবু এই উঠোনে নেমেই দেয়ালধারে করোগেট টিনের ঘেরা দেওয়া কলঘরে গিয়ে চান করতে হয়। তরলা তো কেবলই আছাড় খায়,

আর গজ্ গজ্ করে, নবাবনন্দিনী বাসন মাজেন, তো উঠোনটা একটু ঘষতে পারেন না।

বাসন মাজা, কয়লা ভাঙা, উনুন ধরানো—এ কর্তব্যগুলো দীপালীরই। কারণ সকালবেলা শাড়ি ঘুরিয়ে পরে পিঠে আঁচল ফেলে চটি ফটফটিয়ে মাস্টারী করতে যায় দীপালী। রান্না করার সময় হয় না তার।

তা হলেই কি রান্নাটা তরলা ননদের হাতে ছাড়তো নাকি? দু'দিনেই ভাঁড়ার ফসা করে দিতো না? তরলার অসুখ-বিসুখে তো বাধ্য হয়ে ছাড়তে হয়, অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে।

তরলার ঘরটা অপেক্ষাকৃত সাজানো-গোছানো, নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রীর ঘর তো। চারিদিকে যতই দৈন্যের ছাপ থাকুক, তবু দীপালীর ঘরের মত নয়। অন্তত বাড়ির জঞ্জাল জমিয়ে রাখা হয় না এখানে।

একখানা ঘাড়নডবড়ে টেবিলফ্যানও আছে এ-ঘরে।

তরলা এখন পাখাটা খুলে গা গড়িয়ে শুতো, দীপালী রকের রান্নার জায়গা পরিষ্কার, বাসন-কোসন মেজে তোলা, সকালের জন্যে তোলা উনুন সাজিয়ে রাখা, বিকেলের জন্যে 'জনতা স্টোভে' তেল ভরে রাখা—এইসব করতো বসে বসে। তা নয় 'শ্যামের বাঁশী শুনে বাই উন্মাদিনীর যমুনা কূলের দিকে ছোটার মতো ছুটলেন।' বাড়িটা এমন হতচ্ছাড়া যে, ওই দীপালীর ঘাড়ের কাছে গিয়ে না দাঁড়ালে আর কোথাও থেকে দেখবার উপায় নেই।

তবু বিজন যখন আবারও বলল, যাও না। কী কথা হচ্ছে একবার শুনেই এসো না, অগত্যাই উঠতে হলো তাকে।

দীপালী যখন শেষ বিদায়ের ভঙ্গীতে সুভাষের ট্যাক্সির জানলাটা চেপে ধরে বলে উঠেছে: আমার কিন্তু এই শেষ কথা—

ঠিক তখুনি পিছন থেকে তরলার তরল কণ্ঠ শোনা গেল, কী শেষ কথা গো 'ঠাকুরঝি'? বিরহের জ্বালায় গলায় দড়ি দেবে, না বিষ খাবে?

দীপালী তো ঠিক সেই কথাই বলেছে একটু আগে সুভাষকে। তবু এখন ঘাড় ফিরিয়ে বৌদির নিমের বড়ি মাখানো হাসির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, বালাই ষাট। মরতে যাব কোন্ দুঃখে। বলছি যে ডিভোর্স করবো।

তরলা কালি-পড়া মুখে ভয়ের ভান দেখিয়ে বলে ওঠে, বল কী গো ঠাকুরঝি? তাহলে তো ভাইয়ের সংসারেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

দীপালী ওই 'ঠাকুরঝি' শব্দটা দু'চোখের বিষ দেখে বলেই তরলা এই সেকেলে ডাকটা আঁকড়ে ধরে আছে। নচেৎ আজকাল তো ঠাকুরপো, ঠাকুরঝি, বটঠাকুর ইত্যাদি ডাক চালু নেই। নাম ধরা, নয় দাদা-দিদি বলা।

দীপালী বলল, কেন? তাই বা কেন? এই হতভাগার থেকে একটু বেটার আর একটা হতভাগা আর জুটবে না আমার? যার চাল-চুলো আছে!

তরলা মুখ ছোপ খেয়ে বলে, অ! তা ভাই ডেরাইভার দাদা, রোজ রোজ এই নর্দমার ধারে অভিসার চলবে? হাওয়াগাড়ি হাতে রয়েছে, গিন্নীকে তো নিয়ে একটু হাওয়া খাইয়েও আনতে পারেন?

এটাই বোধ হয় বিজন-নির্দিষ্ট "মিঠে-কড়া"।

সুভাষ এখন কড়া হেসে বলে, বাড়ির ঝিকে হাওয়া খেতে যেতে দিলে গেরস্থর চলবে?

কী? কী বললেন? আপনার পরিবারকে আমরা ঝিয়ের মত ভাবি।

শুধু ভাবেন, তা তো বলিনি! বলে গাড়িতে স্টার্ট দেয় সুভাষ।

তরলা ননদের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে ভিতরে ঢুকে আসে।

ঢুকে আসে দীপালীও। পোড়া ছাইসুদ্ধ, নিভে যাওয়া উনুনটাকে উপুড় করে ঢেলে ফেলে, ছাই থেকে কয়লা বাছতে বসে।

ফুলো ফুলো ধবধবে সাদা লুচির থালাটা সামনে টেনে নিয়ে মহিম দরাজ হাসির গলায় বলে, তুই তো খুব গিন্নী হয়ে গেছিস রে দেখছি। এক্ষুণির মধ্যে এতো সব রান্না করে ফেললি! সকাল থেকে তো বাড়ি ছিলিস না!

মিঠু হেসে উঠে বলে, এতো রান্না কি-বড়মামা? স্রেফ ফাঁকির ব্যাপার তো। রান্নার মধ্যে তো শুধু আলু চচ্চড়ি আলুপটলভাজা। একে কি আর রান্না বলে? দুটো গ্যাসের একটায় আলুটা বসিয়ে দিয়ে অন্যটায় ভাজা ক'টা করে নিলাম। সাতসকালেই ভাত খেয়ে এসেছেন যে! নইলে ভাত খাইয়ে দিতাম। খুব ভালো গোবিন্দভোগ চাল পাওয়া যায় এখানে, কেনা থাকে। যতরকম আনাজ আর ডিম ভাতে দিয়ে, তাও খাওয়া যায়। পাঁচ-সাত মিনিটের ব্যাপার। খান। জুড়িয়ে যাবে।

মহিম পরিতৃপ্তি-পরিতৃপ্তি মুখে লুচিটা মুখে পুরে বললেন, তা তোরাও তো— মানে সেই কখন শ্বশুরবাড়িতে ভাত খেয়ে এসেছিস।

সন্দীপ চাপাহাসি নিয়ে গম্ভীরভাবে বলে ওঠে, দু'জনেই অবশ্য শ্বশুরবাড়ি থেকে নয়। এ হতভাগার ভাগ্যে ওটা তেমন জোটে না।

বলে মিঠুর দিকে তাকায় চোরা চোখে।

ছেলেটাকে ভারি ভাল লেগে যায় মহিমের। বেশ একটু ইয়ারমার্কা আছে। অথচ পি-এইচ ডি করেছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। এই ধরনের ছেলে বেশ পছন্দ মহিমের। তাঁর মনে হয় সরসতাই তো জীবনীশক্তি। হঠাৎ কিছুক্ষণ আগে দেখা একটা একেবারে দীনহীন ছেলের কথাটা যে কেন মনে পড়ে গেল কে জানে। মহিমের যেন মনে হলো, যে ছেলেটা নিজের প্রতি ধিক্কারবশে বলে উঠেছিল, ড্রাইভারের আবার নাম' আর বলেছিল, আমাদের মত হতভাগাদের জায়গায় আপনি খেতে পাবেন না, সেও বোধহয় এরকম একটি জীবন পেলে এরকম সরস সপ্রতিভ কথা কইতে পারতো। মনে হলো, কারণ সেই ছেলেটাকেও মহিমের ভাল লেগেছিল।

প্রথমটায় ঘরে এসে কেবলমাত্র মিঠু বলেছিল, ডাব খাবেন বড়মামা? বোদে এসেছেন।

মহিম বলেছিলেন, ডাব খেতে যাব কী দুঃখে? আমি কি পুকতঠাকুর?

মিঠু হেসে ফেলেছিল, তা নয়, মানে গাছের ডাব।

মহিম অবাক ভঙ্গীর ভান করে বলেন, অ্যাঁ। তাই না কি? তোদের এখানে ডাবেরাও গাছে ফলে? মাটির নিচে জন্মায় না?

মিঠু ঠিক ওর মা'র মত ভঙ্গীতে বলে উঠেছিল—আহা। বড়মামার যা কথা। আপনি একদম একরকম আছেন বড়মামা। কতদিন পরে তো দেখলাম।

সন্দীপ তখন বলেছিল, সত্যিই বাহাদুরী স্বভাবটি না হয় নিজের চেষ্টায় রাখা যায়, কিন্তু চেহারাটি? আমি অবশ্য আগে দেখিনি। তবে এখন বয়েসটা তো দেখছি।

মহিম বললেন, সেটাও তেমন চেষ্টা করতে পারলে রাখা অসম্ভব নয়।

সন্দীপ কপট হতাশার গলায় বলে, কোথায়? এই যে এখনি মাথার মাঝখানের চুল পাতলা হতে শুরু করেছে, ঠেকাতে পারবো?

মিঠু চেঁচিয়েই উঠেছে প্রায়, এক্ষুণি বড়মামার সামনেও সেই আক্ষেপ শুরু হয়ে গেল? উঃ। জানেন বড়মামা, টাক পড়ে যাবার ভয়ে একদম পাগল। চিরুনিতে যদি

দুটো চুল উঠে আসা দেখতে পেল, মনে হবে বুঝি বুকের দুটো পাঁজরই খসে গেল ওর।

হিহি করে হেসে উঠল মিঠু।

মহিম বললেন, ডাব কেন? তোরা চা খাস না?

চা খাই না? হি হি, চায়ের ওপরেই তো আছি।

মিঠু হেসেই খুন। ফিরেই চা খেয়ে শুয়ে পড়বার পরিকল্পনা ছিল। তা আপনি এখন রোদের সময় চা খেতে পছন্দ করবেন কিনা — তাই ভেবে।

মহিম বললেন, রোদের সময় ঠাণ্ডা খাওয়ার থেকে গরম পানীয় খাওয়া বেশি সায়েন্টিফিক।

সন্দীপ মিঠুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, কী?

আর মিঠু হি হি করে হেসে উঠে বলল, ও বড়মামা, আপনার যে দেখছি জামাইয়ের সঙ্গে ভারি মতের মিল। তবে আর কি, চা -

চলে গেল।

সন্দীপ চেঁচিয়ে বলল, কোন হেলপ্ করতে পারি?

মিঠু বলে গেল, আঃ! ভাল হবে না বলছি। দেখছেন তো বড়মামা।

বড়মামা মনে মনে একটু হাসলেন।

কী দেখবেন? কত জালাতনের মধ্যে আছে মিঠু? উপ্‌চে-পড়া সুখের জন্যে বোধহয় দর্শকেরও দরকার থাকে। বলতে চায়, ছাখো ছাখো আমরা কত ঐশ্বর্যবান।

মহিমের হঠাৎ মনে হলো এইরকম সুখ-উছল ছোট্ট একখানি ছবির মত সংসার কোথায় দেখেছেন তিনি? কোথায় কোথায়? অথচ মনে পড়ছে দেখেছেন। তা হলে? কবে? কখন? কোনখানে? স্বপ্নে?

হাত-মুখ ধুয়ে নিন বড়মামা।

সন্দীপের ডাকে ভিতরে চলে এলেন মহিম। এখানেও একই রকম। যেন 'ছিমছাম' শব্দটির একটি শরীরী রূপ।

ঢুকেই যে মিনি হলটি, তার মাঝখানেই খাবার টেবিল পাতা। পাশের যে পর্দা ফেলা ঘরটি দেখা যাচ্ছে, সেটা অবশ্যই এদের শোবার ঘর। তার গা ঘেঁষেই একটা সরু প্যাসেজ দিয়ে বাথরুমের সামনে পৌঁছে দিল সন্দীপ। দিয়ে গেল ফর্সা তোয়ালে, নতুন সাবান।

বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সামনে ঝোলানো আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আয়নায় পড়া ছায়াটাকে মনে মনে বলে উঠলেন, ওহে মহিম হালদার! কী মনে

হচ্ছে ? মনে হচ্ছে না এই বাড়িখানার নক্সাটা তুমি এঁকে দিয়েছিলে একদা। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক তাই মনে হচ্ছে। এইটা দেখবার জন্যেই বুঝি আজ তোমায় যেদিকে দু' চক্ষু যায় যেতে ইচ্ছে হয়েছিল ?

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেই মহিম দেখলেন মিঠু টেবিলে থালা সাজিয়ে বসে আছে।

বলে উঠলেন, মাই গড্ ! এরই মধ্যে এতো সব তৈরি হয়ে গেল ?

তারপর শুকনো তোয়ালে দিয়ে ঘাড়টাকে ঘষে ঘষে মুছতে মুছতে বললেন, এখন বলতে হয় থ্যাঙ্কস গড্। খাবারের থালাটা দেখে অনুভব করছি, কী দারুণ খিদে পেয়ে গিয়েছিল ! চায়ের সঙ্গে 'টা' বেশ উত্তম দেখছি।

ইস ! বড়মামা ! সত্যি ! আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে ! ইস্, ছেলেটার জন্যে এমন মন কেমন করছে ! খুব মিস্ করল। আপনাকে দেখলে এক মিনিটে জমিয়ে নিতো।

মহিম একটু হেসে বললেন, 'মিস্'টা কে করল ? সে, না আমি ? তার তো দু'দিকে দুটি দাদু। বাড়তি একটা দাদু, এমন কী ?

মিঠু মুচকি হেসে বলল, দু'দিকের দুই দাদুই তো কালো কালো। আমার বাবাকে তো জানেনই, এর বাবাও তাই। আর আমার পুত্তুরটি হচ্ছেন ফর্সা-ভক্ত। ফর্সা দেখলেই ওর আহ্লাদ ! তাই জন্যে মাকে ওর খুব পছন্দ ! ইস্ ! মা-ও খুব মিস্ করল। এই তো ক'দিন আগে থেকে গেল দু' দিন। সেটা যদি এ-সময় হতো !

মহিম আর একবার মনে করলেন, কে 'মিস্' করল ?

আশ্চর্য। নীরুকে আবার কবে মনে পড়েছে তাঁর ? কলকাতায় কবে যেন একদিন কার বিয়েতে মহিম গিয়েছিলেন মেস থেকে, প্রতাপ দেশ থেকে।

সেদিন প্রতাপ বলেছিল, তুমি এতক্ষণে এলে ? নীরু এসেছিল, বাড়িতে কার যেন অসুখ বলে চলে গেল তাড়াতাড়ি। তো কেবলই 'মহিমদা মহিমদা' করে হেদোলো। আমাকে পুঁছলই না।

মহিম সেদিন হা হা করে হেসেছিলেন, তোকে যে চিরদিন সবাই ভয় করে !

কিন্তু সেদিন তো এমন কিছু একটা হারানোহারানো ভাব হয়নি। একবারই শুধু মনে হয়েছিল, ইস্, আর একটু আগে বেরিয়ে পড়লেই হতো। তাছাড়া আর কী ?

অথচ আজ মনে হচ্ছে সত্যিই কিছু একটা মিস্ করলেন। মিঠুর প্রতিটি ভঙ্গীতে কথায় হাসিতে মায়ের ছাপ দেখে ?

যদিও তফাত একটু আছে, মিঠু একটু বেশি স্বাস্থ্যবতী। এ-বয়সে নীরু ছিল ছিপছিপে ! তবু সাদৃশ্য বড় অদ্ভুত জিনিস। বারবার অতীতের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

আজকে কিন্তু আপনাকে থেকে যেতে হবে বড়মামা।

বলল মিঠু খাওয়ার পর বসবার ঘরে এসে।

হা হা করে হেসে উঠলেন মহিম।

থেকে যাব কী বল?

কেন বাপু, মেয়ের বাড়িতে থাকতে নেই একদিন? না হয় একটু কষ্টই হবে।

উঃ! কী গিন্নী হয়েছিস রে তুই! থাকতে নেই কে বলেছে? তোর বাড়ি দেখে আমার খুব ভাল লাগছে রে। কিন্তু হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছি তো—

তাতে কী? আপনি তো মেসে থাকেন। কে আপনার জন্যে ভাবতে বসবে।

তা ম্যানেজার একটু ভাবতে বসতে পারে। তার বহুকালের খদ্দের তো। গাড়ি-ফাড়ি চাপা পড়লো কিনা—

ইস্! যা-তা বলছেন কেন? বেশ না-থাকুন, রাতে খেয়ে যেতে হবে।

কী সর্বনাশ! এই বেলা তিনটের সময় এতো খেয়ে আবার রাতে খাবো কী বল?

আহা! ভারি তো দুটো ভাজা আর লুচি। তাও কটাইবা খেলেন? রাত্রে আপনাকে ফ্রায়েড রাইস আর মুরগী খাওয়াবো বলে আপনাদের জামাই বাজার খোলার অপেক্ষায় রয়েছে।

ওরে বাবা! থামা থামা। মিথ্যে কষ্ট করবি কেন? রাতে আর খাওয়া অসম্ভব!

সন্দীপ কোথা থেকে যেন এসে বলল, তার মানে ফিগার ঠিক রাখার জন্যে খাওয়ার ওপর কণ্ট্রোল। তা রাত্রে থাকলে কাল সকালে ভাত-টাত খেয়ে—

না হে বাপু, না। এভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলে সত্যিই পুলিসে খবর চলে যাবে।

বেশ তাহলে আবার আসবেন।

চেষ্টা করব।

মিঠু বলল, চেষ্টা করব কেন, নিশ্চয়ই আসবেন। বাড়িতে কেউ এলে এতো ভালো লাগে!

মহিম আর একবার ভাবলেন, হয়তো তাই। সেটাই সত্যি। 'সুখ' দেখবার জন্যে দর্শকের দরকার! যাদের সুখহীন জীবন, তারাই মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণ।

মহিম বললেন, রাত দশটার মধ্যে শেয়ালদা থেকে মেসে পৌঁছতে পারি এমন একখানা গাড়ি বাতলে দাও হে প্রফেসর, তাহলে আর একটু জমিয়ে বসে, আর একবার মিঠুর হাতে চা খেয়ে পালাব।

সে বলে দেব। মেস তো আপনার শিয়ালদা থেকে বেশি দূর নয়।

মিঠু তখন বলে ওঠে, আচ্ছা বড়মামা, আপনি রিটায়ার করেও মেসে থাকলেন

কেন ?

মহিম একটু হেসে বললেন, তুই বল দেখি কেন ?

বাঃ ! আমি কী করে জানব ? মা শুনে দুঃখ করে বলছিল, ব্যাপারটা যেন ধাঁধার মত।

সেরেছে ! এর মধ্যে আবার তোর মা'র দুঃখ আসছে কোথা থেকে ? আর জানলই বা কী করে ?

আহা জানে না আবার কে ? আপনার লোকেদের মধ্যে দেখা-টেখা হয় না ? তবে মা বলছিল মহিমদা চিরকালই উল্টোপাল্টা।

তবে আর কী। ধাঁধার উত্তর তো পেয়েই গেছে।

সন্দীপ একটু হেসে বলে, আর একটা উত্তরও আছে বোধহয়।

মিঠু বলে, তুমি আবার আমাদের ব্যাপারের কী জানো শুনি ?

সন্দীপ বলল, ব্যাপারটা তোমাদের নিজস্ব নয়, ব্যাপারটা সর্বজনীন। ধাঁধার উত্তর হচ্ছে—বন্ধনের ভয়। মুক্তির পিপাসা।

সাবাস বাংলার অধ্যাপক ! মহিম ওর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

মহিমের সুপুষ্ট বলিষ্ঠ থাবার মধ্যে ওর পটকা হাতটা প্রায় ডুবেই গেল।

ট্রেনের সময়টুকু তো সামান্যই। তবু সেইটুকুর মধ্যেই ভাবতে থাকলেন মহিম, সকাল থেকে কী কী ঘটলো।

'স্বাধীনতা'র প্রথম দিনেই প্রাপ্তিযোগটা নেহাত কম হলো না। অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত।

মনে পড়লো সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার সুভাষ বোসের কথা। সেই কলা-খাওয়া এম-এল-এ-র কথা। সেই গল্পটা শুনে মিঠুর হেসে গড়াগড়ি খাওয়ার আর তার বয়ের উচ্চরোলের হাসির কথা।

আর তারপর ওদের বোধহয় কিছু কাজের দরকারে উঠে যাবার সময় মহিমের কাছে ওদের ছেলের ফটো অ্যালবামটা ধরিয়ে দিয়ে যাওয়ার কথা।

বলল, আমার ছেলেকে তো আপনার এবার দেখা হলো না বড়মামা, তার ছবি-গুলোই দেখুন বসে বসে।

হ্যাঁ, এখনকার ভাগ্যবান শিশুদের এসব থাকে। ছোট-বড় নানান অ্যালবামে ভর্তি চিত্রমালার সম্ভার।

শিশুর নাড়িকাটা থেকে শুরু করে তার প্রতি পর্যায়ের নড়াচড়া, পাশ-উপুড়,

হাসি-কান্না, নাওয়া-খাওয়া, ওঠা-বসা, হাঁটাচলা, সব কিছুর চিত্ররূপ রেখে দেওয়া হয়। অতি গেরস্থর ঘরেও হয়। তবে সেগুলো হয়তো কালো-সাদা, ভাগ্যমন্তদের ঘরে রঙিন।

অতিথি বিনোদনের এ একটি উপকরণও।

অদেখা সেই তুতো নাতিটির সেইসব বিচিত্র পর্যায়ের ছবির পাতা উল্টোতে উল্টোতে একটায় চোখ একটু আটকে গিয়েছিল। দিদিমার কোলে বসে থাকা ছেলে-টার ছবিতে। মোহভঙ্গ হলো। এই তুলোর বস্তার মধ্যে থেকে সেই তন্বী তরুণীটিকে খুঁজতে চাওয়া হাস্যকর বিড়ম্বনা।

দশটার আগেই মেসে ফিরে আসতে পারলেন মহিম। এসে দেখলেন স্বদেশরঞ্জন সন্ধ্যা থেকে এসে বসে আছে।

সাতপুরুষে কি চৌদ্দপুরুষে কুমোরের ঘরের ছেলে সোনা পাল কুমোর হতে গিয়ে হঠাৎ মাটির তালেদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে হাত গুটিয়ে বেরিয়ে পড়ে, কী মুশকিলেই যে পড়ে গেছি। কোথাও সে বসবাসের জন্যে একটু মনের মত ঠাঁই পাচ্ছে ন, পাচ্ছে না জীবিকার জন্যে একটা মনের মত কাজ।

শেষবার গোপীচন্দনপুর ঘুরে আসার কালে বাপ বলেছিল, তুই কি শেষ অবধি রাস্তার একটা পাগল ভিকিরি হয়ে যাবি? অ্যাঁ? লোকের দোরে দোরে মেগে খাবি আর ধুলো-ধুশকুণ্ডি হয়ে বেড়াবি, রাস্তার ছেলে গায়ে ঢিল ছুঁড়বে, এই তুই চাস?

মোনা ফুঁসে উঠে বলেছিল, মোনা লোকের দোরে দোরে মেগে খায়?

না খাস তো, পাস কোথায়? অ্যাঁ? লোকে তোরে সদ্‌বাম্ভন ভেবে ডেকে ডেকে বাম্ভন ভোজন করায়?

সদ্‌বাম্ভন ভাবে কি চাঁড়াল ভাবে তা জানি নে, ডেকে খেতে দেয়। বাস!

তো পরন-পরিচ্ছদের কী ছিরি? অ্যাঁ? তোর নিজের মার পেটের ভেয়েরা শার্ট-পেণ্টুন পরে, লুকে সিগারেট গুঁজে সাইকেল চেপে বেড়াচ্ছে, আর তুই—

রোষে ক্ষোভে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল দীনু। দীনুর অবস্থা এখন প্রায় চলচ্ছক্তি-হীন। বাতের ব্যথায় পঙ্গু করে ফেলেছে তাকে। তবু দীনু ছেলেদের কাছে ঘ্যান-

ঘ্যান করে, তাকে ধরে ধরে বাইরে এনে চাকের নিকট বসিয়ে দিলে, আর হাতের কাছে 'ছানা' মাটির তাল ধরিয়ে দিলে, সে এখানে বসে বসে খুরি-গেলাস-হাঁড়ি-সরা বানাতে পারে। তবে সে কথায় কান দেয় না কেউ।

দুটো ছেলে তো গোপীচন্দনপুর ছাড়া। মাঝেমধ্যে আসে। একটাই বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভিটেবাড়িতে থাকে। বেটা নাকি সিনেমা হলের টিকিট কাউন্টারে চাকরি করে। তা বুড়ো বাপের দায় তার ওপরই এবং সে দায় বহনের দায় তার বৌটারই। এটা অবশ্য সমাজ জীবনে স্বাভাবিক ঘটনাই। পুরুষের কী পারিবারিক, কী সামাজিক, কী ব্যবহারিক, সকল প্রকার দায়ই নামে তাদের হলেও সে দায় বহনকারিণী মেয়েরাই। বৌ তো বটেই, ক্ষেত্রবিশেষে বোনও হতে পারে, মেয়েও হতে পারে, আরো কেউও হতে পারে। বৌ-ই অবশ্য প্রধান। যাকে নাকি অর্ধাঙ্গিনী সহধর্মিণী এইসব ভাল ভাল নাম দিয়ে রাখা হয়েছে।

অতএব বাড়িতে থাকা সেজ ছেলের বৌটাকেই বুড়ো শ্বশুরের ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে হয়। অবিশ্যি শ্বশুরকে ধরে ধরে ঘর থেকে বাইরে এনে বসিয়ে দেয়। গরমের দিনে হাতের কাছে রেখে দেয় এক ঘটি জল, আর একখানা হাতপাখা। ব্যস, তারপরই নিজেই হাওয়া। শীতের দিনে গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে দিয়ে মাদুর পেতে বসিয়ে দিয়ে যায়। হাতের কাছে রেখে দিয়ে যায় একটা তেলচিটে বালিশ, আর একখানা তার শাশুড়ীর হাতে সেলাই করা ছেঁড়া কাঁথা। বালিশটা তেলচিটে হবে না তো কী হবে? খোড়ো বাড়ির চালের মত মাথাটায় দানু দৈনিক এক ছটাক তেল না মেখে ছাড়ে? একটু ঘাটতি হলে গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে না? সভ্য শিক্ষিত না হওয়ার এই একটা পরম সুবিধে! গালাগালির চোটে, পাওনা আদায় করতে আত্মসম্মানে বাধে না, বরং ভাবে এটাই মান-সম্মান আদায়ের প্রকৃষ্ট উপায় এবং এতেই গৌরব রক্ষিত হয়।

'সভ্য-শিক্ষিত'দের এ উপায় নেই। তাদের আত্মসম্মানের মাপকাঠি আলাদা। কাজেই গালিগালাজটা মনের মধ্যে নিরুচ্চার রেখে কৃতার্থম্মন্যের ভঙ্গিতে পড়ে থাকতে হয়।

দীনুর পাল্লায় সুবিধের ভারি বাটখারা। দানুর 'মুখ'-এর ভয়েই তার হাতের কাছে এসে যায়।

কাঁথাটা ছেঁড়া?

তা সেও ছেলে-বৌয়ের দোষ নয়, দীনুরই দোষ। বাপের জন্যে ভাল একখানা মোটা চাদর এনে দিয়েছিল মেজ ছেলে কলকাতা থেকে, কিন্তু দীনু বলল—তোমার

শাউড়ীর হাতের বুননো কাঁতাখানা কোতায় গেল? অ্যা। কাউকে দাতোব্যো করেচো না কি? না না সেটাই ছাও। এ চাদর তুলে রাকো। মরে গেলে চাপা দে মডিপোড়ার ঘাটে নে যেও। পাঁচজনে দেখে সুখ্যোতি করবে।

যে বৌটা খেটে মরে, আর যে ছেলেটা বাড়িতে থাকে, তাদের ওপরই বেশি আক্রোশ দীনুর।

হ্যাঁ, আক্রোশ তো বটেই।

ছেলেদের এই সাজসজ্জে, বাহার বাবুয়ানা দেখলে চোখ জ্বলে যায় দীনুর। ছেলে যখন ঝাঁপ দরজা ঠেলে উঠোনে ঢুকে এসে ঝডাং করে সাইকেলখানা কাঁঠাল গাছের গোড়ায় ঠেকিয়ে রেখে, পেণ্টুনের পকেট থেকে রঙীন রুমাল বার করে ঘাড-গলা মুছতে থাকে, দীনু সোচ্চারে স্বগতোক্তি করে, এই যে 'নক্কাপায়রা' এলেন। এরেই কয়, পোঁটা চুনির বেটা চন্নন বিলেস। চোদ্দপুরুষের জেবন গেল ট্যানা পরে, গামচা গায়ে দে, আর অ্যাখোন—শার্ট-কোট-জুতো-পেণ্টুন। এতো বাড ভালো নয়'

'টোনা' এসব কথা গায়ে মাখে না, কিন্তু টোনার বৌ ক্ষেপে ওঠে। হয়তো কোনখান থেকে তেডে বেরিয়ে এসে চেঁচাতে থাকে, পেটের বেটাকে শাপমুন্যি! 'ভালোমন্দ' দেকানো! অ্যাঁ! উনি আকোন্দোর ডাল মুডি দে থেকে জন্মো বেঁচে থাকবে বলে নোকে আর সাদ-আহ্লাদ কিছু করবেনি।

বয়সে অবশ্যই নেহাতই তরুণী টোনার বৌ। কিন্তু কথার ঝাঁজে তরুণীসুলভ নয়।

কালা দীনুর কান বেশি বাঁচাতে হয় না, তবু টোনা বাপের কান বাঁচিয়ে বৌয়ের দিকে সিনেমার হিরোসুলভ দৃষ্টি হেনে, সোহাগের গলায় বলে, যেতে দাও না। শুদুমুদু মাথা গরম করে লাভটা কী? জম্পেস করে একটু আদা-মরিচ দিয়ে চা বানাও দিকি।

বৌ গলার ঝাঁজ প্রায় সমান রেখেই বলে, ক' প্যায়লা চা ধ্বংসো করে আসা হয়েচে?

তবে চোখের দৃষ্টিতে আলো ঝলসায়।

টোনা বলে, তা এককুডি হতে পারে। তবে পরিবারের হাতের তো নয়।

দীনু এসব রঙ্গ কথাগুলো বুঝতে না পারলেও তার অন্তর্নিহিত রহস্যটি বোঝে। আর কিছু না, আদিখ্যেতা। সোহাগ কাডা। জ্বলে যায় অন্তরে অন্তরে।

এইসব 'বাবু' ছেলের ওপর দীনুর ভিতরে ভিতরে হিংসে। অথচ তার বাউণ্ডুলে পাগলা-ছাগলা ছেলেটাকে 'বাবু' সাজে দেখতে সাধ হয় তার। ইচ্ছে হয় মোনাও বাইরে থেকে কোনোদিন এদের ওপর টেক্কা দেওয়া সাজসজ্জে করে, সিগ্রেট ফুঁকতে

ফুঁকতে 'ছাইকেল' চেপে চলে আসুক। ছাইকেলখানাকে ঝড়াং করে কাঁঠাল গাছের গোড়ায় ঠেকিয়ে রেখে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দেয়, কী গো বাপ? আচো কেমন? কিনে ফেললুম এই ছাইকেলটা।

ঘাড় গুঁজে বসে বসে এই রকমই সব স্বপ্ন দেখে দীনু। এ একটা আশ্চর্য মনস্তত্ত্ব বৈকি। এক ছেলেকে দিয়ে অপর ছেলেদের ওপর 'টেক্কা' দেওয়ার মধুর ছবি দেখা।

কিন্তু দীনুর কপাল। সেই হতভাগা লক্ষীছাড়া ছেলেটা কিনা যখনি অনেকদিন বাদ বাদ এসে উদয় হয়, প্রায় রাস্তার পাগলের মূর্তিতেই, দীনুর মাথা কুটতে ইচ্ছে হয়।

বেশির ভাগ তো মোনা কাউকে কিছু না বলে অন্তর্ধান হয়, কি জানি কী ভেবে এবারে বাপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আর তিষ্ঠোতে পারাছি নে বাপ, চললুম আবার। বলে চললুম, এই কারণে আর দেখা হয় না হয়।

বাপ হাউহাউ করে চেঁচিয়ে বলে উঠল, আবার চললি হারামজাদা শুয়োরের ছা। কয়ে রেকেছিলুম না, এবার আর বাপের ছেরাদ্দটা না হওয়া পর্যন্ত যাস নে!

মোনা হো-হো করে হেসে উঠে বলে, অ্যাই বাস! জনমের অগ্রেই অন্নোপাশন! মরার আগেই ছেরাদ্দ।

মরবো না আমি?

কবে মরো তার ঠিক আছে? আর দিন যদি ফুরোয়ই, মুখে আগুনটা দিতে তো তোমার অন্যসব দিগ্‌গজ ব্যাটারা রয়েছে।

ওই হারামজাদারা কেউ আমায় পোঁচে?

তা না পোঁচুক, মরে গেলে, কাঁদে চাপিয়ে নিয়েও যাবে, মুখে আগুনও দেবে। আর লোক দেখিয়ে ঘটা-পটার ছেরাদ্দও করবে।

তুই পেটের ব্যাটা না? তোর কোন কত্যোব্যো নাই?

কত্যোব্যো? মোনার?

মোনা আবার হেসে ওঠে, মোনা আবার মনিষ্যি, তার আবার কত্যোব্যো! চললুম।

দীনু হাত বাড়িয়ে লোহার সাঁড়াশির মত শক্তপোক্ত আঙুল ক'টা দিয়ে ছেলের গায়ের একখানটা খামচে ধরে বলে, তো হালদার বড়মা যে তোরে বলেছেলো ওনার কাচে থাকতে, বে-থা করে ঘর-সংসার করতে, উনি সব ভার নেবে, তার কী হলো?

মোনা তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, বললেই তো হলো না। বে-থা! ঘর-সংসার! বলি ঘর-সংসার করতে নিজোস্বো এ্যাকখানা রমোনী চাই না?

কী? কী বললি অ্যাঁ। নিজোম্বো এ্যাকখান। রমোনী চাই? বলি, ধেড়ে ইঁদুরের বাচ্চা, ছুঁচোর ছাঁ! বে না করলে নিজোম্বো রমোনী তুই পাবি কোতায়?

মোনা হাতের গাঁটরি পিঠে তুলে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, সেইটেই তো বিত্তান্তো! সেটাই তো খুঁজে মরছি!

চলে গেল হনহনিয়ে।

এখন আর খড়ি-ওঠা হাত-পা নয়, ধুলোওড়া মাথা নয়। বেশ কিছুদিন গাঁয়ে রয়েছে, দেবযানীর স্নেহচ্ছায়ায়। দেবযানীর দেওয়া ধুতি আর শার্ট পরনে, হাতের বোঁচকাটায় আর দু প্রস্থ মজুত। এটা আর নিতে আপত্তি করেনি মোনা।

জামা-কাপড়ের অভাবটা যে বেশ একটা জ্বালাতুনে অভাব! বাপটা যা বলে, তারই যোগাড়। কোনদিন না পথের ছেলেগুলো 'ন্যাংটা পাগল' বলে ঢিল ছুঁড়বে।

দেবযানী একটা ফর্সা জামা-কাপড় পরতে দিয়েছিল, আর দু জোড়া ধুতি-গেঞ্জি সঙ্গে দিয়ে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল, নোংরা হয়ে থাকিস নে মোনা, নোংরা হয়ে থাকলে শানিতে ধরে।

মোনা অবশ্য মনে মনে খুবই বিপদ গুণে বলেছিল, এই তো আপনি আবার মোনার গলায় একটা গলগ্‌গেরো চাপালে! কোতায় থোবো, কোতায় থোবো করে ভেবে মরতে হবে। চোর-ছ্যাঁচোড়ের ভাবনা ছিল না পেরাণে। উদোমের নাই বাট-পাড়ের ভয়, এই শান্তিতে থাকি!

অতো শান্তি চাইলে তো সত্যিই উদোম হয়ে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে তপস্যা করতে হয় রে মোনা? তা তুই তো বলিস, তপস্যায় মন নেই তোর। ভগবানের ধার ধারতে বয়ে গেছে। মনের মতন একখানা বাসস্থান পেলেই ব্যাস!

তো সে কথা তো এখনো বলছি। আবার তো সেই আশাতেই বেরোনো।

দেবযানীর কাছ থেকে চলে এসে বাপের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে পড়েছিল।

বারবার অনুরোধ করেছিল দেবযানী, একেবারে ডুব মারিস নে বাবা! আবার আসিস তাড়াতাড়ি।

কিন্তু সে কবে?

কতদিন আগে বেরিয়ে পড়েছিল মোনা? কিন্তু মোনা আবার এতো কী দামী ব্যক্তি যে, তার জন্যে এতো আকুলতা দেবযানীর? মোনার বাপের হয় আলাদা কথা, দেবযানীর এতো কেন? কেবলমাত্র বন্ধ্যা নারীর বাৎসল্য ক্ষুধা?

সবটাই কি তাই?

অবচেতনের অন্তরালে কি মোনা নামের ওই বাউণ্ডুলে হতভাগাটা দেবযানীর

এক টা পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপকরণ ?

কী সেই পরীক্ষা ?

একটা বন্ধনভীত 'ঘর-পালানে' মনকে স্নেহ-ভালবাসা, আদর-যত্নের ভার চাপিয়ে চাপিয়ে তাকে ঘরবাসী করা যায় কি না ?

নাকি, শুধুই বাল্যে মা-মরা একটা পাগলা-ছাগলাটার ওপর মায়া স্নেহ ?

মনের গভীরে কোন্‌টা যে কী কাজ করে চলে, মন নিজেই কি জানে ? বাড়ির আর কেউ ওই লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটাকে যে দেখতে পারে না, তা দেবযানীর জানা বলেই কি ওর ওপর এতো পক্ষপাত দেবযানীর ? যাতে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়া যায় ! হয়তো বা অন্যের থেকে একটু উচ্চস্তরে উঠে যাওয়া ! উঠে যে যেতে পেরেছে তার প্রমাণ তো প্রতাপ।

কাষ্ঠকঠিন কিপ্‌টে প্রতাপ যে মোনাকে দুর-দুর না করে ক্ষ্যামা-ঘেন্নার চোখে দেখে, ডেকে কথা কয়, আর খরচের ব্যাপারে উদার হয়। সেটা কি দেবযানীর মন আর মান রাখতে নয় ? মনে মনে সম্মান না করলে 'মান রাখার' প্রশ্নটা কোথায় ?

কিন্তু দুটো নতুন ধুতির জোড়া আর দু' জোড়া গেঞ্জির সম্ভার নিয়ে দেবযানীর কাছ থেকে যে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল মোনা ? কতদিন হয়ে গেল ?

দীনু কুমোর যে একদিন রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 'অক্কা' পেয়ে বসলো, সেটাই বা কবে ?

দীনুর আর দুই ছেলে-বৌ এসে টোনার আর টোনার বৌয়ের ওপর যথেচ্ছ ঝাল ঝাড়ল। মনে মনে এমন নীরবে নিশ্চিন্তে এতোবড়ো একটা দায় আপনি আপনি মিটে গেল বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও, মুখে বাপের জন্যে শোকে বিগলিত হলো, বাপের মরা মুখটা দেখতে পেল না বলে আপসোস করল, আর পাড়ার লোককে ডেকে ডেকে বলতে লাগল, ঘরে থাকা ছেলে-বৌয়ের অযত্নে-অবহেলাতেই এমন ঘটেছে, নইলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে থাকে মানুষ ? রোগ বালাই তো দূরের কথা, মরণ খিঁচুনিও খিঁচোলো না একবার ? চেহারায় তার চিহ্নমাত্তর নেই।

ডাকের সাজের কাজী মেজ ছেলের বৌ কলকাতার মেয়ে, আর বরের কল্যাণে কলকাতাতেই বসবাস। সে কথা কয় কম। মুচকি হেসে বলল, ভূতে এসে গলা টিপে দিয়ে যায়নি তো ?

বড় বৌ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, ভগবান জানে, ভূত না পেত্নী। শরীলে তো আর জোর-শক্তি বলতে কিছু ছিল না।

বড় ভাই বলল, বিছানা-পত্তর ওলোটপালোট কেনোরে টোনা। বিছানার নীচে

বাবার কত কী থাকতো।

বাবার আবার কত কীটা কী শুনি? তুলতে গিয়ে দেখি, বিছানা নোংরা, তো রেখে দেব তেমনি? পাড়ার লোকেরা সাক্ষী ছিল, ডেকে শুধোও গে।

তা শুধোলেই বা কী? কেউ নিরীক্ষণ করে দেখেছে না কি, কী ছিল আর না ছিল?

'কিচ্ছু দেখেনি' বলে ভাইয়ে ভাইয়ে একটা লাঠালাঠির দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হবে না কি?

কিন্তু আর একটা ভাই?

তাকে খুঁজে আনা হবে না? যতই হোক বাপ বলে কথা। জন্মটা তো দিয়েছিল। তার নামে দু'দিন হবিষ্যিও করবে না?

এখন তিন ভাইয়েই একমতের বন্ধন।

তা হবিষ্যি করানোর জন্যে তাকে কোন্ চুলো থেকে খুঁজে আনা যাবে শুনি?

মোনার পৃথিবী থেকে 'বাপ' নামের জিনিসটা উপে গেল। মোনা জানতেই পেল না!

কিন্তু জানতে পারার পর কি মোনা খুব বেশি বিচলিত হয়েছিল?

না কি শেষ বন্ধন ঘুচে গেল বলে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল?

কথাটা ভেবেছিল পাড়ার হালদার বাড়ির বড়বৌ।

মহিমকে ঘরে এসে ঢুকতে দেখেই স্বদেশরঞ্জন তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে এগিয়ে এসে প্রণামের জন্যে নীচু হতেই মহিম তাড়া দিয়ে বকে উঠলেন, ফের?

পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম মহিমের ভারি অপছন্দ। তাই সবাইকেই বকে রেখেছেন। নাছোড়রা আবার নতুন করে বকুনি খায়।

স্বদেশ হেসে ফেলল। বলল, স্বভাব যায় না মলে। কিন্তু বড়দা, এতো রাত অবধি কোথায় ঘুরছিলেন? শেষ পর্যন্ত তো বেশ ভাবনাই ধরে যাচ্ছিল। আপনাদের ম্যানেজারবাবুটিও দেখলাম বেশ চিন্তিত। বললেন, ওঁর মত নিয়মী লোকের এরকম হবার তো কথা নয়। এক দিনের জন্যে তো নিয়মের এদিক-ওদিক দেখিনি!

মেসে ঢোকবার সময়ই দরজা থেকে শুনে এসেছেন মহিম, তার ভগ্নিপতি সেই কোন্‌কাল থেকে এসে বসে আছে। শুনে তারও একটু ভাবনা লেগেছিল। কী ব্যাপার, কোনো খারাপ খবর নয় তো? অবশ্য টেনে-বুনে ভাবনা করা স্বভাব নয় মহিমের, নাচে থেকেই একজনকে জিগ্যেস করেছিলেন, 'কেন এসেছে বলেছে কিছু?'

ত বলেনি শুনে মন থেকে ভাবনা ঝেড়ে ফেলে চটপট ওপরে উঠে এসেছেন।

মহিম একটু হেসে বললেন, বাধা গরু ছাড়া পেলে যা হয় আর কি! তা তোমায় একটু চা-টা অফার করেছিল এরা?

'অফার' মানে? বার তিনেক হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, বল কি! এমন অতিথিবৎসল ব্যক্তি কে আছে এখানে?

বলেন কি বড়দা, দেখলাম তো প্রতিটি ব্যক্তিই অতি মাইডিয়ার! সন্ধ্যে থেকে তো এখানে জম্পেস একখানা আড্ডা চলছিল। মুরারিবাবু, শশাঙ্কবাবু, নীলকণ্ঠবাবু এবং আরো অনেকে দিব্যি মজলিস বসিয়েছিলেন।

মহিম হেসে বললেন, যদি অহঙ্কার না ভাবো তো শুধোই প্রসঙ্গটি কেবলই আমার নয় তো?

কেবলই না হলেও বারে বারে এসে পড়ছিলেন বৈকি। আপনার সম্পর্কে যে সকলেরই দারুণ কৌতূহল!

মহিম ততক্ষণে গায়ের জামা খুলে স্নানের ঘরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। হেসে বললেন, পৃথিবীটা এমন আজব জায়গা! যদি কোন ব্যাটাকে নিজেদের ছাচে ঢালাই হতে না দেখল, কি নিজেদের হিসেবে না মেলাতে পারলো, তো তাকে নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। যেন কি এক যমযন্ত্রণা। তা যাক, আজ তো আর তোমার ফেরার উপায় নেই, আর একটু বোসো, স্নানটা সেরে আসি।

এতো রাতে স্নান করবেন?

সর্বনাশ! এই সারাদিনের ধুলো-ঘাম। আজ একখানা অভিযান হয়েছে বলা চলে।

যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, আচ্ছা, আগে বামুন ঠাকুরকে জানিয়ে দিয়ে আসি আমার সঙ্গে একজন গেস্ট আছে।

স্বদেশরঞ্জন হৃদয়রঞ্জন হাসি হেসে বলে, সে আর আপনাকে বলতে হবে না বড়দা। ম্যানেজার মশাই নিজেই আমায় নেমন্তন্ন করে রেখেছেন। আপনার ওপর ভদ্রলোকের ভারি ভক্তি দেখলাম।

হ্যাঁ, ওই একটা লোক! সত্যিই ছেদ্দা-ভক্তি করে। যাক্, তাহলে তো ব্যবস্থা

হয়েই গেছে।

একটু পরেই স্নান সেরে ঘরে ঢুকলেন মহিম। ভিজে তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে সোনার মত রঙের চওড়া পিঠটার সবটা ঢাকা পড়েনি। স্বদেশ যেন হাঁ করেই তাকিয়ে রইল। এই বয়সে এমন সুঠাম সুপুষ্ট স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল দেহ! অথচ লোকে বলে থাকে, 'মেসের ভাত খেতে খেতে ডিসপেপসিয়া জন্মে গেল।' রহস্যটা কী?

ফর্সা পায়জামাটা স্নানের ঘরে নিয়েই গিয়েছিলেন, এখন মহিম গায়ে একটা গেঞ্জি চাপিয়ে বিছানায় বসে বললেন, এইবার বল, তোমার আসার কারণটা কী?

স্বদেশ বলে উঠল, বাঃ, অকারণে বুঝি আসা যায় না?

যায়। তবে সে লোক তো তুমি নয় বৎস। সন্ধ্যে থেকে এসে বসে আছো, রাতে ফেরবার আশাও ত্যাগ করেও বসে আছো। এটা কী তোমার ধাতের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে? 'এসেছিলাম' দেখা হলো না। হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি।' এই রকম একটা স্লিপ লিখে রেখে চলে যাওয়াটাই তো তোমায় মানায়।

স্বদেশ হেসে ফেলে বলে, কাকে যে কতটুকু দেখেন দাদা, তা তো দেখতেই পাই না, এমন স্টাডি করে ফেললেন কখন?

মহিম হেসে বললেন, স্টাডির চোখ চাই। তা ব্যাপারটা খুলেই বল।

খুলে বলে স্বদেশরঞ্জন। এসেছে গিন্নীর দূত হয়ে। নীরবালা বলেছে, রাতে থেকে সকালে দাদাকে নিয়ে তবে ফিরবে। শ্রীরামপুর থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে স্বদেশ।

মহিম বললেন, কাল আমায় নিয়ে তবে ফিরবে? অফিস নেই?

আছে। কাল একটা সি এল খরচা করা যাবে।

এতো জোর তলব কিসের?

বলতে মানা। তবে আপনি যদি হুকুম করেন তো বলে ফেলতে পারি।

বাঃ, আমি এমন অন্যায় হুকুম করতে যাবো কেন? এ তো বিশ্বাসঘাতকতা।

স্বদেশ মুখ নীচু করে একটু হেসে ঘাড় চুলকে বলে, শুনেছি শাস্ত্রে আছে স্ত্রীর কাছে মিথ্যাচার বা বিশ্বাসঘাতকতায় দোষ হয় না।

বটে না কি? তুমি যে দেখছি আজকাল মহাশাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠেছ! কোন্ শাস্ত্রে আছে?

আজ্ঞে তা জানি না। বোধহয় লোকশাস্ত্রে।

হুঁ! খুব চালাক হয়ে উঠছ! খুকুটাকে একটু সমঝে দিয়ে আসতে হবে! বেচারী ভালমানুষ।

স্বদেশরঞ্জন দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, বেচারী ভালমানুষ! হা ভগবান! আপনাদের যে খুকুটিকে দিয়েছিলেন বড়দা, সেটি আর সে খুকুটি নেই। ক্রমশই রণ-চণ্ডীর বোনঝি হয়ে উঠছেন।

মহিম হেসে উঠে বলেন, ভাল ভাল। শুনে খুশী হলাম। তা সেটা তোমারই মহিমা।

এই সময় নীচে থেকে খাবার ডাক এল।

মহিম ভৃত্যটিকে বলেছিলেন, ঘরে একটা ক্যাম্পখাট দিয়ে যেতে।

খেয়ে এসে বিছানায় বসে পড়ে স্বদেশরঞ্জন হতাশা আর অবাক গলায় বলে, স্বেচ্ছায় আপনি সারাজীবন এই খাদ্য বরণ করে নিয়ে কাটিয়ে এলেন বড়দা? ভাবা যায় না।

মহিম হা-হা করে হেসে বললেন, সে কী হে? তুমি ম্যানেজারের নিজের নিমন্ত্রিত বলে যে তোমার অনারে একটা স্পেশাল ডিশ দিয়েছিল। চার চারটে বিগ সাইজ আলুর দম। ভাগ্যিস অন্য বোর্ডারদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। না হলে একটা কাটা-কাটি কাণ্ড হয়ে যেত।

স্বদেশ হতাশভাবে বলে, ওটাও থাকে না?

পাগল হয়েছো? আলুর দম? আছো কোথায়? সপ্তাহে একদিন মাংস থাকে, আর দু'দিন ডিম থাকে। এ কী সোজা রাজকীয় ব্যবস্থা!

স্বদেশ গভীর গলায় বলে, বড়দা, শুনেছি লোকে দেশের জন্যে কারাবরণ করে, আপনি কিসের জন্যে স্বেচ্ছায় এই দুর্দশা বরণ করে আসছেন?

মহিমও গম্ভীর হন, বলেন, আচ্ছা, তুচ্ছ একটু খাওয়ার ভালমন্দের ব্যাপারটাকে তোমরা এতো বড় করে ধর কেন বল তো?

তুচ্ছ! খাওয়াটাই যদি তুচ্ছ হয় তাহলে কিসের প্রেরণায় মানুষ আরো এতো খেটে মরছে? পশু-পক্ষীর মত কাঁচা মাংস, ফল-ফুল খেয়ে কাটাতে পারতো! রান্না জিনিসটা দস্তুরমত একটা আর্ট কিনা? নাঃ, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বড়দা। আমায় যদি কেউ বলতো, 'তুই ব্যাটা এই মেসে থেকে আফস কর' আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে গিয়ে মুদির দোকান দিতাম।

আবার একটা হা-হা হাসির শব্দ উঠল।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়া হয়েছে। মহিম ক্যাম্পখাটটায় (যদিও পা বেরিয়ে পড়ছে), স্বদেশ মহিমের খাটে। স্বদেশ অবশ্য অনেক আপত্তি করেছে। বলেছে সে, একটু ছোটখাটো মাপের ক্যাম্পখাটে কোনো অসুবিধে নেই, মহিম সে কথা কানে

নেননি। বলেছেন, আরে বল কী? তুমি হলে গিয়ে বাড়ির জামাই।

মনে হচ্ছিল বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ কথা কয়ে ওঠে, বডদা যদি দোষ না নেন একটা কথা বলি!

মহিম বললেন, সেরেছে! ভাবলাম ঘুমিয়ে পডেছ।

ঘুম আসছে না। প্রশ্নটা বড জ্বালাচ্ছে। বলব?

বলে ফেলো।

বলছিলাম কি আপনি নিজে কি কখনো ভেবে দেখেছেন, 'কিসের জন্যে'?

মহিম একটু হাসির গলায় বললেন, এ যাবৎ দেখিনি, এখন দেখবার চেষ্টা করছি।

একটু পরে ঘরের এক ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস গাঢ় হয়ে আসে। কিন্তু ঘরের অপর ব্যক্তির তা হয় না। তাঁর তন্দ্রাহীন চিন্তার মধ্যে কথাটা কেবলই চলাফেরা করে বেডায়। সত্যি, কী জন্যে? অভিমানে? না আক্রোশে?

আমি একটা বুড়োধাডি বেটাছেলে, 'অভিমান' করে দুর্দশাবরণ করছি? লোক-চক্ষে হাস্যাস্পদ হচ্ছি? ধেৎ! 'অভিমান' শব্দটা অচল।...

তবে? আক্রোশ? সেই অনমনায়াকে জব্দ করবার জন্যে?

ছি ছি। মহিম হালদার লোকটা কি এতো নীচ? তা হতেই পারে না। আসল ব্যাপারটা বোধহয় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপকটিই ঠিক ধরেছিল।

ক্রমশ চিন্তার খেই হারাতে থাকে। হালকা আলগা প্রশ্ন মনের মধ্যে ভেসে ভেসে উঠতে থাকে।...আচ্ছা, মিঠু এই সংসারটির ছাঁচ পেল কোথা থেকে? যেটা না কি মহিম হালদার নামের একটা লোক যৌবনকাল থেকে এই প্রৌঢত্বের সীমা পর্যন্ত হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে লালন করে এসেছে!

....

আচ্ছা নীরু অমন মোটা হয়ে গেল কখন? কেন হলো? নীরু কি খেয়াল করতে পারেনি—ওই তুলোর বস্তার মধ্যে সে হারিয়ে যাবে!...আচ্ছা দেবযানী অতো পান খায় কেন? পান খায় খাক, দোক্তা খায় কেন? এটা কি দেবযানীরও একটা শোধ নেওয়া? যেটা আক্রোশেরই আর এক নাম!

....

আচ্ছা...আমি দেশে গিয়ে বসলে প্রতাপ কি সুখী হবে? হওয়া কি সম্ভব? ...আচ্ছা শশাঙ্ক যে সমস্ত ছুটির অবকাশটুকু ওই মাছ ধরার ব্যাপার নিয়ে কাটায়, সেটাও কি সংসার থেকে পালিয়ে থাকার প্রেরণায়? ...আচ্ছা, মোনা নামের সেই ছেলেটা কি তার মনের মত বাসস্থান পেয়েছে? ক্রমেই আচ্ছাগুলো হালকা হয়ে আসে।

আচ্ছা খুকু, হঠাৎ এমন জরুরী তলব করল কেন ?

খুকু যা বলল, সে একেবারে অভাবিত অন্য একটা কথা। দাদার কাছে একেবারে ঝুলে পড়ল খুকু, সাতজন্মে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না, একজন ভার ভারিক্কি লোক না হলে কে নিয়ে যাবে বলো। তা দাদার তো এখন অবসর হয়ে গেছে, দাদা চলুক গাজেন হয়ে।

মহিম তো অবাক।

ভেবেছিলেন খুকুও হয়তো সেই দাদার মেসে থাকা নিয়ে নাকে কান্না কাঁদতে বসবে। সে দিক দিয়ে গেল না খুকু। বলল, লোকের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় দাদা, এতোখানি বয়সে দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার দেখিনি। জন্মের মধ্যে কর্ম একবার পুরী, একবার কাশী, আর একবার দেওঘর। সেও বেড়াতে যাবার আহ্লাদ নিয়ে নয়, শাশুড়ির তীর্থের বাসনা মেটাতে। তখন তোমার ভগ্নীপতি সুবোধ বালক।

মহিম বললেন, তা এখন এতো সব ট্যুরিস্ট স্পেশাল হয়েছে তাতে গেলে তো শক্তপোক্ত গাজেনের দরকার হয় না।

বল না তোমার আদরের ভগ্নিপতিটিকে। একসময় তো ওর ওপরওলা ছিলে—

স্বদেশরঞ্জন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'ছিলে' মানে ? উনি আমার আদি ও অকৃত্রিম চিরকালের ওপরওলা। কিন্তু আমি শুধু দুঃসাহসের বশে ওঁর অকারণ কৃচ্ছ্রসাধনের উৎস সাধন করতে চাই। কাল তো রাত্রে খেয়ে এলাম ওঁর পাশে বসে। কী সোনা-হেন মুখ করে যে খেলেন। আমি সত্যিই মনে মনে সেলাম ঠুকলাম। তাও নাকি আমার 'অনারে' একটা 'স্পেশাল ডিশ' ছিল, আলুর দম। আলুকে সেদ্ধ করে নুন হলুদের জলে চুবিয়ে নিলেই যদি আলুর দম বলতে হয় তো 'আলুর দম'।

খুকু বলল, মেসের খাওয়া তো ওই রকমই। তুমি আর নতুন কী বলবে। তবে ওইতেই তো যাহোক আছেন ভাল। 'দেশের' খাওয়া খেয়ে ছোড়দার কী হাল।

খুকু। মহিম হাতটা বাড়িয়ে বললেন, হাত দে। এতো দিনে একটা বুদ্ধিমান সাপোর্টার পেলাম।

পাবেনই তো। স্বদেশরঞ্জন উদাস মুখে বলে, আপনাকে এখন কব্জা করতে হবে তো।

ছাখো, ভাল হবে না বলছি।

ভাল আর কবে হয়েছে। যাক গে তোমরা ব্যবস্থা পাকা করতে থাকো, আমি

চানটা সেরে আসি। তবে নিজের মতে আমি অচল।

স্বদেশের মত, বেড়াতে যাবো কারো হেফাজতে এটা যেন নিজেকে নাবালক-নাবালক লাগে। 'ট্যুরিস্ট স্পেশাল'-এর হেফাজতে বেড়ানো! দূর!

খুকু বলে, কাজে তো নাবালক ছাড়া কিছুই না। নাবালক লাগলেই দোষ? সাতজন্মে কোথাও নিয়ে গেছ আমায়?

গেলেও একই ফল হতো।

তার মানে?

সারা ভারত ঘুরিয়ে আনলেও গঞ্জনার হাত থেকে কী রেহাই পাওয়া যেত? তখন বলতে শুরু করতে, সাতজন্মে আমায় কোথাও কিছু কিনতে দিয়েছ? আহা, বেনারসে কত বেনারসী শাড়ি, কাশ্মীরে কত কাশ্মীরী শাল, আগ্রায় কত পাথরের বাসন, জয়পুরে—

দেখছো দাদা! কী রকম লোক দেখছ! নিজের দোষ চাপা দিতে যা ইচ্ছা বলে চলেছে। কবে আমি তোমায় গঞ্জনা দিয়েছি?

কবে মানে? রোজই। প্রতিক্ষণ। কবে কী করেছ, কবে কী দিয়েছ, কবে কী সাধ মিটিয়েছো—

উঃ! বলি আমি এইসব?

বল। 'জানতি পারো না।' বলে হাসতে হাসতে চলে যায় স্বদেশ। আর মহিম হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান। জানলার বাইরে একটা তেঁতুলগাছ, তার পাতার ঝিরঝিরিনির দিকে তাকিয়ে থাকেন আলগা একটা ভাবনা নিয়ে। আচ্ছা দেবযানী কি কখনো তাঁকে এভাবে অভিযোগ করেছে? কখনো কী এই গঞ্জনার সুরে বলেছে, কবে আমার কী করেছ? আমায় কী দিয়েছ? আমার কোন্ সাধটা মিটিয়েছ?

কই মনে তো পড়ে না। অথচ এটাই নাকি মেয়েদের একটি প্রধান ধর্ম, দাম্পত্য সম্বন্ধের কাঠামো। ভাষ্য এই, 'আমি নিজের জন্মাগার ছেড়ে তোমার আশ্রয়ে এসে পড়েছি, তুমি আমার সব কিছুর ভার নেবে। আমার অন্নবস্ত্রেরই দায়ভার নয় শুধু, আমার সখ-সাধ, মান-সম্মান, লোকের কাছে মুখ উজ্জ্বলের দায় সব তোমার! দায় আমার মন বোঝার, সুখ-দুঃখ বোঝার!' সারাজীবন একখানি প্রত্যাশার পাত্র হাতে নিয়েই তো বসে থাকে মেয়েরা। অন্তত পাঁচজনের কথা শুনে তো তাই মনে হয়। পুরুষ মহলের আলাপআলোচনার মূল প্রসঙ্গই তো 'গিন্নী'।

মহিম হালদারের জীবনে সে রস নেই।

মহিম হালদার যদি আর পাঁচজনের মত তাঁর সেই গোপীচন্দনপুরের সংসারের

ঘরসংসার করতেন, তাহলেই কি দেবযানী তেমন হতো? দেবযানী অন্য প্রকৃতির। দেবযানীর কোন চাহিদা নেই।

অন্যমনস্ক পুরুষ খেয়াল করলেন না, দেবযানীর মধ্যে একটামাত্রই চাহিদা ছিল, সেটা হচ্ছে মহিমকে কাছে পাওয়া। কিন্তু দেবযানীর বাইরের মোটা খোলসটা সেই অতি সূক্ষ্ম সুকুমার চাহিদাটুকুকে কেমন একভাবে ঢেকেই রেখেছিল।

বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা পাকা করতে উঠেপড়ে লেগেছে খুকু। অবশ্য প্রস্তাবক আছে। এ প্রস্তাবের প্রধান উদ্বোধক দিদি সুরবালা। ঘোর বিধবা তনু।...খুকু অর্থাৎ পুরবালা সেই সাহসে উদ্বেলিত এবং একটা অত্যাশ্চর্য সংবাদে আরো উত্তেজিত।

বড় বৌদিও যেতে রাজি হয়েছে, বুঝলে বড়দা।

বড়দা চমকে বলেন, তাই নাকি! বলিস কী রে! ওনার গরু-বাছুর, বাগান-পুকুর, ঘর-সংসার এসব ফেলে?

আরে বাবা কতদিনেরই বা মামলা। তোমার অফিসের ওই লোকটার তো ছুটি মাত্র তিন সপ্তাহ। আমি তো বাবা সাহস করে বলিনি। জানি তো, বললেই বলবে, 'ও মা! আমি যাব ক বল? এইসব ফেলে?' তা দিদির সঙ্গে কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠল, 'অনেক সব ভাল ভাল তীর্থদর্শন করবে তোমরা, আর কখনো এ সুযোগ হয় না-হয়, চলো আমিও তোমাদের দলে ভিড়ে পড়ি।'

অনেক সব তীর্থ দর্শন!

ওঃ!

মহিমের মনে পড়ল, সেই সুদূর অতীতে মহিমের এক সহকর্মী সস্ত্রীক পুরী যাচ্ছিলেন। মহিমকে তো ধরে বসেছিলেন, আপনিও চলুন মিসেসকে নিয়ে। খুব জমবে। তাছাড়া বাইরে কিছু সঙ্গও ভাল। আমার মা বলতেন, এ্যাকা না ভ্যাকা। সে আজ বছর ত্রিশ-বত্রিশ আগের কথা। তখন 'পুরী যাওয়া কাশী যাওয়াও' রীতিমত একটি ভ্রমণ বলে গণ্য হতো।

কিন্তু মহিম কি বন্ধুর সেই অনুরোধ রাখতে পেরেছিলেন? পারেননি। দেবযানী সে প্রস্তাব শুনে বলেছিল, দিদি এখন সবে বিধবা হয়ে এসে মনমরা হয়ে রয়েছেন, এখন আমি যাবো একা তোমার সঙ্গে বেড়াতে?

মনমরা তো কিছুই দেখি না দিদির। মহিম উষ্ণ হয়ে বলেছিলেন, সারাক্ষণ তো পান চিবোচ্ছেন আর পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

সে আলাদা কথা। বাড়িতে মন বসে না। কিন্তু আমি হঠাৎ তোমার সঙ্গে পুরী

যাবো, মা কী মনে করবেন !

কে কী মনে করবে ! দেবযানীর দীর্ঘ জীবনের ইতিহাসে এই একটি মাত্রই চিন্তা আছে।

ছাত্রাবস্থায় মহিম একবার তাঁর ধনবতী দিদিমাকে নিয়ে বেশ আরামে অনেক তীর্থ করিয়ে এনেছিলেন। সেই মহিলার দরাজ হাত আর সঙ্গের এই সদ্যতরুণ দিব্য-কান্ত এক নাতি, যেখানেই ঘুরেছেন, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই স্মৃতিটি বেশ মনোরম। কিন্তু এখন এই বাহিনী নিয়ে বেরোনোর কথা ভেবে কোন প্রেরণা পাচ্ছেন না।

দেবযানীও যাবে, এটাকেই ভাললাগার একটা উপকরণ বলে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু দেবযানী কি মহিমের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে ?

মহিম জানেন, দেবযানী সারাক্ষণ দিদি কোম্পানীর পায়ে পায়ে ঘুরবেন, কার কি অসুবিধে হচ্ছে দেখে বেড়াবেন, আর মহিম যদি কোন একসময় প্রস্তাব করেন, চলো না তোমাতে আমাতে একটু বেরিয়ে পড়ে অমুক জায়গায় গিয়ে বসে থাকিগে।

দেবযানী নবোঢ়ার লজ্জা মুখে মেখে বলবেন, কী যে বলো ! এই বুড়ো বয়সে দু'-জনে একলা বেরিয়ে পড়ে—ধ্যাৎ !

খুকু বলেছিল, তাহলে আমি দিদিকে বলে পাঠাই দাদা, তুমি যেতে রাজি হয়েছ।

এই, না না। কিছু বলে-টলে পাঠাতে হবে না। আমি তো যাচ্ছিই শনিবার—

খুকু অবাক হয়ে বলেছিল, এখন আবার শনিবারের অপেক্ষা কেন দাদা ? যে কোন দিনই তো চলে যেতে পারো।

তা পারি। তবে একটা ট্র্যাডিশান থাকা ভালো।

বাবাঃ ! এর আবার ট্র্যাডিশান। তুমি যাবে শুনলে সবাই আহ্লাদে নাচবে।

সর্বনাশ ! তাহলে তো ব্যাপার রীতিমত গুরুতর হয়ে উঠবে রে ?

আহা সত্যি নাচবে না কি ? মনটা নাচবে।

ওঃ। মন ! তা হালদার-বাড়ির বড়গিন্নীর মাথায় হঠাৎ এমন ভূত চাপল যে ?

খুকু বলল, তা মানুষের মন কি আর বদলায় না ?

কোন কোন মন ইস্পাতে তৈরী, তারা আর বদলায় না।

খুকু সকলের আদুরে, আহ্লাদী। খুকু অবলীলায় বলে ওঠে, যেমন তোমার মনটি !

অ্যাঁ, বলিস কী ! আমাকে তোদের ইস্পাততুল্য মনে হয় ?

হয় না তো কী ? বড়বৌদির কথা ভাবলে কোনোদিন ?

মহিম অবশ্য কিছু না বললেও পারতেন। বলতে পারতেন, তার দিকে তাকাবার কত লোক। সারা গোপীচন্দনপুর তো তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। তাঁর গরু-বাছুর, বাগান-পুকুর, গোয়ালা-রাখাল, কুমোরবাড়ির পাগলা-ছাগলা ছেলেটা।

এই রকমই তো বলেন। উড়িয়ে দেন কথাটা। কিন্তু আজ হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। এই বয়েসে অনেক ছোট আহ্লাদী মেয়েটার কাছে বলে ফেললেন—আমার কথাই বা কে কবে ভেবেছে খুকু ?

তোমার কথা ! বাঃ, তোমার কথা মানে ?

কোনো মানে নেই, কী বলিস ? তা নেই-ই বোধহয় !

খেতে বসে অবশ্য হাওয়া হালকা।

স্বদেশরঞ্জন নামের লোকটা যেখানে উপস্থিত সেখানে বাতাসের ভারী হবার উপায় কোথা ? সে গুণ মহিমেরও। শুধু আজকেই হঠাৎ।

মহিম বললেন, এই রেটে লোকটাকে খাওয়াস-দাওয়াস খুকু ? তবে আর মেসের ভাত খেতে হলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে মদির দোকান দেবার সংকল্প ঘোষণা করবে না কেন ?

এই কথা বল তুমি দাদা ! খুকু ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, তবু ওই পেটুক লোকটার মন ওঠে না। ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে, তবু তার মধ্যেই ষোড়শোপচার চাই !

মহিম হেসে বলে, সেটা তোর মন যোগাতে। ভোজনবিলাসী লোককে মেয়েরা খুব সুনজরে দেখে। মেয়েদের জীবনের ধ্যানজ্ঞানই তো হচ্ছে, বেচারী পুরুষদের পেটের মধ্যে যতটা সম্ভব মাল চালান করা। তা সে মা-ই হোক আর বৌ-ই হোক, বোনই হোক আর মেয়েই হোক।

খাওয়া বিশ্রাম আবার চা খাওয়া সব সেরে মহিম ছাড়া পেয়ে বিদায় নিলেন প্রায় বিকেলে। আর স্টেশনে এসে পৌঁছে ট্রেনে উঠতে চমকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন !

ও এখানে এলো কোথা থেকে ?

মহিম গাড়িতে উঠে পড়তেই স্বদেশ ফিরে চলে গেল। ইলেকট্রিক ট্রেনের ব্যাপার সড়াৎ করে ছেড়ে দিলেই হল।

মহিম মোনাকে দেখতে পেলেন, মোনা বোধহয় মহিমকে নয়।

মোনা যে বিনি ভাড়ার যাত্রী সে কথা অবশ্য বলে দিতে হয় না। মোনার ধূলি-

ধূসরিত পাণ্ডুলে চেহারা, সঙ্গের পুঁটুলি, মোনার সীটে না বসে সীটের সামনে পায়ের কাছে হাঁটু তুলে বসার ভঙ্গী, এরাই সাক্ষ্য দিচ্ছে, লোকটা বিনি টিকিটের যাত্রী।

তা এরকম যাত্রীর অভাব আছে না কি ? হরদমই তো চড়ছে এরা।

লোকের দেখে দেখে গা সওয়া। বরং ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনেই বেশি ওঠে এরা, অপেক্ষাকৃত হালকা পায় বলেই হয়তো। এর তো তবু পুঁটলীটা ছোট।

হঠাৎ একজন নীতিজ্ঞানসম্পন্ন আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলে উঠলেন, এই, তুমি যে এ গাড়িতে উঠেছ, এটা ফার্স্ট ক্লাস গাড়ি, ভাড়া বেশি তা জানো ?

মোনা অবজ্ঞা ভরে একবার তাকিয়ে পুঁটুলিটা একটু কাছে টেনে নিয়ে সংক্ষেপে বলে, মলে মা রাঁদে না তা তপ্পো আর পান্তা।

ভদ্রলোক ওই অবজ্ঞার ভঙ্গী দেখে জ্বলে উঠে বললেন, এ কথার মানে ? কথার জবাব দাও।

মোনা তেমনি ভঙ্গীতেই বলে, জবাবই তো দেলাম। টিকিট যে কিনতেছেই না, তার আবার বেশি ভাড়া কম ভাড়া।

ভদ্রলোক তেড়ে উঠে বলেন, ওঃ। টিকিট কিনছই না ? বিনিটিকিটে রেলে চড়বে তুমি ? রেলগাড়িতে চাপতে এলে টিকিট কিনতে হয়, জানো না বুঝি ?

জানবো না আবার ক্যানো ? মোনা পাল কী আজ এয়েছে পিথিমীতে।

জানো ? তা জানো যদি তো টিকিট কাটোনি কেন ?

মোনা বেজার গলায় বলে, পয়সা নাই, তাই কাটি নাই। এই সাদা বাংলাটুকু বোঝচেন না ?

গাড়িসুদ্ধ লোক হেসে ওঠে। ভদ্রলোক এতে আরো অপমানিত হন। ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, আছে কি নাই তা পুলিস এসে ওই পুঁটুলিটিতে টান মারলেই ধরা পড়বে।

অ। তা ডাকেন আপনার পুলিস বাবাদের।

কা ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ? পয়সা নেই বলে তুমি আইন মানবে না ? রেলগাড়িতে চড়বে, ভাড়া দেবে না ?

আইন। মোনা যেন কথাটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বলে, আইন তো উঠতে বসতে চলতে ফিরতে। নক্কোগণ্ডা আইন নাকের সামনে ঝুলতেছে। সবাই সব মানতেচে ?

গাড়ির লোক এই পাগলা-ছাগলা লোকটার কথায় হাসছে দেখে নীতিবাগীশ ভদ্রলোকের রাগ আর রোখ আরো বেড়ে যায়। গাড়ির লোকদের চমকে দিয়ে

জোরে চেঁচিয়ে বলেন, মানছে না ? আইন মানছে না ?

মানতেছে বুজি ?

হঠাৎ খ্যাঁকখেঁকিয়ে হেসে ওঠে মোনা। বলে, বাবু বুজি এইমাত্তর পৃথিমীতে পড়লেন ? বলি 'মানুষ খুন করায় তো আইনে নিষেদ আচে। দেহোত্তা হচ্চে না খুন ? বৌগুলোকে কেরোসিনে চুবিয়ে চুবিয়ে ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে দেচ্চে। এটা আইন ? বাবু আমারে আইন দেকাতে এয়েচেন।'

গাড়ি ভর্তি লোক, অধিকাংশই নিশ্চয় ভদ্রলোক, পয়সা দিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছে যখন শ্রীরামপুর থেকে হাওড়া। (মনে হচ্ছে বেশীরভাগই মান্থলী টিকিটের যাত্রী) অথচ চোখের সামনে একটা ভদ্রলোককে ওই হতচ্ছাড়া জোচ্চোরটার কাছে অপদস্থ হতে দেখেও কেউ রুখে উঠছে না। ক' আশ্চয়। ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলেন, তাদের ফাঁসও হচ্ছে।

হায় ভগোমান। এই আপনার গেয়ানগরিমা ? যতো দোহাত্তা খুন হতেচে. ত্যাতো দোহাত্তা ফাঁসি হতেচে ? কুল্লে হয়তো—অ্যাকশোটায় অ্যাকটা।

ওঃ। কী অপমান।

'জ্ঞান-গরিমা' বলে ঠাট্টা।

ভদ্রলোক আর নিজেকে আটকাতে পারেন না, দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলেন. ভালয় ভালয় নেমে না যাস তো ঘাড় ধরে নামিয়ে দেবো ব্যাটা পাজী বদমাশ।

মোনাও ক্রুদ্ধ গলায় বলে, শুধুমুহ মুক খারাপ করবেন না বাবু। মোনা পাল সব সইতি পারে, মুক খারাপ করা সইতি পারে না। আমি একটা হাবাতে হতোভাগা, বিনটিকিটে গাড়ি চড়িচি, তো আপনার অ্যাতো মাতা-ব্যাতা ক্যানো ? রেল কোম্পানি আপনার শালা সুষ্যুন্দি ?

বলা বাহুল্য গাড়ির মধ্যে বেশ একখানা হাসির ঢেউ খেলে গেল।

কেউ কাউকে 'একহাত' নিচ্ছে, এ দেখলেই 'পাবলিকে'র প্রাণে একটি নির্মল আনন্দ হয়। কে কাকে নিচ্ছে ওই একহাতটা, তা কেউ লক্ষ্য করে না। একজন অপরের দ্বারা অপদস্থ হচ্ছে, এ দৃশ্য বড় উপভোগ্য।

মোনাকে একজন সুটেড বুটেড ভদ্রলোক 'মুখ' করছেন এতে মোনার অপদস্থ হবার প্রশ্ন নেই। কাজেই সেটা কিছু উপভোগ্য নয়। কিন্তু এই উল্টোটা উপভোগ্য বৈ কি !

লোক্যাল ট্রেন।

শ্রীরামপুর থেকে হাওড়ার মধ্যে কোনো স্টপেজ নেই, বাদে রিষড়ে।

ভদ্রলোক রাগে কাঁপা গলায় বললেন, আচ্ছা আসুক রিষড়ে। কী করি দেখো।

মোনা এতেও ভয় পেলো না। মোনা অনায়াসে বলে উঠল, কী আর করবেন, রিষড়েয় নেবে যাবেন। টিকিট আপনারও আচে কিনা ভগোমান জানে।

এরপর আর প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে লজ্জার বাঁধ থাকল না। হাসির জলতরঙ্গ বেজে উঠল।

আর রাত্যেই— রিষড়ে আসতেই ভদ্রলোক ব্যাগটা হাতে নিয়ে সড়াৎ করে নেমে গেলেন। সড়াৎ করেই তো যেতে হবে, মাত্র পাঁচটি সেকেণ্ড তো টাইম।

একজন বলে উঠল: ভদ্রলোক দারুণ রেগে গেলেন।

মোনা বলে উঠল: হতোভাগার অপোরাদ মাজোনা করে নেবেন বাবু। এ ওনার ইচ্ছে করে গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া। অ্যাকটা পাগোল-ছাগোল মনিষ্যি বিনটিকিটে রেলগাড়ি চড়েছে বলে অ্যাতো বুন্দুমার! নাচ বোব দে হাতা গলে যাচ্ছে, সদোরে ছুঁচ গলে না। য়্যাতো সব হাঙ্গোর কুমার রাঘোব বোয়াল গা মেলিয়ে চরে বেড়াচ্ছে, য়্যাতো টানাটানি চুনোপুঁটি গুলো চিংড়িদের নিয়ে।

মহিম একটু গলা বাড়িয়ে বলে উঠলেন, আরে ব্যাস! এতো তত্ত্বকথা শিখলে কবে হে?

মোনা চমকে তাকাল।

তারপর গাড়ির মেজেই জুতোর ধুলোর বৃন্দাবনের ওপর আভূমি প্রণাম করে বলে উঠল, বড়োবাবু এখেনে? ইস! অ্যাতোক্ষণ তো দেকি নাই।

মহিম হাসলেন, দেখবে আর কী? যা লড়াই চালাচ্ছিলে!

গাড়ির লোকেরা চকিত হন। ওই বাজাই চেহারার আর রাজাই সাজের ভদ্রলোকটি ওই হতভাগা লোকটাকে ডেকে কথা কইছেন।

মোনা এখন লজ্জিত কুণ্ঠিত। মাথা চুলকে বলে, আজ্ঞে মোনা হতোভাগা তো চিরকেলে রগচটা। ওই লেগেই ভেয়েদের সঙ্গে বনে না। তো বড়বাবু, বড়মা ভাল আচেন?

মহিম হেসে বলেন, তোমার অনেকদিন খ্যাখা নেই, কী করে আর ভাল থাকবেন?

মোনা দু'হাত কপালে তুলে বলে, সাক্ষাৎ ভগোবতী! ম্যাজেম্যাজেই যে গোপী-চন্দনপুরের লেগে মন হুহু করে ওটে, সে ওনারই জন্যে। কিন্তুক—

গাড়ি হাওড়ায় এসে পৌঁছে গেছে, প্লাটফর্মে ঢুকে এসেছে।

মোনা মহিমের পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। বলে, ছেরামপুরে কে আচে বড়বাবু?

আরে আমার ছোট বোন খুকু। সে থাকে তো।

অ্যা, তাই বুজি বড় পিসিমারে দেকিচি, ছোটরে বেশি দেকি নাই।

মহিম বলেন, তা তোমার এখানে কী?

আমার আর কী।

মোনা লজ্জিত গলায় বলে, সেই অ্যাকই বিত্তান্ত। মনের মতোন অ্যাকটা বসোবাসের ঠাই, আর অ্যাকখান নিজোস্বো রমোণীর বান্ধায় ঘুরপাক খেয়ে মরতেচি।

মহিম চাকত হন।

নিজোস্বো রমোণী। সেটা আবার কী? এটা তো দেখা যাচ্ছে নতুন সংযোজন।

অফুরন্ত প্লাটফর্মটা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে, মোনা আগে পিছে হয়ে গেলেও আবার কাছে এগিয়ে আসছে।

মহিম বলে ফেললেন, 'নিজস্ব' কী?

মোনা পুঁটলিকে হাত বদল করে ঘাড় চুলকে বলে, আজ্ঞে বলতোচ, জেবন জিনিসটা তো অ্যাকটা মুল্যোবান বস্তু। তাকে তো আর বরবাদ দিতি পারিনে। অ্যাকটা ঘরনসার তো দরকার। তো শুদু বসোবাসের মতো ভূমি হলিই তো চলবেনি, অ্যাকখানা নিজোস্বো রমোণীও তো দরকার। সেটাই খোঁজা।

মহিম মনে মনে হাসলেন।

ব্যাটার এখন তাহলে বিয়ের বাসনা হয়েছে।

হাসি গোপন করে বলেন, তা তো সত্যি। তা চলে যাও তোমার বউমার কাছে। দেখেশুনে একটি বয়ে দিয়ে দেবেন।

দেখেশুনে?

মোনা যেন বেশ আহত হয়। ক্ষুব্ধ গলায় বলে ওঠে, দেকেশুনে অ্যাকটা বে' দিয়ে দিলিই হয়ে গ্যালো? মোনার সঙ্গে তার ভাল মিলবে কিনা দেকতে হবে না? যাক গে, এ সব পাগল-ছাগল মুখ্যু মনিষ্যির কতা। বউমাকে আমার পেন্নামটা জানিয়ে দেবেন।

বড় রাস্তায় পড়ে হন হন করে এগিয়ে ভিড়ে মিশে যায়।

মেসে এসে ঢোকেন মহিম সন্ধ্যের পর।

নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে রান্নাঘরে বলে যান, আজ যেন তার রাত্রের খাবার না করা হয়।

খুকুর বাড়ি যা খেতে বাধ্য হতে হয়েছে, তাতে তিন বেলা না খেলেই ভাল হয়।

এহেন 'আদরযত্নের' মধ্যে থাকতে হলে মহিম হালদারের সাধের স্বাস্থ্যের বারোটা বেজে যেত।

শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে শুয়ে পড়লেন। মনের মধ্যে একটা কৌতুক-বোধের সঙ্গে ঈষৎ গভীর চিন্তাও।

'নিজোস্বো রমণী'।

ভাষা একখানা আবিষ্কার করেছে বটে কুমোরের পো।

কিন্তু ভাবটা চিন্তনীয় সন্দেহ নেই।

এই বৃহৎ জগতে পাগল-ছাগলটা তার মনের মত একটা বাসভূমি আবিষ্কার করতে ভিটেবাড়ি ছেড়ে ছিটকে ছিটকে চলে গেছে। এখন আবার নতুন বায়না।

কিন্তু পাগলা হলেও কোথাও কি একটা গভীর চিন্তার স্পর্শ নেই? ও নিজে জানে না সেটা গভীর, তাই অবলীলায় ক্ষুব্ধ প্রশ্ন করে, দেখেশুনে একটা বে' দিয়ে দিলেই হলো?

ঘুম এলো না।

উঠে পড়লেন।

অনেকদিন পরে বেহালাটা পেড়ে নামালেন।

দীপালী বলল, তা'হলে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌছলে তুমি? চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি তোমার ত্রিবেণীতে গিয়ে থাকি?

বেচারী সুভাষ বোস অসহায় গলায় বলে, তা তুমি যে বলছ, তোমার দাদার বাড়িতে থাকা অসহ্য হয়ে উঠছে।

শুধু অসহ্য নয়, অসম্ভব। যা করছে দু'জনায় তা বলে বোঝানো যাবে না।

অথচ ওই বাড়িতে তোমার ভাগ রয়েছে।

দীপালী ক্লান্ত গলায় বলে, ইঁটকাঠের ভাগ থেকে আর কী হবে? সংসারে জায়গা না থাকলে? ওখানে কি আমি ওদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে নিজে রেঁধে খেয়ে থাকবো?

সুভাষ যেন অন্ধকারে একটু আশার আলো দেখতে পায়। তাড়াতাড়ি বলে, তা সেও তো হতে পারে।

হতে পারে। কেমন? এমন বুদ্ধি না হলে আর বি.এ. পাস করে ড্রাইভারী করে! এখন তো তবু ওদের বাড়ির চাকরানীর পোস্টটায় আছি, সে পোস্টটা গেলে, আরো কী করবে, ভাবার বাইরে।

আচ্ছা দীপা! মানুষ এমন হিংস্র হয় কেন বল তো? তুমি ওদের এমন কি ক্ষতি করছ?

আমার উপস্থিতিই ওদের বিবক্তিকর। তাছাড়া পাড়ার লোকদের আমার ওপরই সহানুভূতি। সে ওদের বরদাস্ত হয় না।

কিন্তু তুমি না থাকলে তো ওনাকে খাটতে হবে?

তাতে কিছু এ. . যায় না। বৌদিটির আমার ক্ষমতা কম নাকি? তাছাড়া আমি বিদেয় হলে ওই ঘরটা ভাড়া দিয়ে আয় করবে, কাজের জন্যে লোক রাখবে। মোট কথা একটা চোখকানওয়ালা লোক সর্বদা চোখের সামনে রাখতে নারাজ। সভ্যতার তো বালাই নেই দু'জনের একজনেরও।

সুভাষ হতাশভাবে বলে, একখানা ঘরের চেষ্টায় মাথা খুঁড়ে মরছি। পাচ্ছি কই? তাই ভাবছিলাম আপাতত কিছুদিন যদি ত্রিবেণীতে—

কিছুদিন পরে ফিরে এসে নতুন চাকবি পাবে?

দীপালীর স্বরও আশাভঙ্গে তীব্র তীক্ষ্ণ, বৌকে বসিয়ে খাওয়াবার ক্ষমতা হবে ট্যাক্সি ড্রাইভারের?

ওরা একটা পার্কের বেঞ্চে এসে বসেছে।

দু'কাপ চা খেতে একটা রেস্তর াঁয় ঢুকেছিল, কিন্তু শুধু দু'কাপ চায়ের টাইমে এতো কথা বলা হয় না।

কটু কথাটা বলে ফেলেই দীপালীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

সুভাষ আস্তে বলে, অক্ষম পুরুষের বিয়ে করার কোনো অধিকার নেই।

আবার! ফের ওই কথা!

দীপালী ওর হাত চেপে ধবে।

অতঃপর পরামর্শ চলতে থাকে।

দীপালীর মতে, দেশের বাড়িতে একবার মা-বাপের কাছে বৌ নিয়ে গিয়ে ফেললে, (যে বৌকে প্রথমে স্বীকৃতি দিতে না চাইলেও এখন কোনোমতে রাজী হয়েছেন তাঁরা।) আর কি সহজে ফিরিয়ে আনা যাবে। ছেলের বৌয়ের সেবাযত্ন কর্মক্ষমতা এ সবের স্বাদ পেয়ে যাবেন তো? ট্যাক্সি ড্রাইভারেরই বা ছুটি কোথায়, সপ্তাহে একটা রবিবার ছাড়া। তাদের তো আর পুজোর ছুটি, বড়দিনের ছুটি নেই? তার মানে চিরবিরহের বন্দোবস্ত। একটি নিভৃত কুলায়, একটি সুখের নীড়, স্বর্গের ফুল হয়েই থাকবে।

অথচ দু'জনের মধ্যেই ছিল কত স্বপ্ন, কত সাধ, কত বাসনা।

আপাততঃ।

এ কথার আর কোনো মানে নেই এ যুগে। সুভাষ বোস নামের গ্র্যাজুয়েট ছেলেটাও তো ভেবেছিল আপাতত এই করতে হবে। কতদিন বেকার থাকা যায়?

অতঃপর?

বেশীক্ষণ বসে থাকাও যায় না। দু'জনেরই মাপা সময়।

বেরিয়ে আসে দু'জনে পার্ক থেকে।

রাস্তার দু'ধারে সারি দিয়ে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বহুতল প্রাসাদের অসংখ্য ফ্ল্যাট বক্ষে ধরে। দীপালী সেইদিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আমাদের জন্যে এ পৃথিবীর কিছুই নেই।

নিঃশ্বাস পড়ে সুভাষেরও বুক থেকে।

সত্যি। কত ঘর, কত বাড়ি, কত প্রাসাদ, কত কত দুটি মানুষের ভালবাসার জীবনের আশ্রয়।

ছাড়াছাড়ির আগে ভারাক্রান্ত মনটাকে একটু হালকা করতে দীপালী বলে, আচ্ছা, ধর আমরা কোথাও একটু আশ্রয় পেলাম। তোমার প্রথম কাজ কী হবে?

সুভাষ বিচলিত গলায় বলে, প্রথম? প্রথম কাজ হবে এতদিনের জমানো সব আদর—

চুপ করে গেল।

বঞ্চিত পুরুষের ক্ষুধার্ত হৃদয়জ্বালা ভাষা খুঁজে পেল না।

দীপালী বলে ওঠে, এ ম।। এমন একটা জোলো জোলো ইচ্ছে তোমার? আমি তো ভেবে রেখেছি তেমন দিন পেলে, প্রথমেই কোমর বেঁধে যত ইচ্ছে ঝগড়া করব।

ঝগড়া।

না তো কী? ঝগড়াটাই তো জীবনের আসল রস।

ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

দীপালী বাসে উঠে গেল, সুভাষ তার পার্কের পাশে পার্ক করে রাখা ট্যাক্সিটায়, যেটার মিটার বক্সটাকে আচ্ছা করে লাল কাপড়ে মুড়ে রাখা ছিল।

পড়ন্ত বিকেল।

উঠোনের একধারে বাঁধানো চাতালে বসে, ডাঁই করে রাখা নারকেল পাতা থেকে কাঠি চাঁচছিল খুদুর মা। হাতের অস্ত্রটি হচ্ছে রান্নাঘর থেকে বাতিল হয়ে যাওয়া একটা ভোঁতা বঁটি। তবু খুদুর মার হাত চলছিল দ্রুত। দেবযানীর সংসারে শিথিল-গতি হবার জো নেই কারুর। তাড়া দিয়ে দিয়েই কাজের লোকেদের চটপটে না করে ছাড়ে না দেবযানী।

গোবরলেপা কাঁচা উঠোনের একধারে খুব খানিকটা সিমেণ্ট বাঁধানো চাতালের পরিকল্পনা দেবযানীরই। ভাঁড়ারের জিনিসপত্র রোদে দেবার পক্ষে আদর্শ। রোদে ভাজা ভাজা মেজেয় ভাল মশলা বড়িটড়ি ঢেলে দিলেই হলো। আবার রোদ পড়ার পর ওখানে বসে তেঁতুল কাটো, নারকেলের কাঠি চাঁচো, জাঁতা-ঘুরিয়ে ভাজা মুগ কড়াই ভাঙো, আবার পড়ন্ত বেলায় ঘরের মধ্যেটা অন্ধকার হয়ে এলে, কাঁথাটাঁথা সেলাই করতে চলে এসো এখানে সূর্যদেবের শেষ দাক্ষিণ্যটুকুকে পর্যন্ত কাজে লাগাতে।

আবার গরমকালের সন্ধ্যায় বাতাসের দাক্ষিণ্যের আশায় মোড়াটা জলচৌকিটা টেনে এনে বসে শরীর জুড়োও, গল্পসল্প করো। প্রতাপের তো এটি বাঁধা অভ্যাস। রোদের গরম কাটাতে যখন-তখনই কুয়ো থেকে দু'ঘড়া জল তুলে ঢেলে দেওয়ার দরুন মেজেটা সর্বদা তকতকে।

খুদুর মা নিজের কাজ করে চলেছিল, আবার দেবযানীও অদূরে দাওয়ায় বসে নিজের কাজ করতে করতে খুদুর মার কর্ম পরিদর্শন করছে। মাঝে মাঝেই নির্দেশ দিচ্ছে—অ খুদুর মা, সঙ্গে সঙ্গেই বড় কাঠি ছোট কাঠি ভাগ করে ফেলো না। পরে বাঁধার সময় সুবিধে হবে।

এই সময় 'দোয়াল' তারাদাস এসে দাড়াল।

বিকেলেও একপালা দুধ দোহা হয়, কারণ নতুন বাছুর হবার পর শুভদা'র দুধের প্রাচুর্য খুব।

দোয়াল এলে খুদুর মাকে উঠতেই হবে। বাছুর বাঁধা, গরুর মুখে ঘাসপাতা ধরা, এসবের জন্যে খুদুর মাকে প্রয়োজন।

খুতুর মা বেজার গলায় বললো, আর গোটাকতক পাতা বাকি ছেলো। ঘুরে আসতে সন্‌জে লেগে যাবে। শাঁকে ফুঁ পড়লে তো আর ঝাঁটা চাঁচা চলবে না!

দেবযানীর হাতের কাজ হয়ে গিয়েছিল, পাশে মাদুরের ওপর হাতের জিনিসগুলো পাট করে রেখে হেসে বলল—আচ্ছা তুই যা, আমি এ কটা শেষ করে রাখছি।

অ মা! শোনো কতা! তুমি বসবে কাটি চাঁচতে?

বসব আবার কী? তুলব বল। যা যা। তারাদাস দাঁড়িয়ে আছে।

খুতুর মা চলে যেতেই দেবযানী বঁটিটাকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে নারকেল পাতাগুলি বাগিয়ে ধরে পরপর করে চলে কাজটা। দেখা যায় এই তুচ্ছ কাজেও দাসীটাসীর থেকে দেবযানীর নিপুণতাই বেশী।

অথচ দেবযানীর মনটা উড়ে উড়ে চলেছে এই পড়ন্ত বিকেলের উড়ো হাওয়ায় ভর করে।

দেবযানী কেন এই সংসারটাকে এতো ভালবাসে? না কি, সংসারটাকে বলে নয়, দেবযানী শুধু 'কাজ করতেই ভালবাসে', যে কোন কাজ। আর যে কাজটাই তার হাতে পড়ে, নিপুণ নিখুঁত না হয়ে তার রেহাই নেই!

কিন্তু যে কোনো কাজ মানেই তো সংসারের মোটা কাজ! আসলে নিপুণতা তার সহজাত আর কাজকে নিখুঁততর চেহারায় দাঁড় করানো তার বাতিক। সুরবালা এক এক সময় রাগ করে বলেন, ওনার কাজ কে কমাবে বাবা? ওনাকে কে বিশ্রাম দেবে? অপরের কাজ পছন্দ হলে তো? ঘণ্ট রাঁধতে লাউ মোচা এঁচোড় এসব আর 'জিরেজিরে' না হলে চলে না? জল বেশী ঢেলে বসিয়ে দিলে আগুনের দাঁতে কতক্ষণ?

আর মহিমের চোখে যখন এই কাজের মহিমাটি পড়ে যায়, বলেন, তোমার ওই সরু সরু চাঁপারকলির মত আঙুলগুলো নিয়ে তুমি যদি এস্রাজ বাজাতে দেবযানী অথবা ছবি আঁকতে···, এমব্রুডারি করতে, লেস বুনতে তো মেডেল পেতে। সূক্ষ্ম শিল্পের হাত।

দেবযানী হেসে উত্তর দেয়, এসবও একরকম সূক্ষ্ম শিল্প।

ওই বলেই মনকে বোঝাও। আমি তো চিরকাল দেখে আসছি, তলওয়ার দিয়ে ঘাস চাঁছা হচ্ছে, বাঁশী দিয়ে হচ্ছে ছাগল ঠ্যাঙানো।

নারকেল কাঠি চাঁচতে চাঁচতে, নিজের দ্রুত আন্দোলিত সরু সরু আঙুল ক'টার দিকে তাকিয়ে কি দেবযানীর মহিমের সেই কথাটাই মনে পড়ছিল!

হঠাৎ দালানের দিক থেকে তন্বর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শোনা গেল, ও বড়মামী, তুমি

কোথায় গো? ছোটমাসী ছোটমেসো এসেছে। মস্ত সুখবর, বড়মামাও যাবে আমাদের সঙ্গে।

দেবযানী হঠাৎ শাড়ির আঁচলের কোণটা দিয়ে ডান হাতের তর্জনীটা চেপে ধরল।

অথচ বঁটিটা তো বাতিল-হওয়া ভোঁতা।

ওরা ততক্ষণে দেবযানীর খোঁজে চলে এসে—পিছনের এই উঠোন-পাটানের দিকের রোয়াকে চলে এসেছে হৈ-হৈ করতে করতে।

তনু চেঁচিয়ে উঠল, কী সর্বোনাশ! বড়মামী! হাতটা কেটে রক্তগঙ্গা করলে?

খুকু দু'কোমরে হাত দিয়ে বলে উঠল, তনু, তোদের সংসারে এই লক্ষ্মীছাড়া কাজের জন্যেও একটা লোক জোটে না? তো বড় বৌদি, শুনেছি কঁচো গোবরে রক্ত বন্ধ হয়, গোয়ালে চলে গিয়ে দেখ না। যদি থাকে খানকতক ঘুঁটে ঠুকে এসো না। ছি ছি! সাধে কি আর দাদা—

পিছন থেকে বরের হাতের চিমটি খেয়ে সামলে নিয়ে কথা বদলায় খুকু। বলে, হোপলেস!

কিন্তু সামলানো কথা কি ধরা যায় না?

এ বাড়িতে আরও একজন মহিলা আছেন, যাঁর নাম আপাততঃ বলতে পারা যায় 'ছোটবৌদি'। যে নাকি নিজেকে খুকুর সমবয়সী বলে দাবি করে থাকে। কিন্তু তার এক মহৎ দোষ সাধ্যপক্ষে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে ভালবাসে না। অবশ্য কারণ একটাই আছে, দালানে বারান্দায় রোয়াকে উঠোনে কোথায় আর বিছানো খাট চৌকি আছে? কাছাকাছি ওরা না থাকলে ভারী অসহায় বোধ করে ললিতা।

নীচের তলায় হঠাৎ কেউ এসে পড়ার মত হৈ-চৈ শুনতে পেয়ে ওপরের বারান্দা থেকে উঁকি মেরে একবার দেখতে গিয়েছিল ললিতা, কিন্তু দেখতে কাউকে পায়নি। শুধু তনুর উল্লসিত কণ্ঠই শুনতে পেয়েছিল, এলোটা কে? তারপরই—খুকুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ছি ছি!

এসেই এই 'ছি ছি'টা কাকে?

ললিতা বিছানায় বসে পড়ে ভাবতে লাগল, নিশ্চয় ললিতাকেই। আর কাকে? নিজের দিদিকে তো আর 'ছি ছি' করবে না খুকু? আদরিণী বোনঝিটিকেও না। আর মহামহিমময়ী বড়গিন্নী সম্পর্কে তো ওই 'ছি ছি' শব্দটা উঠতেই পারে না।

অতএব ললিতাই লক্ষ্যস্থল।

নিশ্চয় যেই এসে দেখেছে বড়গিন্নী কাজে ব্যস্ত আর ললিতা দোতলায়, সেই 'ছি ছি'-তে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। অথচ ললিতা ওর সমবয়সী। যদিও অন্য কেউ সেটা মানে না। খুকুর সাত সকালে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আর তুমি ধাড়ী বৌ হয়ে এসে ঢুকেছিলে। বিয়ের আগে-পিছেতে তো আর বয়সের হিসেব করলে চলে না।

তবে ললিতা এমন কথা শুনতে পেলে বলে, 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা!'

আশ্চর্য! যেই আসুক, এসেই বড়গিন্নীর খোঁজ। আত্মবন্ধু, পাড়াপড়শী, বুড়িছুঁড়ি সকলের মুখে এক রা, বড় বৌমা, বড় বৌমা। 'বড়মামী বড়মামী', 'বড়বৌদিদি বড়-বৌদিদি।'

ললিতা যেন এ সংসারের কেউ নয়। ললিতা যেন বানের জলে ভেসে এসেছে, তাকে বরণ করে ঘরে তোলা হয়নি। ললিতার কপাল। নিজের স্বামীই যাকে গ্রাহ্য করে না, তাকে আর অপরে করতে আসবে!

একটুক্ষণ কানখাড়া করে রইল ললিতা। অনেক যেন কথা হচ্ছে নীচের তলায়, প্রতাপের গলাও শোনা যাচ্ছে। কই, কারুর তো ওপরে উঠে আসার লক্ষণ নেই। কিসের এতো গুলতানি হচ্ছে?

একটু অপেক্ষা করে আবার সেই ছেঁড়া ভাবনাটাই ভাবতে থাকে ললিতা, তা এদের বংশের ধারাই বোধহয় এই। বাবুদের ধরনই হচ্ছে পরিবারকে অগ্রাহ্য করা। কিন্তু তার জন্যে বড়গিন্নীর ওপর বিশ্বসুদ্ধ লোকের সহানুভূতি। অথচ ললিতার কথা কেউ মনেও আনে না। ললিতার বর তার কাছে থাকে এই পর্যন্ত। কিন্তু কাছে থাকলেই সব হলো? বর তাকে একটা মনিষ্যি বলে গণ্য করে? কখনো দুটো হাসি গল্প করে? বরং সোহাগের বৌদির সঙ্গে দেশ গ্রাম বাজার-দর পাড়ার লোকের কূট-কচালেপনা নিয়ে হাসি-মস্করা গল্পর ঢালাও কারবার। সে মজলিসে দিদিটাও এসে জোটেন, দিদির ভাগ্নীটিও এসে জোটেন। আর আমার পেটের শত্রুরা তোকথাই নেই, যেখানে জ্যেঠি সেখানেই সেঁটে বসবে। কই, নিজেদের মাকে ঘিরে বসতে আসে কখনো? হুঁঃ! আসবে কেন? বাপকে কোনোদিন তেমন আহ্লাদ ভরে মাকে নিয়ে মজলিশ করতে দেখেছে?

আমার পরম গুরু আবার বলেন কিনা, 'হাঁড়িচাচারা চিরকাল 'একলাই' হয়।' (নিঃসঙ্গ শব্দটা ললিতা বুঝবে কি না বলেই হয়তো প্রতাপ 'একলাই' বলে।) আরো বলে, 'কেন, তুমি গিয়ে সে মজলিশে বসলেই পারো?' ললিতার দায় পড়েছে, আসরের

একপাশে গিয়ে বসতে। কেউ তাকে ডেকে কথা বলবে ? নাকি একটা মতামত নেবে ? ফালতু-মার্কা হয়ে বসে থাকতে ঘেন্না করে ললিতার।

পাড়ার গিন্নীরা ?

'বড়বৌমা বড়বৌমা' করে তো একেবারে গড়িয়ে পড়েন। বেড়াতে এসে সব সময়টুকু তাঁর কাছে ব্যয় করে যাত্রাকালে লোক দেখিয়ে একবার হাঁক পাড়বেন 'কই, ছোটবৌমাকে দেখছিনে ? ও, ওপরতলায় বুঝি ? থাক থাক, ডাকতে হবে না।—' বলে বিদায় নেবেন।

দু'একজনই যা ললিতার প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁরা, 'কই ছোটবৌমাকে দেখছি-নে। শরীর ভাল নেই বুঝি ?' বলে টুক করে উপরে উঠে আসেন, দুটো ন্যায্য কথাই বলেন। বাড়ির দুজনের মধ্যে একজনকে 'সর্বেসর্বা' করে অন্যজনকে ফালতু করে রাখার বিরুদ্ধে মন্তব্যও করেন, কিন্তু জোর গলায় বলার সাহস আছে ? বেশী কথা কি, বড় ননদটিও তো ললিতারই দিকে, কিন্তু সামনে প্রকাশ করবার সংসাহস আছে ? শুধু ছোট ভাজের কাছে এসে গুজগুজ ফুসফুস। কিসের যে এতো ভয়, কাকে যে এতো ভয় তা জানে না ললিতা।

ভাগ্নিটি হচ্ছেন মাঝের মাছখানি। তিনি শ্যামও রাখেন কুলও রাখেন। ওকে দেখলে গা জ্বলে যায় ললিতার।

আর ওই ছোট ননদটি ?

তিনিও দেখছি বড় গাছেই নৌকো বাঁধার রীতি ধরেছেন। আগে এলে কত গল্পগাছা করতো, এখন ওই সৌজন্য দেখাতে বুড়ি ছোঁয়া। বরটিও তাই।

রাগে দুঃখে গা জ্বলতে থাকে ললিতার।

আসলে গ্রাম দেশের রীতিই হচ্ছে ওপর-তলাটি শুধু শোওয়ার জন্যে। খাট-বিছানা পাতা সাজানো-গোছানো ঘরগুলো শেকল তোলা মূর্তিতে পড়েই থাকে সারা দিন। হয়তো দুপুর গড়িয়ে বিকেলের সময় একবার তাদের শেকল খোলা হলো, দু'-দণ্ড গড়ানো হলে আবার শেকল তুলে নেমে আসা হলো। তাও গড়ানোটি, খাট বিছানায় মোটেই নয়, মাটিতে মাদুর পেতে। অথবা গরমের দিনে শুধুই মাটিতে।

অতিথি অভ্যাগত, 'পাড়াবেড়ানিরা' যেই আসুক, আড্ডাটি ওই নীচের তলাটি-তেই। অথচ ললিতার অহরহই এই খাট-বিছানাটির আকর্ষণ। ললিতাকে তাই বারোমেসে রুগীর ভূমিকাতেই থাকতে হয়। নীচের তলায় ওই সারাক্ষণ কাজের চাকা ঘুরে চলার শব্দ আর দৃশ্য দেখলেই ললিতার মাথা ঘুরে যায়। অনুভব করে 'সুস্থ' হয়ে গেলেই, ওই চাকা ঘোরানোয় হাত না লাগাতে গেলে নিন্দে অপযশ।

ললিতার বড় মেয়ে ডলু এলো হাঁপাতে হাঁপাতে, মা জানো, কী দারুণ পরামর্শ চলছে। ছোটপিসি তো সেই জন্যেই এসেছে। ছোটপিসি, ছোটপিসে, বড়পিসি, তনুদি, জ্যেঠিমা, জ্যেঠু সব্বাই মিলে তীর্থে বেড়াতে যাবে।

জ্যেঠিমা! জ্যেঠু!

ললিতার বুকের ওপর যেন একটা হাতুড়ির ঘা পড়লো। কানাঘুষোয় শুনছিল বটে। খুকু, খুকুর বর বেড়াতে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে তনু আর সুরবালাও যেতে পারে। খবরটা তেমন গায়ে মাখেনি। ভেবেছে রাধাও নেচেছে আর সাতমন তেলও পুড়েছে!

কিন্তু এ কী সংবাদ!

দেবযানী নামের ওই মহিলাটি তা হলে তলে তলে মতলব আঁটছিলেন! কর্তাটি রিটায়ার করলেই, এই সংসারের দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দু'টিতে বেড়িয়ে বেড়াবেন! হবে না কেন, কর্তাটি তো আর তাঁর ছোটভাইয়ের মত কাঠখোট্টা নয়। সম্পর্কে ভাসুর তাই বললে দোষ, নচেৎ বলতেই হতো এখনো নতুন বিয়ের বরের মত প্রেমে টসটসে। আর ললিতার ভাগ্যে?

দুঃখে ক্ষোভে অপমানে চোখে জল আসে ললিতার। ডলি যে গড়গড়িয়ে কত কী বলে চলে কানেও ঢোকে না। একটা কথা শুধু কানে ঢোকে, রক্তগঙ্গা। কার কী হল। কিন্তু জিজ্ঞেস করার আগেই তো মেয়ে 'যাই বাবা' বলে হাওয়া।

ললিতার কি একবার নেমে গিয়ে দেখা উচিত? কিন্তু থেকে থেকে যে হাসির হুল্লোড় উঠছে, তার সঙ্গে রক্তগঙ্গাকে তো খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না। ও কী বলতে কী বলে গেল।

ললিতা তাক থেকে 'আশ্চর্য মলমের' শিশিটা পেড়ে নিয়ে কপালে একটু ঘষে শুয়ে পড়ল। যে ঘরে ঢুকবে, গন্ধেই বুঝতে পারবে ললিতার মাথা ধরেছে।

আজ দেবযানীর বিছানায় ভিড় নেই। আসলে দেবযানী নিজের বিছানাতেই নেই। ননদ-ননদাইকে নিজের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে দেবযানী বাক্স-প্যাটরা বাসনপত্র রাখবার একটা ছোট ঘরে নিজের বিছানা পেতে নিয়েছে মাটিতে মাদুর বালিশ দিয়ে। অতএব ললিতার মেয়েরা আজ মায়ের ঘরে, ছেলে তিনটে বাপের বিছানায় ঠাঁই পেয়েছে।

দেবযানী একা!

খুব অদ্ভুত লাগছে দেবযানীর। খুব ফাঁকা ফাঁকা।

আর সেই ফাঁকটুকু কখন কোন অবচেতনের অসতর্কতায় ভরে উঠছে একটা অনাস্বাদিত সুখস্বাদে।

মহিম নামের সেই উজ্জ্বল সুন্দর সদাহাস্য মানুষটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেবযানী দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা। ফেরার পথে কাশী, কী রোমাঞ্চ! কী অনাস্বাদিত একটা অনুভূতি!

নেহাত ছেলেবেলায় মা বাবা ঠাকুমার সঙ্গে একবার এই সব জায়গাগুলোয় গিয়েছিল দেবযানী, এক একটা জায়গা আবছা আবছা মনে আছে। খুব বেশী যা মনে আছে, সে হচ্ছে কাশীর হনুমান। ওরে বাবা! পালে পালে সেই হনুমান দেখে ফ্রক-পরা সেই একটা টিংটিঙে মেয়ে বাপকে দু'হাতে ধরে চোখ বুজে চিৎকার। 'হনুমানরা আমাদের মেরে ফেলবে, হনুমানরা আমাদের মেরে ফেলবে।'

একটু হাসি পেল দেবযানীর। তেমন দৃশ্য দেখলে এখনো যে কী করে বসবে, বলা যায় না।

সেই জায়গাটা কোথায়? কাশীতে না বৃন্দাবনে? নাকি আরও কোথাও? তীর্থ--ভূমির সর্বত্রই তো ওই শ্রীরামচন্দ্রের চরেরা।

আমাদের এই সনাতন দেশে ধর্মের নামে আর ভাবপ্রবণতার নামে চলার পথে পদে পদে যেমন বাধার পাহাড় জমে জমে হিমালয় হয়ে উঠেছে এমনটি বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই।

কথাটা ভেবেও দেবযানী মনে মনে একটু হেসে ভাবলো, যাক এখন তো শ্রীরামচন্দ্রের ছায়ায় ছায়ায়, তাঁর ভক্তদের আর ভয় কী?

প্রতাপ এসে বিরক্ত গলায় বলল, খুকু স্বদেশ এরা সব এসেছে কোন্ কালে, তুমি একবারও নীচে গেলে না?

যদিও 'আশ্চর্য মলমের' পরিচিত গন্ধটি পেয়েই বুঝেছিল, আগে থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে। তবু না বলে পারল না।

ললিতা কপালটা টিপে ধরে বলল, মাথার যন্ত্রণায় মরছি, তাই কর্তব্য করতে যেতে পারিনি।

কর্তব্য! প্রতাপ ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠল, কর্তব্যপালনের রাজা একেবারে। তা এখন কী হলো হঠাৎ, যে 'হাতধরা' 'মাথাধরা'টি আঁচল থেকে বার করতে হলো?

'হাতধরা মাথাধরা!'

অন্যদিন হলে হয়তো ললিতা কেঁদে কেঁদে বলতো, আমার কেন মরণ হয় না গো।

কিন্তু আজ হঠাৎ ঠিকরে উঠে বসে বলল, তা আমার ও মজলিশে যাবার দরকার--টাই বা কী শুনি ? যাঁরা সুখের পানসি ভাসিয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন তাঁরা মজলিস করুন না। আমি দাসী বাঁদী একপাশে পড়ে আছি, আমার কী দরকার !

প্রতাপ তিক্ত গলায় বলে, দরকারটা যে কী তা যদি বুঝতে তো দিনে-রাতে মিথ্যে রুগী সেজে ছাপর খাটে গা মেলে শুয়ে থাকতে না। বুদ্ধির বালাই নেই, অথচ কুবুদ্ধিটি আছে। যাক, তা হলে নামছ না ? স্বদেশ কিন্তু তাহলে ঠেলে এখানে উঠে আসবে।

আসুক। এসে যেন সবাই আমার মরা মুখ দেখে।

বলে দেয়ালমুখো হয়ে শুলো ললিতা।

আগে প্রতাপকে যমের মত ভয় করতো ললিতা। আজকাল হঠাৎ এমন নির্ভীক হয়ে উঠল কী করে ভেবে অবাক হয় প্রতাপ। তবে চেঁচামেচি করে বৌ শাসন করতে বসার খেলোমি তার নেই। আকাশে ধুলো ছুঁড়লে নিজের মুখেই সে ধুলো নেমে আসে।

তা প্রতাপের এই নীতিটি ধরে ফেলেছে বলেই কি ললিতার আজকাল সাহস বাড়ছে ? ভাবছে লোকের সামনে 'কেলেঙ্কারী'তে পড়ার ভয় দেখিয়ে লোকটাকে বশ্যতা স্বীকার করাবে শেষ অবধি ? যে কৌশলটি বেশীর ভাগই মাথায় চড়ে ওঠা বৌদের রণকৌশল। এটা তো জানা ছিল না ললিতার। হঠাৎ শিখে ফেলল কী করে ?

অবশ্য হিংসের বিষ, নেহাত বোকাসোকাকেও কুটিল আর চালাক করে তোলে। তা ছাড়া—দুর্মতি দেবার লোকেরও তো অভাব নেই সংসারে।

মহিম হালদারকে তার ছোটবোন অনুরোধ উপরোধ করেছিল, শনিবার আসার অপেক্ষা না করেই গোপীচন্দনপুরে চলে যেতে। বলেছিল, তুমি এখনি গিয়ে একবার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করোগে দাদা।

কিন্তু এখনি তো দূরস্থান, শনিবারই কি যাওয়া হল তাঁর ? অদ্ভুত এক পাকচক্র মহিম হালদারকে এক অভাবিত ঘটনার নায়ক করে ছেড়ে দিল।

সকালে যথানিয়মে 'সাত সকালে ভাত খেয়ে' নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ওদের 'উত্তর ভারত' অভিযানের টিকিট, টাইম, তারিখ, রিজার্ভেশন—এই সবের সন্ধান নিতে। স্বদেশরঞ্জন অবশ্য বলেছিল, 'আপনি শুধু রিজার্ভেশানের ব্যাপারটা একটু দেখবেন বড়দা, বাকি সব হয়ে যাবে।'

তবু মহিম অফিস টাইমে খেয়ে নিয়ে রেলের বুকিং অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এসব জায়গায় অবশ্য একবারে কিছুই হয় না। বারেবারে আসতে হবে। যাদের হাতে যে কোন বিষয়ে সামান্যতমও ক্ষমতা আছে সে সেই ক্ষমতাটুকু সদ্ব্যবহার করে তোমায় 'হ্যারাস' করবে। এটাই আমাদের মজ্জাগত বিলাস।

'ফেয়ারলি প্লেস' থেকে বেরিয়ে চিন্তা করছেন, হাওড়া স্টেশনে চলে গেলে কি সুরাহা হবে? হঠাৎ দেখলেন রাস্তার ধার দিয়ে চলে যাওয়া একটা খালি ট্যাক্সি, ঘচাং করে গাড়িটা থামিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠলো, কোথায় যাবেন স্যার?

মহিম হালদার চমকে তাকালেন।

মুখটা চেনা চেনা লাগল। আরে সেদিনের সেই সেই ছেলেটি না। 'সুভাস বোস' নামের জন্যে যে নিজেকে নিয়ে লজ্জিত।

ঈস। ঈশ্বর প্রেরিত নাকি।

হেসে বললেন, আমার একই উত্তর। আপনি যে দিকে যাচ্ছেন। কিন্তু আপনার মিটার বক্সের মুণ্ডুতে যে শালুর ঘোমটা। গাড়ি খারাপ?

সুভাষ বোস গভীর গলায় বলল, গাড়ি খারাপ নয় স্যার, মনমেজাজ খারাপ। আজ আর খাটব না ঠিক করেছিলাম।

তবে? আমায় ডেকে সেধে নেমন্তন্ন করলেন যে?

সুভাষ বলল, সেদিন কিন্তু স্যার আপনি আমায় 'তুমি' করে কথা বলছিলেন।

বলেছিলাম বুঝি? হা-হা-হা। ঠিক আছে, আজও তাই চলুক। কিন্তু তোমায় আজ যেন খুব খারাপ দেখছি।

সুভাষ আস্তে বলে, যাদের ভাগ্য খারাপ, তাদের আর ভাল দেখাবে কোথা থেকে স্যার।

মহিম ওই ক্লিষ্ট, ক্লান্ত বিষণ্ণ স্বরটি শুনে আর কিছু বললেন না। গাড়িতে উঠে বসলেন।

এই ভদ্র-মার্জিত ছেলেটির প্রতি বিশেষ একটি স্নেহ এবং সম্ভ্রম অনুভব করলেন মহিম।

কোনদিকে তাহলে যাচ্ছি স্যার?

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর হঠাৎ সুভাষের এই প্রশ্নে চকিত হলেন মাহম। তার পর একটু হেসে বললেন, বলেছি তো তোমার দিকটাই দিক। আসলে কোন লক্ষ্য নিয়ে বেরোয়নি।.....ঠিক আছে। তুমি বোধহয় বাড়ি ফিরছিলে—আজ না হয় তোমার বাড়ি পর্যন্তই চলো। তারপর ছেড়ে দিও। পথ চিনে ফিরে আসতে পারবো মনে হয়।

আমার বাড়ি! সুভাষ আত্মধিক্কারের গলায় বলে উঠল, ও কথা বলে আর দুঃখ বাড়িয়ে দেবেন না স্যার। একখানা ঘরের জন্য—হঠাৎ চুপ করে গিয়ে নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে থাকে।

কিন্তু সহৃদয় হৃদয়ের আন্তরিকতার একটা শক্তি আছে বৈকি—সে শক্তি বন্ধ দরজার চাবি খোলাতে পারার।

সতীশ ঘোষ কয়েক সেকেণ্ড নিষ্পলকে তাঁর চিরকালের লাইফ মেম্বার বোর্ডারের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বললেন, রান্নাঘরের ছাতের পিছনের সিঁড়িটা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই পাশের প্যাসেজ দিয়ে চলে এসে ওই ছাতটায় ওঠা যেত! নেই সেটা?

হ্যাঁ—অ্যাঁ তা আছে বৈকি। সতীশ ঘোষ মাথা চুলকে বলেন, আপনার বানানো ওই টালিছাত ঘরটায় মিস্ত্রীদের এটা-সেটা থাকে তো—

বুঝেছি বুঝেছি, আমার বানানো, আপনার বানানো বলে কিছু না। মিস্ত্রীদের বলে দেবেন, তারা যেন তাদের ওই এটা-সেটাগুলো সরিয়ে নিয়ে যায়। আর শুনুন—

সতীশ ঘোষকে তাঁর লাটসাহেব বোর্ডার যা বললেন, তার মর্মার্থ শুনে গরম তেলে কইমাছ লাফানোর মত লাফাতে থাকলেন সতীশবাবুর পুরনো বোর্ডার মুরারি মুস্তাফী, সুদাম জানা, আর নিশিকান্ত ঘোষাল এবং নতুন আরো অনেকে।

মহিমের মতো তো কেউ চিরকালের নয়। যাঁদের কর্মজীবনে ইতি পড়েছে তাঁরা তো আর বিদায় না নিয়ে বসে থাকবেন না। নিশিকান্তর অবসর আসন্ন, নোটিশ দিয়ে রেখেছেন, সুদাম জানার আর মাস ছয়েক বাকি আছে।

শুধু মুরারি মুস্তাফী।

তাঁর ইতিমধ্যে গিন্নী বিয়োগ হয়ে গেছে, সংসারটা হঠাৎ ছেলে-বৌয়ের হয়ে গেছে, দেখে তিনি মেসটাকে ছাড়বেন কি ছাড়বেন না ভাবছেন। মহিম হালদার তো আবার একটি অলৌকিক দৃষ্টান্ত।

কিন্তু তাই বলে লোকটা এমন একখানা স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে? এ কী

মামদোবাজি নাকি ? আর ব্যাটা সতীশ ঘোষ ! ঘুঘু বদমাশ ! তুমি টাকা খেয়ে যা খুশি তাই করতে দেবে ?

সুদাম জানা বলে ওঠে, ব্যাটা ঘুঘু আবার বলে কিনা ওনার স্বর্গগত পিতার সঙ্গে হালদারবাবুর এইরকম একটা চুক্তি ছিল।

নতুন একজন বলে উঠল, আমরা ইচ্ছে করলে পুলিসে খবর দিতে পারি। মেসের ঘরে স্ত্রীলোক নিয়ে এসে রাখা।

মুরারির বরাবর রাগ মহিম হালদার নামের লোকটার ওপর। তার ওপর গিন্নী-বিয়োগ, ছেলে-বৌয়ের হঠাৎ বেহেড বেপরোয়া ব্যবহারে রুষ্ট ক্ষুব্ধ। তারকেশ্বর লাইনে কোন-একটা গ্রামে তাঁর বাড়ি। শনিবারে শনিবারে বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু এখন যেন আর সে যাওয়ায় কোন আকর্ষণ নেই। কিন্তু ক'দিন পরে অফিসে ফেয়ারওয়েল দেবে।

তিনি বলে উঠলেন, এইবার সবাই বুঝতে পারলেন তো কেন 'মহারাজ' মেসের ঘরটি ছাড়লেন না। এইটিই মতলব ছিল।

নবীনেরা তড়পাচ্ছে, ওই ম্যানেজারকে আমরা ঝোলাব।

কী জোরকদমে মিস্ত্রী খাটছে দেখেছেন ?···

এদিকের বারান্দায় ওপরকার দরজাটা নাকি 'সীল' করে দিচ্ছে। পেছনের ছাতে রান্নাঘরের ব্যবস্থা।

অ্যাটাচড্ বাথরুমে জল ওঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

ছাত থেকে নাকি একটা ভাঙাচোরা সিঁড়ি ছিল, তাকে মেরামত করে রেলিং বসানো হচ্ছে।

জলের মত টাকা ঢালছে হালদার।

কিন্তু এ হতে দেওয়া হবে না।

হবে না। হতে পারে না।

যাচ্ছি আমরা ব্যাটা সতীশ ঘোষের কাছে।

হঠাৎ এই গুলতানির মধ্যে পিছন থেকে সতীশ ঘোষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, দয়া করে যে এই অভাগা সতীশ ঘোষকে 'ব্যাটা' বলে স্বীকার করেছেন, এতেই সতীশ ঘোষ কৃতার্থ। তবে কথা হচ্ছে পুলিস ডেকে কোন লাভ হবে না। আইন বেআইন না জেনেই কি আর এ-কাজে হাত দিয়েছে ব্যাটা সতীশ ঘোষ ! আইন বাঁচিয়েই কাজ। আমার বাড়ির একটা পোর্শন যদি আমি সেপারেট করে আলাদা একটা একঘরা ফ্ল্যাট বানিয়ে ফেলে মোটা টাকায় ভাড়া দিই, কার কী বলার আছে ?

একটা নতুন আসা কাঠ-গোঁয়ার মত ছেলে ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠে, আছে বৈকি মশাই! ভাড়াটা আপনি কাকে দিচ্ছেন একটা ভদ্রলোকের মেসের চৌহদ্দিতে, সেটা দেখতে হবে তো?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। সে দেখতে হবে বৈকি।

ঐকতান বাদনে এই দাবিটি উচ্চারিত হয়।

বলুন তো দয়া করে কাকে দিচ্ছেন ভাড়াটা?

এর আর দয়াধর্মের কী আছে? সতীশ ঘোষ অবলীলার গলায় বলে, দিচ্ছি আমার এক চিরকালের সৎ-সজ্জন ভদ্র লাইফ মেম্বার বোর্ডারের মেয়ে-জামাইকে!

অ্যাঁ!

অ্যাঁ!

কাকে?

বললাম তো মশাই, ক'বার বলবো?

খুকু প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, এখন তুমি এই কথা বলছ? কোন্ মুখে এখন একথা বলবে, কোন্ মুখে?

মুখ? গোলামের আবার মুখ!

স্বদেশরঞ্জন বলে, আগে ভাবতাম অফিসার হতে পারলেই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ —চতুর্বর্গ লাভ। এখন দেখছি উল্টো। তখন বরং ইউনিয়নের ছত্রচ্ছায়া ছিল, এখন সে সুখেও বঞ্চিত!

খুকু ক্ষুব্ধ গলায় বলে, তাই বলে হপ্তা দুই ছুটি মিলবে না? 'গোলাম' বলে মানুষ নয়?

স্বদেশ হেসে উঠল, এতেদিন পৃথিবীকে দেখতে দেখতে এই প্রশ্ন? 'গোলাম'-এর পর মানুষ শব্দটা বসানো যায়?

থামো। শোনো দাদার কাছে গিয়ে বলে ছাখো না।

দাদা! মাই গড্, উনি তো রিটায়ার করেছেন।

তা করলেও, অ্যাতোদিন একটা ভাল পোস্টে ছিলেন, ওঁর ইনফ্লুয়েন্স থাকবে না?

খুকু! তুমি নিতান্তই খুকু! রিটায়ার করার পর ভাল পোস্টের প্রাক্তন সাহেবও যা, রাস্তার লোকও তা।

খুব চমৎকার! খুকু ধিক্কারের গলায় বলে, জীবনের সমস্ত সার সময়টা জীবনপাত, সেখানের শেষ পরিণাম এই?

স্বদেশ হেসে উঠে বলে, এই।

তা যাই হোক দাদার সঙ্গে একবার দেখা করে অবস্থাটা জানাও গিয়ে। বেচারী দিদি, কত আশা করে বসে আছে। তনুটাও তো আহ্লাদে পাগল। দাদা না হয় ওদেরই নিয়ে ঘুরিয়ে আনুক।

বলছ, যাবো। তবে একা এতোটা দায়িত্ব নিতে রাজি হবেন কী?

মহিম হালদার তাঁর ঘরের জানলা দুটোর পর্দা সরিয়ে দিয়ে ছোট বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে হাট করে সহাস্য মুখে বলেন, দেখো বাপু। চলবে তো? কুলোবে?

এ সেই কোণাচে একফালি বারান্দাটুকু, যেখান থেকে কাভাবে যেন বড রাস্তার একটুখানি দেখা যায়। সেই দীর্ঘদিন আগেও যেতো, এখনো যায়। এই দেখা যাওয়া মাত্রই না মহিম হালদার নামের একটি তরুণ যুবকের স্বপ্নের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল স্বপ্নময় 'বাসা'।

সেই সেদিনও তরুণ মহিম হালদার মনে মনে এই জানলা-দরজাগুলো খুলে দিয়ে বলে উঠেছিল—দেখো! দেখে নাও! চলবে?

সেই 'স্বপ্নে'র বাসা।

কত দীর্ঘদিন ধরে এই বাসাটিকে লালন করে আসছেন মহিম, ভিতরে বাইরে। কে জানে--এ একটা নেশার ঘোর, না একটা পাগলামি?

এখন সেই ঘরে বলে উঠলেন সেই দীর্ঘকাল লালিত কথাটা।

এ কথার কী উত্তর দেবে এরা?

শুধু বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন ক্ষমতা আছে নাকি এখন ওদের?

বহু ক্লেশ, বহু হতাশা আর আশার শেষে তীর্থযাত্রী যখন মন্দিরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়, তখন কি তাদের শুধু বিগ্রহের অলৌকিক মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া সহসা আর কিছু করা সম্ভব হয়!

ওরা কি এখন একথাও ভাবছে না—এটা কি সত্যি ঘটনা? না, কোন দেবতার ছলনা? চোখের পলক ফেলতেই সামনের সব দৃশ্য মিলিয়ে যাবে। আবার দু'জনে খোলা মাঠে রোদের নিচে দাঁড়িয়ে থাকবে। যেমন এযাবৎ ছিল।

মহিম বোধহয় এদের অবস্থা বুঝতে পারলেন।

এদের বিহ্বলতাকে একটু প্রশমিত করতে মহিম ছাতের সেই ভাঙাচোরা টালি-

ঘরটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, আসল ব্যাপারটাই অবশ্য এখন বাকি। তবে মিস্ত্রীরা বলেছে, সামনের সপ্তাহের মধ্যেই করে দেবে। ইচ্ছে করলে দু'দিনেই পারতো। তো রাজমিস্ত্রীরা তো রাজার জাত, অলসতাই ওদের বিলাসিতা।

পিছনের সেই প্যাসেজ দিয়ে আর সরু সেই মাথা-খোলা সিঁড়িটা দিয়েই অবশ্য ওপরে উঠে এসেছে ওরা। সিঁড়িটার রেলিং গেঁথে দিয়েছে সব আগে। মেস-এর দিকের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পেরেক ঠুকে। না, মেস বাড়ির দৃশ্যটা দেখাতে চান না মহিম এদের।

ওদিক থেকে উঠে এসে ছাত পার হয়ে গোটা তিনেক সিঁড়ি উঠে ঘরে ঢুকে এসে এতোকালের পরিচিত ঘরটাই যেন কেমন অচেনা-অচেনা লাগছে মহিম হালদার নামের লোকটার। আশ্চর্য তো!

এতক্ষণে সুভাষ বোস কথা বলল।

আস্তে বলল, বোকার মত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই না। তবু বলছিলাম এতো ব্যস্ত হয়ে কষ্ট পাবেন কেন, এতোদিন যখন গেল, তখন—

মহিম একটু হেসে বলেন, এতোদিন গেছে বলেই তো আর একদিনও যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কী করবো, রান্নাঘরটা না হলে তো চলে আসতে পারবে না। মেয়েদের তো প্রধান ভালবাসার জায়গাই হচ্ছে রান্নাঘর, তাই না দীপালি? হা-হা-হা! তোমারও নিশ্চয় তাই মত?

সুভাষ বলল, প্রধান হওয়াই তো উচিত, খাওয়ার জন্যেই তো সব। এতো খাটাখাটি এতো ছুটোছুটি—

মহিম বললেন, তাহলে মহিম হালদার তো ভোটে হারলো। তা বেশ। দীপালি তুমি তাহলে কাল কি আর একদিন চলে এসো। রান্নাঘরের মধ্যে কোথায় কী তাক-টাক গাঁথতে হবে, কোথায় কি পেরেক-টেরেক পুঁততে হবে। এইগুলো দেওয়াল গাঁথার সময়ই করিয়ে নেওয়া ভাল। ভাবছি—নিচের তলার রান্নাঘরের থেকে একটা পাইপ উঠিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে একটা জলের কল করিয়ে নিতে হবে। বল তো ওর মধ্যে ছোট্ট একটু চৌবাচ্চা করিয়ে নিলে কেমন হয়? তাহলে আর বেশি বালতি টানতে লাগবে না।

দীপালি হঠাৎ মহিমের পায়ের কাছে বসে পড়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে, আবেগে বুজে আসা গলায় বলে উঠল, বাবা।

স্টেশনে নামতেই চায়ের দোকানের গোকুল বলে উঠল, প্রণাম হই বড়বাবু। তো

রিটায়ার করে বাড়ি এসে বসার বদলে যে ডুমুরের ফুল হয়ে গেলেন। শনিবারে আসাও বন্ধ।

মহিম হেসে উঠলেন, একটি শনিবার তো মাত্র আসতে পারিনি হে—

একটা! মনে হচ্ছে যেন অনেকদিন পরে দেখলুম। তো শরীর-স্বাস্থ্য ভাল আছে তো?

অতি উত্তম।

ভালো। এখেনে তো রোগ-ব্যাধি ছাড়া কথা নাই।

মহিম জানেন গ্রামের দিকের লোকেরা কখনো 'ভালো আছি' বলতে জানে না। অথবা বলতে ভরসা পায় না, পাছে নজর লেগে যায়। জেনেও বললেন, তো তুমি ভালো আছো তো?

কোথায় আর? মাথা থেকে পা অবধিই তে ব্যাধি।

মহিম বললেন, তা তে মাদের শাস্ত্রে তো আছেই—শরীরম্ ব্যাধিমন্দিরম্। হা-হা-হা।

পানওলা বিনোদও একই কথা বলল, অনেকদিন পরে দেখলুম।

তার ভাগ্নে 'বুদো' বললো, গত শনিবার দিনকে আপনার জন্যে পান সেজে ছিলুম।

এই তোর এক বাতিক। পান যে খায় না তার জন্যে পান।

তা হোক। মামীমার তরে নে' যাবেন।

নিলেন সেটা মহিম।

যথারীতি এমনিই নিলেন। দাম দেওয়া চলবে না, ক্ষুণ্ণ হবে।

পানটা নিয়ে একটা রিকশা নিলেন।

এ-ছোকরা নতুন। দেখেছেন বলে মনে পড়ল না। ভাবলেন বাঁচা গেল। বকবক করবে না।

রিকশার ঠুনঠুনের সঙ্গে এগোতে থাকেন।

আর একটু যেন অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন, আচ্ছা, ওরা সবাই আমায় এতো ভালবাসে কেন? আমি তো কখনো কাউকে কিছু দিইও না, আর এখানে থাকিও না। অথচ—

বুদ্ধিমান হয়েও এইখানে বড়িতে খাটো হয়ে যান মহিম। ভালবাসার মূল উৎস যে ওইটিই, তা অনুভব করতে পারেন না। এ ভালবাসার জন্ম সমীহ থেকে।

পাহাড়ের গায়ে যারা বাস করে, তারা কি বুঝতে পারে পাহাড় কী বিরাট! প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমির মধ্যে বসবাসকারীরা কি খেয়াল করে, প্রকৃতি কী সুন্দর!

রিকশার শব্দ পেয়েই ছোটন আর ভুটান বাড়ির মধ্যে থেকে ছুটে এলো।

দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠলো, ঠিক বুঝেছি জ্যেঠু। জ্যেঠু তুমি এতো দেরী করলে কেন?

জ্যেঠু হেসে উঠলেন।

কী মুশকিল! যে যেখানে আছে সবাই দেখছি আমার একটা দিনের অ্যাবসেন্টও মনে রেখেছে।

রিকশাওলাকে ভাড়া মিটিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করেন, তা কেমন আছিস সব?

ছোটন বলে ওঠে, আমরা তো ভাল আছি, তো--

তো কী?

বাড়ি চল, শুনবে।

ছোটনকে কথা বলতে গিয়ে থেমে যেতে দেখে মহিম ওর মাথার চুলগুলো একটু নেড়ে দিয়ে বললেন, কিন্তুটা কী রে ছোটন?

ছোটন ঢোক গিলে বলল, মার একটু ইতিহাস অসুখ করেছিল তাই—

মহিম থমকে বললেন, কী অসুখ হয়েছিল?

ছোটন গলার স্বর নামিয়ে বললে, তোমায় বলতে মানা। বলেছি শুনলে পিসি কেটে ফেলবে তো- -

মহিম একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, তবে বলছিস কেন?

ছোটন জ্যাঠার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি আমার বন্ধু বলেই বলছি। আচ্ছা জ্যেঠা, হিস্টরি মানেই তো ইতিহাস? তাই তো?

তাই তো। কিন্তু—

তো মার সেই অসুখটি করেছিল! ওরে বাবা, সে কী হাত-পা ছোঁড়া, আর চেঁচানো!

মহিম একটু বিস্মিত হলেন। প্রতাপের বৌটির বরাবরই রোগ রোগ বাতিক আছে জানেন, কিন্তু ঠিক এ ধরনের 'ইতিহাস' তো কোনদিন শুনেছেন বলে মনে পড়ছে না। তবু ছোট্ট ছেলেটার এই ইংরিজি শব্দর মানে বুঝে ফেলে, তার মা'র অসুখের যে নতুন নাম ধার্য করেছে, তা মনে করে ভারি হাসি পেল।

বললেন, চলো, ভেতরে চলো।

কিন্তু ছোটনের মধ্যে এখন 'গুপ্ত কথা' ফাঁস করে দেবার তীব্র উত্তেজনা। তাই

ছোটন জ্যাঠার হাত ধরে এগোতে এগোতে বলে, 'ইতিহাস' অসুখ কেন হয় তুমি জানো জ্যেঠা ?

মহিম একটু শক্ত গলায় বলেন, না।

ছোটন দেখছে বাইরের মেঠো উঠোন পার হয়ে ভিতরবাড়ির উঠোনে পৌঁছে এসেছে তারা এবং বড়পিসির গলার আওয়াজও শোনা গেল, হ্যাঁ রে, রিক্‌শোর ঘণ্টি শুনলাম মনে হলো যেন। কই, কেউ এলো, কই ?

কাজেই ছোটন তাড়াতাড়ি তার নবলব্ধ জ্ঞানের ফসলটি উজাড় করে ফেলে, তনুদি জানে। বলেছে, হিংসেয় হয়। বড়মামী বরের সঙ্গে বিদেশে বেড়াতে যাবে শুনে হিংসেয় —

আঃ, ছোটন, চুপ করো।

অজ্ঞাতসারেই ছোটনের হাতটা ছেড়ে দেন মহিম।

তবে এও ভাবেন, ওর আর দোষ কী ? অবোধ শিশু। তার সদ্য উন্মেষিত বোধের জগতে যা কিছু ধরে দেবে, সে তাই আত্মসাৎ করে বসবে। শিশুদের সামনে কী অরুচিকর, কী গ্লানিকর কথাবার্তাই উচ্চারিত হয় অন্তঃপুরের অন্তরালে, এক-একটা প্রজন্মই এইভাবে পোকায় খাওয়া হয়ে যায়। যারা অনায়াসে ছোট ছেলেদের সামনে এমন কথা উচ্চারণ করতে পারে, তাদের কী শাস্তি প্রাপ্য ? তারপর আবার ভাবলেন, শুধু ছোটদের সামনেই বা কেন, বড়দের সামনেই বা অপরাধ নয় কেন ? নিজের কাছেও কি কুরুচির কথা কুৎসিত কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা হওয়া উচিত নয় ? নিজেকে সম্ভ্রম করতে না জানলে অন্যকে সম্ভ্রম করবে কী করে ?

বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসামাত্রই মহিম দেখলেন, দিব্যি হৈ-চৈ পড়ে গেল, এই তো রিকশোর লোক এসে গেছে। ও মা, দ্যাখো তোমার শহুরে ভাইটি এসে গেছেন, ও বড়মামা, ছোটমামার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো না ?

তাকিয়ে দেখলেন মহিম ভাগ্নীর মুখের দিকে।

অপাপবিদ্ধ মুখ।

অর্থাৎ ছোটনের সঙ্গে বোধবুদ্ধির বিশেষ কোন তফাত নেই।

সুরবালা বললেন, তুই একখানা দেখালি বটে মহিম। তখন তো তবু নিশ্চিত শনিবার শনিবার আসতিস, এখন আবার তাও ঘুচল। গেল শনিবার বাড়ি এলি না যে ? কী রাজকার্য হচ্ছে এখনো কলকাতায় ?

মহিম একটু চকিত হলেন।

'মিস্সী মিস্ত্রী' করে গেল শনিবারটা কোথা দিয়ে যেন কেটে গিয়েছিল। তারপরও

এই কাল পর্যন্তও তো—

উত্তর দিলেন না মহিম। তার বদলে প্রশ্নই করলেন, প্রতাপ বাড়ি নেই?

নেই বুঝি? এই তো একটু আগেই ছিল। ওর কথা বাদ দে! এই বেরোচ্ছে এই ঢুকছে, এই যাচ্ছে এই আসছে, দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার রাস্তায়! কী যে এতো রাজকার্য সব!

মহিম একটু হাসলেন। বললেন, ওর রাজকার্যেরও মানে খুঁজে পাও না?

পাব কোথা থেকে? আর পাঁচজনের সঙ্গে তো দেখি মেলে না। নে, তক্ক রাখ্। হাত-মুখ ধো। এই ছোটন, তনুকে বলগে যা তো—ও মা ছেলেকে এই দেখলাম, এই হাওয়া! কাজের সময় কাউকে পাবে না তুমি, এই হচ্ছে জগৎ! অ তনু—চায়ের জল চাপিয়েছিস?

আহা, ব্যস্ত হচ্ছো কেন? হবে অখন। আমার কি গলা শুকিয়ে গেছে?

মহিম অজ্ঞাতসারেই বোধহয় একবার রান্নাঘরের দাওয়ার দিকে তাকালেন। কাত করে রেখে যাওয়া বৃহৎ বঁটিটার ধারে একঝুড়ি আনাজপাতি। অর্থাৎ নিহত হবার অপেক্ষায় বসে আছে। জানে না, এইটাই তাদের জীবনের শেষ ক্ষণ। হাসলেন মনে মনে। বলির পাঁঠারা আর জবাইয়ের মুর্গিরা সহজাত অনুভূতিতে টের পেয়ে যায় 'এটাই তার শেষ ক্ষণ!' এদের সে অনুভূতি নেই।

কিন্তু ওদের নিধনকারিণীটি গেলেন কোথায়? ধারে-কাছে তো দেখছি না। কাউকে বুঝতে না দিয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন। অনভ্যাসের বশেই কাউকে জিগ্যেস করে উঠতে পারলেন না, 'কী রে বাড়ির বড়গিন্নীটি গেলেন কোথায়?'

অথচ মহিমেরই সমবয়সী ও-বাড়ির শশাঙ্ক!

দেওয়ালের ওপার থেকে হাঁক পাড়ে, ওরে তনু, ও-বাড়ির গিন্নীটি তোদের ওখানে গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে বুঝি? ডেকে দে ডেকে দে! চোখে অন্ধকার দেখছি!

এমন হামেশাই বলে। আবার এখানে থাকলে শশাঙ্কর বৌও চেঁচায়, মরণ না হলে তার ছুটি হবে না আমার! দু'দণ্ড এসে বসেছি, অমনি ষাঁড়ের মতন চেঁচাতে লেগেছে!

তা মহিম এতে বিচলিত হলে বা দেবযানী এতে আশ্চর্য হলে, সেটা তাদেরই মানসিক পরিণতির অভাব। এই গোপীচন্দনপুরের কেউ শশাঙ্ক আর তার বৌয়ের বাক্‌ভঙ্গী দেখে অবাক হবে না।

অবাক হবে বরং দেবযানীর আদিখ্যেতা দেখতে পেলে। এই বয়সেও গিন্নী কিনা আচমকা বর এসে যাওয়ায় রান্নাঘর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়তে পারছেন না!

অকারণে উনুনের তাতের মধ্যে বসে থেকে ঘেমে মরছেন। এতো লজ্জা।

পাগল না কি।

খুকু তার বরের ওপর তেড়ে এল, পাগল পেয়েছ আমায়? দুমদাম অমনি 'মাইরী, মা কালীর দিব্যি' বলে বসলে বলেই বিশ্বাস করবো আমি তোমার ওই বিদ্-ঘুটে কথা?

স্বদেশরঞ্জন অবহেলার গলায় বলল, না করলে না করবে। আমি যা শুনে এলাম তাই বললাম। গেলাম মরতে মরতে, দেখা হলো না। মেসের ম্যানেজার বলল, আজই বাড়ি গেছেন হালদারমশাই। তবে এখন আর উনি ওঁর সাবেক ঘরে থাকছেন না, নিচের তলায় একখানা ঘর নিয়ে রয়েছেন। পুরনো ঘরটাকে অনেক খরচাপত্তর করে সেপারেট একখানা ফ্ল্যাট বানিয়ে ফেলে মেয়ে-জামাইকে প্রিতিষ্ঠে করেছেন সেখানে।

খুকু ফেটে পড়ে বলে, তো কেমন সেই মেয়ে-জামাই, দেখে এলে না একবার নিজের চক্ষে?

তা আর কিছু নয়। আমি বুড়োকে বলি যে 'দেখি আপনার কথা সত্যি কি মথ্যে।' কেমন? তাছাড়া এখন তো আর সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম উঠে গিয়েই হালদার-মশাইয়ের সেই চিরকালের ঘরটিকে পাওয়া যাবে না? তার প্রবেশপথ আলাদা, ঘুরে গিয়ে কোথায় পাশের কোন্ গলি দিয়ে স্পেশাল সিঁড়ি দিয়ে উঠে তবে পেতে হবে।

যাই হোক। খুকু বীরদর্পে বলে ওঠে, আমি হলে কক্ষনো একবার নিজের চোক্ষে না দেখে চলে আসতাম না। ম্যানেজার বুড়োর কোন কারসাজি কিনা কে বলতে পারে?

স্বদেশরঞ্জন বলল, বলতে আমিই পারি। ম্যানেজার বুড়োর কোন কারসাজি নয়। নিজে মুখেই বলল বুড়ো, কম টাকা তো খরচ করেননি হালদারমশাই ও ফ্ল্যাট-টুকু খাড়া করতে।

স্বদেশ এবার হেসে বলে, বুড়োর খুব গাত্রদাহ। বেজার হয়ে বলল, নিজের অমন সাজানো-গোছানো ঘরটি, সবসুদ্ধু তাদের ধরে দেওয়া হলো! নিজে এখন টেম্পো-রারি থাকার মত শুধু একটা বালিশ চাদর নিয়ে—কি আর বলব বলুন। চিরকেলে খেয়ালী মানুষ! নইলে আর —

খুকু হঠাৎ তীব্র গলায় বলে ওঠে, তাহলে এতোদিন যাবৎ লোকে যা বলে এসেছে সেটাই ঠিক। কলকাতায় একটা ডুপ্লিকেট সংসার ছিল দাদার।

বাস্, চমৎকার! স্বদেশরঞ্জন বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠে বলে, তোমার উপযুক্ত কথা!

এতে খুকু অপমানিত হবে না এমন তো হতে পারে না। রাগে আগুন হয়ে বলল, 'ব্যস্' করলেই সব হয়ে গেল। কোথাও যদি কিছু না ছিল তো 'মেয়ে-জামাই' আসে কোথা থেকে?

তা বটে! হেসে ওঠে স্বদেশ, 'দুই আর দুইয়ে চার'। সোজা হিসেব।

খুকু রাগ করে সেখান থেকে চলে যায়। তবে চলে গিয়ে গুম হয়ে বসে থাকবে এমন মেয়ে নয় খুকু, তাই আবার চলে এসে বলে, তাহলে দুই আর দুইয়ে সতেরো হয় কী করে সেটাই বুঝিয়ে দাও।

আপাতত সম্ভব নয়। তবে তোমার হিসেবটাও মানা অসম্ভব।

উঃ! ভেবে আমার মাথা জ্বলে যাচ্ছে। তুমি একবার দেখে এলে না!

এতো অধৈর্য কেন? দাদার সঙ্গে দেখাটা হোক না।

খুকু মুখ ভার করে বলে, চিরকাল তো লুকোচুরি করে এসেছেন। এখনই যে একেবারে- -

খুকু! ছি ছি! বড়দার সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে তোমার লজ্জা করল না!

ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ধিক্কারে আর সন্দেহে শেষ পর্যন্ত খুকু ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদতেই বসল।

মনে মনে বলতে লাগল, তুমিও একটি ন্যাকা চণ্ডী! আশ্চর্য! রহস্যটা ভেদ করে আসবার চেষ্টা করবে না। মেয়ে-জামাই! শব্দটা একেবারে নিরীহ, তাই না? এল কোথা থেকে হঠাৎ? যাদের জন্যে প্রচুর খরচা করে ঘর বানিয়ে দিয়ে, সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সে কিছু আর নেহাত হেলাফেলা নয়।

তা ছাড়া দুই আর দুইয়ে চার ছাড়া আর হবেই বা কী? সারা জীবন মেসে পড়ে থাকার যুক্তিটাই বা কী ছিল? এই তো বোঝা যাচ্ছে—উঃ, আমি যদি যেতাম তো একবার থুড়ে দিয়ে আসতাম সেই 'মেয়ে-জামাই'কে।

বৌকে কাঁদতে দেখে স্বদেশ একটু আপসের গলায় বলে, মনে হচ্ছে, ব্যাপার আর কিছুই নয়, বড়দাকে ভদ্র আর মায়া-মমতাসম্পন্ন দেখে কোনো ফন্দিবাজ ওনার মাথায় কাঁঠালটি ভেঙেছে।

দাদা খোকা নয়। বোকাও নয়।

স্বদেশ দার্শনিকের গলায় বলে, ছাখো খুকু, ভদ্রতা চক্ষুলজ্জা কর্তব্যবোধ এগুলো কোনো কোনো মানুষকে বোকা আর খোকা করে দেয়। জেনে বুঝেও তার শিকার

হয়।

তা স্বদেশের কথাটা হয়তো সত্যিই।

তা নইলে দেবযানী নামের মেয়েটা হাতে ধরা অমৃতের পাত্রটা মুখে তোলার আগের মুহূর্তে হাত থেকে নামিয়ে আর একজনের হাতে তুলে দেয়?

বৃষ্টি পড়ছিল সামান্য সামান্য।

জলের ছাট আসছে না, তবু সুরবালা, যদি ছাট আসে এই ভেবেই দালানের সব কটা জানালাই বন্ধ করে দিচ্ছিলেন, মহিম বলে উঠলেন, ও কি দিদি, ঘরটা যে গুমোট হয়ে যাবে।

জল এলে ছিষ্টি ভিজবে। এহ্-মুখো ছাট এখন।

যখন জল আসবে, তখন বন্ধ কোরো বাবা। আগে থাকতে শুধু শুধু গরম ভোগ।

তনু বলল, মার এই এক বাতিক। আকাশে মেঘ দেখল কি না-দেখল, অমনি চেঁচাবে 'দোর দে, জানলা দে, ছাতের কাপড় নামিয়ে আন। বাব্বাঃ!'

বড়মামা সামনে থাকলে তনু মাকে কিছু শুনিয়ে দেবার ব্যাপারে বেশ বল পায়। জানে বড়মামা তার সমর্থক।

সুরবালা বেজার গলায় বলেন, আগে থেকে সাবধান হওয়াটা এখন যেন হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার হয়েছে। বলি তাতে লোকসানটা কী?

তনু বলল, সব সময়ই বুঝি মানুষ লাভ লোকসানের হিসেব করে কবে কাজ করবে?

না করলেই পরে আপসোস। এই যে তোর বড়মামা গা এলিয়ে দিয়ে নিজের লোকসানটি নিজে ডেকে আনলো -

হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর আবার বললেন, তা এ আর তার নতুন কিছু না। জীবনভোরই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিয়ে মলো।

মহিম দালানের চৌকিতে বসে একটা পেতলের ছোট গণেশ মূর্তিকে একটা পাতিলেবুর টুকরো ঘষে ঘষে সাফ্ করছিলেন। অকারণেই এই কাজটা হাতে নেওয়া। দালানের ওই কুলঙ্গীটার মধ্যে গণেশ বাবাজী চিরকালই অবস্থান করছেন।

কেউ যে পুজো করে এমন নয়, তবে প্রতাপ কোনো বিশেষ কাজে যাত্রা করলে একবার চোখ বুজে মনে মনে 'জয়বাবা সিদ্ধিদাতা-গণেশ' বলে নমস্কার করে যায়।

এঁঃ! এটা যে লোহার মত হয়ে গেছে' বলে মহিম হঠাৎ তনুকে বলে একটা কাটা লেবু আনিয়ে ওটাকে পরিষ্কার করতে বসেছেন। এসে পর্যন্ত বঁটির অধিকারিণীর তো কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছেন না। কাটা লেবুর আবেদন করার উদ্দেশ্যটা কি তাকে একবার জানান দেওয়া?

হ'ল কি মহিলার? অসুখ-টসুখ করেছে বলে তো মনে হচ্ছে না। রান্নাঘর থেকে তো যথারীতিই রান্নার শব্দসৌরভ ভেসে আসছে, এবং 'লিভ্ ভেকেন্সি'তে কাজ করার উপযুক্ত অপর দুজন মহিলা তো সামনেই উপস্থিত।

অথচ চিরকালের অনভ্যাসে না পারছেন জিজ্ঞেস করতে না পারছেন একবার রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি মারতে। চাঞ্চল্য প্রশমিত করতেই এটা নিয়ে পড়া।

কিন্তু এদের কথাবার্তা শুনে কেমন যেন গোলমেলে লাগছে। বলেই উঠলেন, কী রে তনু, কী ব্যাপার। তোর মার এমন দার্শনিক মন্তব্য।

তনু একবার কটাক্ষে মাকে দেখে নিয়ে বলে ওঠে, আর বলো কেন মামা। এত ঠিকঠাক, এখন বড়মামী বলছে, এ সময় সংসার ছেড়ে বেরোনোর অনেক অসুবিধে, যেতে পারবে না। ওই টিকিটটায় বরং—

কথাটা শেষ করতে পারল না তনু, প্রায় চমকেই উঠল তার বড়মামার হঠাৎ ছাদফাটানো হা হা হাসির শব্দে।

হা হা হা।

হাসির মধ্যে একটা কথাই শুধু শোনা গেল, 'আরে এ তো জানা কথাই।'

হা হা হা!

এ শব্দ দালানের বন্ধ জানালা ভেদ করে উঠোন পার হয়ে রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেই শব্দের ধাক্কায় দেবযানীর হাত থেকে জলের ঘটিটা পিছলে পড়ে যায় জলসুদ্ধু।

এতো হাসির ঘটার মত কী ঘটনা ঘটল এইটুকুর মধ্যে। দেবযানী যে একবারও সামনে যায়নি, সেটুকুও কি চোখে পড়েনি লোকটার? দিব্যি হাসিগল্পে মত্ত আছে। হাসিগল্পের চাষ তো আজকাল আর নেই এ বাড়িতে। দেবযানীর সর্বদা উছলে বেড়ানো ভঙ্গীটা কারোরই যেন আর ভাল লাগছে না। ঝি-চাকর, ধোবাটা, গোয়ালাটা, শাকওলি, মাছওলি, মিস্তিরী-মজুর, পাড়া-পড়শী, সকলের সঙ্গেই যে

দেবযানী হেসে কথা কয়, অকারণ কথা বাড়িয়ে কথা কয়, এ সব কারুরই বিশেষ পছন্দ ছিল না, এখন যেন অপছন্দটা বেশ ধরা পড়ছে।

তবে বাড়ির প্রধান শ্রীযুক্ত প্রতাপ হালদারই মাঝে মাঝে বলে বসেন, বাড়িতে ওই একটা মানুষ আছে বলেই বাড়িটা জ্যান্ত আছে। নচেৎ মনে হতো 'মরা বাড়ি'।

তা এটা তো দেবযানীর অনুকূলে যায় না, প্রতিকূলেই যায়।

মহিম এলে অবশ্য বাড়িতে ক্ষণে ক্ষণেই হাস্যরোল ওঠে, ছেলেপুলের উদ্দাম আনন্দরোল ধ্বনিত হয়। দেবযানীর ভিতরকার সুখের পাখিটি শিস্ দিয়ে ওঠে।

কিন্তু আজ দেবযানীও নিথর।

গত সপ্তাহে মহিমের বাড়ি না আসার অভিমান?

নাঃ, তা নয়।

দেবযানীর নিজের মধ্যেই একটা দুরন্ত লজ্জা! খুকু বলেছিলো, বড়দা কি আর আমাদের সঙ্গে তীর্থে যাওয়ায় এমন এককথায় রাজী হতো বাবা! যেই বলেছি বড়-বৌদি যেতে মন করেছে, অমনি একেবারে মুখে আলো জ্বলে উঠলো।

দেবযানী লজ্জা পেয়ে বলে উঠেছিল, শুধু আলো? হাজার বাতির রোশনাই নয়? দেখেছ স্বদেশ, তোমার গিন্নীর বাক্যচ্ছটা!

রাতদিনই দেখছি। ওই বাক্যচ্ছটার ছায়াতেই তো পড়ে আছি। তবে এ ক্ষেত্রে আমিও ওর কথায় সায় দিচ্ছি, বুঝলেন? খুব খুশি দেখিয়েছিল বড়দাকে। হেসে হেসে বলেছিলেন, 'হালদার বাড়ির বড় গিন্নীর হঠাৎ এতো সুমতি?'

সেই আহ্লাদের ওপর দেবযানী একখানা পাথর চাপিয়ে দিচ্ছে!

জ্বলন্ত আগুনের লালচে আভায় দেবযানীর মুখটা লাল দেখাচ্ছে। দেবযানী সেই আগুনের দিকেই যেন নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে বসে আছে রান্না করার ছোট্ট নীচু চৌকিটার ওপর বসে। ও যেন ভুলে গেছে কোথায় রয়েছে।

দেবযানীকে এমন আত্মবিস্মৃত হয়ে বসে থাকতে দেখেছে কেউ কখনো?

নাঃ, কেউই দেখেনি বোধহয়। দেবযানীর যা কিছু চিন্তা-ভাবনার সাক্ষী রাতের অন্ধকার। সেই চিন্তার মধ্যে কি আত্মবিস্মৃতি থাকে? অথবা আত্মবিশ্লেষণ?

দেবযানী তো চিরকাল দাঁড়িপাল্লায় বাটখারাগুলো অপরদিকেই চাপিয়ে এসেছে। মহিম হালদার নামের লোকটা অদ্ভুত বেখাপ্পা খেয়ালী আর হৃদয়শূন্য। কোনোদিন দেবযানীর আশা-আকাঙ্ক্ষা আবেগ-ব্যাকুলতাকে বুঝতে চায়নি। বুঝতে চায়নি মহিমের এই সৃষ্টিছাড়া আচরণে লোকসমাজে দেবযানীর মাথাটা কতখানি হেঁট হয়।

'হ্যাঁ, সারাজীবন এইদিক থেকেই ভেবে এসেছি আমি।'

ভাবছে দেবযানী, 'ওর দিক থেকে কোনোদিন ভাবতে চেষ্টা করিনি। ওর দিকেও তো কম ব্যাকুলতা ছিল না, কম আবেগ। অবিরতই তো মিনতি করে এসেছে, অনুনয় করে এসেছে, আর লোভ দেখিয়েছে একটি সুখের স্বর্গের।

বলে, চল না দেবী তোমার এই সংসারের পাকচক্র থেকে। আচ্ছা দেবী, তোমার ভাবতে ইচ্ছে করে না এমন একটি সংসার পেতেছ তুমি, যেখানে শুধু তুমি আর আমি।···লোকে কী বলবে এ ভয় নেই, কখন কার পান থেকে চুন খসে পড়ল বুঝি বলে আতঙ্ক নেই, কিছু পেরে না উঠলে লজ্জায় মাথাকাটা যাওয়া নেই! ভাবো তো কী মুক্তি!

ওই আলোর মত, উজ্জ্বল আলোর মত নির্মল মানুষটা দেবযানীর মত তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্যে কত আকুলতাই তো দেখিয়েছে।

আচ্ছা দেবী, সারাটা জীবন তো শুধু কর্তব্য করে এসেছ, যে যেখানে আছে, সকলের জন্যে। কিন্তু এই হতভাগাটার ওপরও যে তোমার একটা কর্তব্যের দায় আছে, তা কি কোনোদিন ভেবে দেখেছ?

না না, দেবযানী কোনোদিন সে কথা ভেবে দেখেনি। দেবযানী তার স্বামীকেই 'হৃদয়হীন পাষাণ' বলে মনে মনে অভিমানে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, আর কিছুতেই সেই ক্ষতটা কারুর সামনে এমন কি স্বামীর সামনেও প্রকাশ করে বসবে না বলে, অনবরত তার ওপর হাসি আর আহ্লাদের, কৌতুকের আর ঔদাসীন্যের প্রলেপ লাগিয়ে লাগিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। কারণ দেবযানী তার স্বামীর ওই 'চাওয়া'টাকে ভুল চাওয়া ভেবেছে, ভেবেছে অন্যায় চাওয়া। দেবযানীর মতবাদ হচ্ছে মানুষ কি পাখি-পক্ষী যে, জোড় বেঁধে 'শুধু দুটি'তে প্রণয় সুখ উপভোগ করবে? মানুষ তো অনেকের জন্যে। মানুষ তো অনেককে নিয়েই সম্পূর্ণ। দশের একজন না হতে পারলে সুখ কোথায়? শহরে চলে গিয়ে একটা পায়রার খোপের মধ্যে বাসা বেঁধে শুধু দু'জনে বকবকম করে জীবন কাটিয়ে দিতে গেলে, কে চিনবে দেবযানীকে? কে মানবে? কে মান্যগণ্য করবে? কে বলতে আসবে, হ্যাঁ, হালদারবাড়ির বড়গিন্নী একটি আদর্শ!

মহিমের ভাঁড়ারে যুক্তির অভাব ছিল না।

'আচ্ছা দেবী, সীতাদেবীই তো তোমাদের মেয়েদের জীবনের আদর্শ দেবী! তিনি তো দিব্যি অযোধ্যার রাজপুরী আর রাজঐশ্বর্য ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে বনে পাতার কুটিরে বাস করতে গিয়েছিলেন। আর তুমি? কলকাতা হেন শহর, যে শহরের জন্যে দেশসুদ্ধ বৌ-মেয়ের দীর্ঘশ্বাস, সেইখানে একটু ছোট্ট বাসায় থাকতে পারবে না?'

দেবযানী অবশ্য কথায় হারে না কখনো। বলেছে, আহা গো কা তুলনাই হলো! রামচন্দ্র তো বনে গিয়েছিলেন পিতৃসত্য পালন করতে। তুমি কার কোন সত্য পালন করতে 'অযোধ্যাপুরী' ছেড়ে বসে আছো শুনি?

যদি বলি নিজের হৃদয়ের সত্যে।

ওরে বাবা! বড্ড বড় আর ভারি কথা। মুখ্যু মেয়েমানুষ বুঝতে অক্ষম।

দেবী, তোমার এই অক্ষমতাটা তো একটা খোলশ। এটাকে ভেঙে একবার বেরিয়ে আসতে চেষ্টা কর না?

দেবযানী বলেছে, জীবনটা বুঝি শুধু কাব্যি?

কী আশ্চর্য। কী আশ্চর্য!

কত কত দিন আগের সব কথাগুলো হঠাৎ এমন ভিড় করে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে কেন?

মহিম বলেছে, জানো—এই গোপীচন্দনপুরে এসে বসবাস করতে হবে ভাবলেই আমার প্রাণ হাঁফায় দেবী।

দেবযানী সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, আর আমার তোমার ওই কলকাতা শহরের একটু পাখির খাঁচায় বাস করার কথা ভাবলেই প্রাণ হাঁফায় প্রভু!

লোকে কলকাতা বলেই তো মরে।

তার মানে আমি একখানি অলোকসামান্যা!

আচ্ছা দেবী, আমার কাছে থাকতে ইচ্ছে করে না তোমার?

শুনে দেবযানীর চোখে ফট করে জল এসে গেছে। তবু সামলে শক্ত হয়ে বলেছে, আর আমিও যদি মশাইকে এই কথাটি জিগ্যেস করি?

তা এসব অতীতের কথা।

ইদানীং আর এরকম কথায় চাষ হয় না।

দেবযানী দিন গুণে চলেছিল তার দিন আসার অপেক্ষায়।

আর মহিম হালদার হাল ছেড়ে দিয়ে বলতো, ও বাবা! হালদারবাড়ির বড়গিন্নী! এই তুচ্ছ মহিম হালদার সেই মহিমার কাছে তো একটু তৃণখণ্ড মাত্র!

তবে এই সেদিন—যেদিন দেবযানীর 'দিন' আসার আশায় ছাই পড়ায় দেবযানী তীব্র ক্ষোভে বলে উঠেছিল, 'বিশ্বাসঘাতক'!

সেদিন মহিম বলেছিল, বিশ্বাসঘাতক আর কে নয় বলো? আচ্ছা দেবী, কোনদিন কি হিসেব করে দেখেছ, কিসের বিনিময়ে তুমি তোমার জীবনটাকে বিকিয়ে দিলে? সমস্তটা জীবন যে অন্ধের মত শুধু নিজেকে বিলিয়ে এলে তার বদলে কী পেলে?

সেদিন দেবযানী রাগ করে বলেছিল, 'বদলে কী পাব?' এ ভাবনা নিয়ে কাটাইনি কখনো। যা কর্তব্য তাই করতে চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আজ দেবযানী এই ভরদুপুরে জলন্ত উনুনের সামনে বসে আগুনের আভায় লালচে হয়ে যাওয়া মুখে ভাবছে, ঠিক! সমস্ত জীবনটা উৎসর্গ করেছি শুধু একটা বোকামির পিছনে; কিছু পাইনি, কিছু পাইনি। বড় ননদ উঠতে-বসতে বলেন, 'সোনা ফেলে আঁচলে গেরো'! কথাটার মানে বুঝতে পারতাম না, আজ বুঝতে পারছি। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

তবু আজও বোকার মত জীবনের শেষ সম্বলটুকুকেও বাজী ধরে পাশার দান চেলে বসেছি। এখনো আমি ওদের তীর্থভ্রমণের সঙ্গী হতে চেয়েছি শুনে ওর মুখে নাকি আলো জ্বলে উঠেছিল। অথচ এখনো আমি বুদ্ধিভ্রংশের মত সে আলোয় জলের ছাঁট মেরে বসেছি।

কিন্তু কী করবে? চিরদিনের মুখ-চাপা ললিতা হঠাৎ এমন তীব্রবেগে বিষোদ্গার করতে থাকবে তা কি কখনো ভেবেছিল দেবযানী?

ওই তার তীক্ষ্ণ রূঢ় কথাগুলো নাকি ললিতা ব্যাধির বশে বলেছে।

কিন্তু ব্যাধিটা কি নির্ভেজাল? না বিষোদ্গারের একটা উপায়স্বরূপ?

সে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না।

তাই দেবযানীকে বলে বসতে হয়, তা সত্যি! আহা বেচারী চিরটাদিন ভুগে মরেছে আর আঁতুড়ে ঢুকেছে, জগতের কোন কিছুই দেখেনি (যেন দেবযানীই জগৎ দেখে বেড়িয়েছে।) আমি বলি কি ওই মিসেস হালদারের টিকিটটায় ললিতাই বরং তোমাদের সঙ্গে ঘুরে আসুক। তাতে বেআইনী কিছু হবে না। ওর শরীরটা একটু সেরে আসুক। তাছাড়া আমারও এখন বেরোনোয় শত বাধা। আমবাগানে এবার কী রকম আম ধরেছে দেখেছ? ওদের না সামলালে সারা বছরের আচার আমসত্ত্বর দফা গয়া। তাছাড়া এ সময় গরুটায় দুধ দিচ্ছে বিস্তর, যত্নের গুণ দেখাচ্ছে। একবার ছেড়ে গেলেই সব উপে যাবে।

এই রকমই আরো কিছু নিরুপায়তার কারণ দর্শিয়েছিল দেবযানী।

সেজন্যে তার ভাগ্নী ধিক্কার দিয়েছে, দ্যাওর আকাশ থেকে পড়েছে এবং তুমুল প্রতিবাদ করেছে, আর ছোট ননদ-নন্দাই দু' হাত জোড় করে বলেছে নমস্কার।

এই খবরটা জানাবার জন্যে বড় শালার মেসে হানা দিয়েছিল স্বদেশ, তারপরের কথা তো জানা। তবে এই জানাটা এখনো গোপীচন্দনপুরে এসে পৌঁছায়নি। গুম হয়ে গেছে স্বদেশরঞ্জন।

তা সে তো অন্যত্র। এখন দেবযানীকেই মাথা হেঁট করে জজের সামনে নিজের অদ্ভুত বোকামির কথা পেশ করতে হচ্ছে।

রাতের পরিবেশে কাছ ঘেঁষে শুয়ে বলতে হচ্ছে একটা কথা বলব চটে যাবে না বল?

চটে? আমায় কি তুমি কখনো চটতে দেখেছ?

দেবযানী একবার তার আজীবনের স্মৃতির ওপর চোখ বুলিয়ে নি। আশ্চর্য এই মানুষটাকে দেবযানী সারা জীবন কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে এসেছে। একটু হাসির গলায় বলল, তা দেখিনি বটে। তবে এবার চটবার কারণ ঘটেছে, আমি নিজেই স্বীকার করছি। বলছিলাম কি ছোট বৌ ছেলেমানুষ, চিরটাকাল ভুগেই সারা, কখনো তো কোথাও যেতে আসতে পায়নি তাই বলছিলাম আমার টিকিটটায় বরং ছোট বৌ-ই চলে যাক দিদিদের সঙ্গে। আমি আবার কখনো

না, এখন দেবযানীও কথা শেষ করতে পেল না। এখনও আবার মহিম হালদারের পেটেন্ট হা-হা হাসিটি ধ্বনিত হলো। ছাদ-ফাটানো শব্দ অবশ্য নয়, তবে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা মারল।

হাসি থামিয়ে বললেন, আরে এ তো একটা বাসি খবর। এর জন্যে তোমার এতো গৌরচন্দ্রিকা! এ তো আমি আগেই হাড়ে গুণে জেনে ফেলেছিলাম। গণনা-শক্তির প্রমাণও হয়ে গেছে ইত্যবসরে। তবে হ্যাঁ, একটু আশাভঙ্গ ঘটেছে বৈকি। জেনেবুঝেও আশা করে মরছিলাম বেড়ালের ভাগ্যে হঠাৎ ছিঁড়লই বুঝি শিকেটা! আহা মনে মনে কত স্বপ্ন ভাঁজছিলাম, সংসারের বাইরে বেরিয়ে পড়ে যদি হালদার বাড়ির বড়গিন্নীর কিছু পরিবর্তন ঘটে। পাচজনের চোখ বাঁচিয়ে একসঙ্গে বেশ পরস্পরীর মত ভুলিয়ে কোন একখানে সরে পড়ে প্রেমগুঞ্জনে কাটিয়ে দিতে পারি! ভেবে বেশ রোমাঞ্চ রোমাঞ্চ লাগছিল। তো অভাগার ভাগ্যে সে গুড়ে বালি। যাকগে, কী আর করা যাবে!

সীতাদেবী নাকি মর্মান্তিক লজ্জায় পাতালপ্রবেশ করেছিলেন। নিদারুণ সেই পরিস্থিতি।

কিন্তু লজ্জা কি অনেক পরিস্থিতিতেই নিদারুণ হয়ে উঠতে পারে না?

রাতারাতি ভীষণ একটা অসুখ করতে পারে না দেবযানীর? যাতে মরতে দু'-চার মিনিটের বেশী সময় লাগে না।

প্রতাপ বলল, তুমি যে কী করে এতে রাজি হলে ছোটবৌ, তা বুঝতে পারছি না। দাদার কাছে এতো লজ্জা করছে।

ললিতা তেতো গলায় বলে, কেন এতে লজ্জাটা কিসের ? আমি বাড়ির বউ নই ? আমার কিছু পাওনা নেই ?

প্রতাপ গম্ভীরভাবে বলে, হঠাৎ পাওনাগণ্ডা নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছ দেখছি। ওতেই মাথা বিগড়োচ্ছে।

ললিতা তো এখন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, অতএব ললিতা যা খুশি বলে নেবার ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। ললিতার মুখে এখন তাই কুটিলতার সঙ্গে সর্বদা যেন একটু বিজয়-গৌরবের হাসি।

তা মাথা ঘামাব না তো কী ? চিরজন্ম বোকা হয়ে থাকব ? একজন দু'-দুটো রাজার পাটরাণী হয়ে থাকবেন, আর একজন চিরজন্ম ঘুঁটেকুড়ুনি দুয়োরাণী হয়ে থাকবে, কেমন ? অত সস্তা নয়।

আগে এলে এ ধরনের সামান্যতম উক্তিতেও প্রতাপ বৌকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিতো। কিন্তু এখন আর তার সে উপায় নেই। এখন একটু কিছু বললে অথবা শুধু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও ললিতা চেঁচিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে গোঁ-গোঁ করে মুখে ফেনা তুলে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড করে ছাড়বে। দাদা রয়েছেন বাড়িতে। অতএব প্রতাপকে মনের রাগ মনে চেপে বলতে হয়, ঘুমের ওষুধটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো দিকি।

হুঁ। তাহলে খুব সুবিধে হয় কেমন ? চিরজন্ম তো আমায় 'নিঘুনি মন্তর' দিয়েই রেখে এসেছ। আর তলে তলে আমার ঘরে সিঁদ পড়েছে।

প্রতাপ আজকাল তার বৌয়ের কথাবার্তার ধরনে যেন হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে। এতো সব কথা শিখলো কবে ললিতা ? চিরদিনই বৌকে মুখে তালাচাবি এঁটে থাকতেই দেখেছে প্রতাপ। মাঝে মাঝে বরং রীতিমত বিরক্তই হয়েছে। বলেছে, ভগবান তো কোন গুণই দেয়নি, তো দুটো কথার সম্বলও কি দিয়ে পাঠায়নি ? মানুষ পরিবারের সঙ্গে দুটো কথাবার্তা কয়। তো আমার পরিবারের কথার মধ্যে শুধু হুঁ,

আর না। কি জানি আর জানি না। ঝাড়ু মারি কপালে।

কিন্তু এখন প্রতাপ দেখছে, অথবা দেখে হতভম্ব হচ্ছে, কথার সম্বল কাকে বলে! আশ্চর্য, এমন নীচ কুটিল মনোভাবই বা এল কোথা থেকে? বৌকে প্রতাপ অবশ্য কোনদিনই 'মহীয়সী' বলে ভাবেনি কিন্তু এও ভাবেনি ললিতার ভেতরটা এতো নীচ, এতো ইতর, আর তার মধ্যে এতো হিংসের বিষ। চিরদিন তুই রোগ বাতিক করে পালঙ্কে গা মেলে কাটিয়ে তোর একপাল বাচ্চা-কাচ্চাকে অন্যের ঘাড়ে দিয়ে মানুষ করিয়ে নিলি, অথচ সেই মানুষটার ওপরই এতো হিংসে পুষে রেখে দিয়েছিস। ছি-ছি। পুষে না রাখলে এখন বেরোচ্ছে কী করে?

বাড়ির চিরকেলের বুড়ো ডাক্তার বলেছে, 'হিস্টিরিয়া'। আবার এও বলেছে আগের কালে ঘরে ঘরে মেয়েছেলেদের এ ব্যামো ছিল, এ-যুগে তো দেখি না। কোন কারণে নার্ভ চড়ে গেছে। তবে সাবধানে রাখবেন।

কিন্তু সাবধানেই রেখে এসেছে প্রতাপ বৌকে। চিলকগ্ন তো। 'রোগ বাতিকটা'ই তো তার রোগ। কিন্তু এমন জব্দে পড়েনি প্রতাপ। বৌকে শাসন করতে গেলে, আরো বাড়বে।

কাজেই চুপ করে থাকতে হয় প্রতাপকে। কারণ ভয়ে সারা হয়, শাসন করতে গেলে পাছে আরো খারাপ খারাপ কথা বলতে থাকে ললিতা।.....খুব একটা জব্দ করে বসেছে প্রতাপকে প্রতাপের এতোদিনের মিনমিনে বৌটা।

অনেক মেয়েমানুষই বোঝে না, পুরুষের মন জয় করতে 'সখী ধরো ধরো' ভাবটি মোটেই কার্যকরী নয়। 'অসুখ' দেখিয়ে বেশিদিন তাকে বেঁধে রাখা যায় না। পুরুষকে করায়ত্ত করার আসল ওষুধ হচ্ছে কর্মশক্তি। সেই শক্তিটি যত বেশি প্রয়োগ করবে, ততোই উদাসীন পুরুষচিত্ত অজ্ঞাতসারেও বশ্যতা স্বীকার করবে, নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। পুরুষ নিজে যতই আত্মস্থ আর কর্মকাণ্ডের নায়ক হোক, ভেতরে ভেতরে সে একটা নির্ভরতার জায়গা চায়, নিশ্চিন্ততার সুখ চায়। কিন্তু অনেক মেয়েই ভুল পথ ধরে। স্বামীকে আয়ত্তে আনবার আর একান্তভাবে 'পত্নীগত প্রাণ' করে তোলবার চেষ্টায় 'ললিতলবঙ্গলতা'র ভূমিকা নেয়, যেটা পুরুষচিত্তকে বিমুখই করে তোলে।

কিন্তু এই ভ্রান্তবুদ্ধি বহু মেয়ের মধ্যেই আছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত গ্রাম্য নাগরিক যাই হোক 'মেয়েমানুষে'র স্বভাব ঠিকই কাজ করে চলে।

এই সব ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হয় না। এতে আয়ত্তে আসা তো দূরস্থান, হাতছাড়াই হয়ে বসে সেই পুরুষমানুষ।

অতএব এই মেয়েদের পরিণাম মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়া।

পাগল সাজবার ইচ্ছেটাই তো একটা মানসিক রোগের লক্ষণ।

কিন্তু ললিতার মধ্যে যে এযাবৎকাল এমন একটা আক্রোশ জমে উঠেছিল কে ভেবেছে? সকলেই জানতো ললিতা অকৃতজ্ঞ, ললিতা স্বার্থপর, ললিতা চক্ষুলজ্জাহীন। ললিতা 'হিংস্র' এটা ছিল ধারণার বাইরে।

মাঝে মাঝে ভাবে প্রতাপ, খুতুর মার কথাই বিশ্বাস করতে হবে না কি?

ভূত অথবা ভগবান কোনটাতেই বিশ্বাসী নয় প্রতাপ। এই একটি বিষয়ে দুই ভাইয়ের সাদৃশ্য। দিদি সুরবালা তো তেত্রিশ কোটির চরণে বিকিয়ে বসে আছেন। ভূতেও অবিশ্বাসী নন। তাঁর কাছেই কথাটা পেড়েছিল খুতুর মা।

এ আর কিছু না বড়দি, ভূতে পাওয়া। ওই দাঁত কিড়মিড় হাত-পা ছোঁড়া, কট-মন্দ কথা মুখে আনা, এসবই ভূতে পাওয়ার লক্ষণ। বল তো, ভূষণো রোজাকে একবার জানান দিই।

কিন্তু সুরবালা ভাইয়ের ভয়ে তাকে সে নির্দেশ দিতে পারেননি। শুধু খুতুর মার জবানিতে বলেছিলেন, খুতুর মা বলছিল একটা 'ঝাড়ান-কাটান করলে ভাল হয়।

প্রতাপ বলেছিলেন, এবার থেকে তাহলে খুতুর মার চিকিৎসাই চলবে বাড়িতে?

তারপর আর কী কথা!

কিন্তু এখন প্রতাপ মাঝে মাঝে ভাবছে, খুতুর মার কথাই সত্যি নয় তো? চির-কাল চুপচাপ ললিতার মুখে এতো ক্লেদাক্ত কথা যোগাচ্ছে কে?

প্রতাপের জানা নেই চাপা আক্রোশ, চাপা হিংসে এরাই ক্লেদ জমিয়ে তুলতে ওস্তাদ। আর 'রোগগ্রস্ত' যদি একবার বুঝে ফেলে এইবার হাতে পাওয়া গেছে এক-খানা জবরদস্ত অস্ত্র, তাহলে আর ছাড়ে? সেটাতেই শান দিতে থাকে।

রোজাকে না ডাকতে পারুন সুরবালা, তাঁদের বুড়ো কবরেজ মশাইকে ডেকে এনেছিলেন। তিনি সব শুনে-টুনে বলে গেছেন, বায়ুরোগের পূর্বলক্ষণ। তা এতে বায়ু পরিবর্তন খুবই উপকারী। তাছাড়া তীর্থদর্শনে মন উন্নত হয়। নিয়ে যাও মা সুরবালা ছোট বৌমাকে তোমার সঙ্গে।

চা খেতে বসে মহিম বললেন, ওরে প্রতাপ, বলছি কি, ওদের রেলের টিকিটে একটা নামের যখন বদল ঘটছে তখন আর একটাও না হয় ঘটুক। অবশ্য আইনে বাধবে না, আমিও মিস্টার হালদার তুইও মিস্টার হালদার। আমার বদলে তুই-ই বরং চলে যা দিদিদের সঙ্গে!

প্রতাপের ভুরুটা কুঁচকে উঠল।

আমি ? আমি যাবো ! আমার কি অমন এককথায় গেলেই হলো ?

কথাটা সত্যি। প্রতাপের বহুদিকে বহু ব্যবসা। ছোট ছোটই, তবু তার বন্ধন তো কম নয়।

মহিম অবশ্য অতো জানেন না। তাই হেসে বলেন, আমায় একটু বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দিয়ে গেলে এ ক'টা দিন চালিয়ে দিতে পারব না ?

প্রতাপ মনে মনে বলে, তা আর নয় ! তোমার কাছে আমার সব কিছু ফাঁস ক'রে আর কী।

মুখে একটু গম্ভীরভাবে বলে, কেন, ভাদ্রবৌ সঙ্গে গেলে তোমার অসুবিধে হবে ?

ভাদ্রবৌ সঙ্গে গেলে—

মহিম কথাটা অনুধাবন করে নিয়ে হেসে ওঠেন, আমার অসুবিধে ? মহিম হালদারের অসুবিধে ঘটাবে এমন সাধ্য কারো নেই। ঘরের বৌ সঙ্গে যাবেন তার আবার 'ভাদ্র-আশ্বিন' কী রে ? তবু আর ছোট বৌমা কি আমার কাছে আলাদা ? আসল গাজেন তো দিদি। আমি ভাবছিলাম ছোট বৌমার শরীরটা শুনলাম ভাল যাচ্ছে না, তুই সঙ্গে গেলে ওঁর পক্ষে ভালো হতো !

প্রতাপ তেজা গলায় বলে উঠল, ঠিক উল্টো। এবং কিছুদিন আমার চোখছাড়া হয়ে থাকাই মঙ্গল। আমিই তো হয়েছি এখন দু'চক্ষের বিষ।

মহিম সচমকে বলেন, কেন ?

প্রতাপ সামলে নেয়। অবহেলার ভাবে বলে, আর কেন ! সময়ে ওষুধ খাও ডাক্তারের কথা মানো—এই নিয়ে টিকটিক করি বলে।

হা-হা-হা ! বেশি ভুগলে ওরকম হয় বটে। বরাবরই তো শরীর অমজবুত ! তা যাক। চেঞ্জে শরীরটা ভালো হয়ে যাবে। কবে যেন তারিখটা ?

এই তো সামনের বারো তারিখ। তুমি তার আগে চলে এসো। যদিও এখনই বা আবার কলকাতায় ফিরবে কেন তা বুঝছি না। কোন মানে হয় না।

মহিম আবার হেসে উঠে বলেন, আমার কাজের কোন মানে আর তুই কবে পাস রে ? ছেলেবেলায় মনে নেই ? তুই চেষ্টা-যত্ন করে কোথা থেকে যেন যতসব পাখির ছানা এনে এনে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখে দিতিস, আর আমি ফাঁক পেলেই ঝুড়ি উঠিয়ে উড়িয়ে দিতাম। তুই রেগে লাল হয়ে বলতিস, কোন মানে হয় না। মনে পড়ে ?

প্রতাপ একটু স্নিগ্ধ গলায় বলল, মনে পড়ালে বলেই পড়ল।

তারপর হঠাৎ ভাবলো, চিরকাল ভেবে এসেছি, দাদা দেশে এসে বাস করার

যতলব না করলেই মঙ্গল। দাদার চোখের সামনে আমার এতোরকম কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো চলবে না। এখন মনে হচ্ছে থাকলেও হয়তো মন্দ হতো না। হয়তো সাতে-পাঁচে থাকতো না। বরং বাড়ির আবহাওয়াটা ভাল থাকতো।

আবার ভাবলো, তা সেটা যে ছিল না তা নয়, বৌদিও তো এই রকমই। কিন্তু ললিতা যে কেন হঠাৎ বাড়ির হাওয়া এমন বিষ করে তুলল।

নাঃ। ওই 'কেন'টার উৎস বোঝবার ক্ষমতা প্রতাপ হালদার নামের লোকটার নেই।

এবারে কলকাতায় আসার সময় মহিমকে বেশ বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। যেটা নাকি মহিমের ধাতে নেই। মহিমকে কখনো কোথাও বিষণ্ণ মুখে চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যায় না। বাড়ি বসেই হোক, বা চলন্ত যানবাহনেই হোক।

দৈবাৎ মাঝে মাঝে যদি কখনো চিন্তায় চেতনায় চাঞ্চল্য আসে, বেহালাটাকে তাক থেকে পেড়ে নামান। তা সে তো মেসের ঘরে। তা তেমন আর আজকাল বিশেষ হয় না।

আগে যখন পর্যন্ত দেবযানীকে স্বমতে আনতে পারব এমন একটু আশাও ছিল এবং তার জন্যে ব্যাকুলতাও ছিল তখন চিন্তায় চেতনায় একটু চাঞ্চল্য দেখা দিত। ক্রমশ সে ছেলেমানুষিও অন্তর্হিত। এখন মহিমদের গ্রামের ভাষায় মহিম পৈতে পুঁড়িয়ে ভগবান হয়ে গেছে। কাজেই গোপীচন্দনপুর থেকে ফেরার সময়ও আর তাঁর চিত্তভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

এই সামান্য ক্ষণটুকুর ট্রেন জার্নির মধ্যে হয়তো পকেট থেকে ভাইপো-ভাইঝিদের দেওয়া 'অর্ডারের' লিস্টটি খুলে দেখতে বসেন, আর পাশে পাশে সেসব জিনিসের আনুমানিক দামও বসিয়ে ফেলেন।

কখনো কখনো সুরবালারও কলকাতা থেকে কিছু সওদা করে আনার 'বরাত' থাকে। হয়তো বা দেবযানীরও।

নিজের জন্য অবশ্য কখনো কিছু বলে না দেবযানী। তাও যা কিছু দরকার নেহাৎই সংসারের। দেবযানীর অর্ডারের তালিকা দেখলে লোকে হাসবে। যেমন

ভালো কিসমিস, ভালো পাপর, জৈত্রি, জাফরান, জায়ফল। কিম্বা উচ্চমানের গরম-মশলা। যা নাকি গোপীচন্দনপুরের দোকানে দুর্লভ।

স্বদেশরঞ্জন বড়বৌদির হাতের পোলাও-এর ভারি ভক্ত। বলে, হ্যাঁ, একেই বলে পোলাও। জম্পেস জিনিস! এখন এ জিনিস উঠে গেছে। ঘরে-বাইরে, হোটেলে, নেমন্তন্ন বাড়িতে 'সারসত্য' হচ্ছে 'ফ্রায়েড রাইস!'

ননদাইয়ের জন্যেই এসব উপকরণ মজুত রাখে দেবযানী।

এবারে কারুর কোন অর্ডার নেই। না ছোটদের না বড়দের। এবারের পরিস্থিতি একদম ভিন্ন। সকলেই যেন কেমন থমথমে, আর অপরাধী অপরাধী। মহিমও তাই কেমন অপ্রতিভ আর বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। মনে হচ্ছে বাড়িতে যেন কোন একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও কী সেটা ঠিক অনুমান করতে পারছেন না।

অথচ এবারেই যেন আসার সময় ছিল ছেলেমানুষের মত একটু পুলক-চাঞ্চল্য। যেন কী একটা ভালো জিনিস মজুত রয়েছে তাঁর জন্যে।...হয়তো—হয়তো বা সে জিনিসটা সেই চিরপুরনো আশাটাই। যেটা আস্তে আস্তে একসময় মরে গিয়েছিল এবং মহিম তাকে কবরিত করে ফেলে একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

এতদিন পরে আবার বুঝি কবর থেকে মাথা তুলে উঠে আসছিল সেই মরে যাওয়া বস্তুটা। আবারও মনে হচ্ছিল, এই সংসারগণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়া দেবযানী নামের মেয়েটা বুঝি তার ঘানি ঘোরানোর অভ্যস্ত ছন্দ থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন সত্তায় ঝলসে উঠবে। ঝলসে বেড়ায় তো সে সারাক্ষণই। নিজেকে বিকশিত করার এ একটা মোহ।

কিন্তু ওই ঝলসানির উপলক্ষ্যগুলো কী তুচ্ছাতিতুচ্ছ। দেখে দুঃখ আসে মহিমের। মনে হয় যেন বিরাট একটা অপচয়ের দৃশ্য দেখে চলতে হচ্ছে তাঁকে!

আশা হচ্ছিল, এই গণ্ডির বাইরে গিয়ে হয়তো দেবযানীকে আর ঝলসে বেড়াবার জন্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোন উপলক্ষ খুঁজতে হবে না। আর ভেতর থেকে বুঝি একটা নতুন সত্তার জন্ম নেবে, আর এতোদিন পরে নিজেকে আবিষ্কার করে তার গায়ে এঁটে বসে থাকা মিথ্যার খোলসটাকে খুলে ফেলে আলোর মুখোমুখি দাঁড়াতে শিখবে। বুঝতে শিখবে দশের ইচ্ছে বোঝাই করা নৌকোখানাই আসল দেবযানী নয়। অনুভব করতে পারবে রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসনখানা হেলায় ত্যাগ করে এতদিন শুধু কাঙালের ভূমিকায় কাটিয়ে এসেছে সে অদ্ভুত একটা বোকামির বশে।

কিসের এই কাঙালপনা?

পাঁচের মুখের প্রশংসা।

গোপীচন্দনপুরের সেই চিরপরিচিত মুখগুলো মনে পড়ে যায় মহিমের। আর তখনি মনে হয় ওই মুখগুলোর আওতা থেকে একবার বেরিয়ে আসতে পারলেই দেবযানী নিজেই দেখে অবাক হয়ে যাবে কী তুচ্ছের বিনিময়ে সে জীবনটাকে বিকিয়ে দিয়ে চলেছে।

দেবযানীর সেই চৈতন্য উদয়ের আশায় একটি অনাস্বাদিত সুখস্বাদের দিনের আশায় দিন গুণছিলেন মহিম, আর সেই খুশী খুশী মনটা নিয়েই এবার এসেছিলেন। কিন্তু আসার কিছুক্ষণ পরেই মহিমকে হা-হা করে হাসতে হয়েছে। হাসতে হয়েছে রাত্রেও। সেই হাসিটা হয়তো শুধু দেবযানীর সেই চিরকাঙালপনা দৃষ্টান্ত দেখেই নয়, হয়তো নিজের মূঢ়তার প্রতি কৌতুকে!

পরবর্তী পরিস্থিতি হচ্ছে মহিমকে গুটি চার-পাচ অবুঝ মেয়েমানুষের ভারবাহী হয়ে তীর্থের পথে যাত্রা করতে হবে। ভাবনা হচ্ছে এদের মধ্যে একজন হয়তো বা একটু মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত।

অথচ এখন আর বলা যায় না আমার দ্বারা হবে না। সকলের ওপর সমান।

দুঃখ আসছিল প্রতাপের জন্যও। ধারণা ছিল তার দাম্পত্য জীবনটি বেশ সুখী ও সন্তোষপূর্ণ। হঠাৎ যেন কোথায় একটা খটকা লেগেছে।

তাই আজ মহিম হালদারের মুখে বিষণ্ণতার ছাপ।

তবু—এমন কথা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারছেন মহিম হালদার নামের বুদ্ধিমান মানুষটা, এখন এই মুহূর্তে তার সেই একটু আগে ছেড়ে চলে আসা বাড়িটায় কোন্ নাটকের অভিনয় হচ্ছে?

নাঃ, অনুমান করবার ক্ষমতা নেই মহিমের। অনুমান করতে পারবেন না। পাগলের ভান করার রোমাঞ্চকর সুবিধে আর মজার স্বাদ পেয়ে যাওয়া একটা মেয়ে অনায়াসে কী কটু-কুৎসিত ভাষা বলে চলতে পারে।

হ্যাঁ, ভারি মজা পেয়ে গেছে ললিতা।

এই মজার পাখনায় ভর করে সে যথেচ্ছ উড়ছে। অনায়াসে পাড়া ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, দয়া! মহত্ত্ব দেখানো। লোকের কাছে ধন্যি ধন্যি! বুঝি না কিছু আমি? সবটা গ্রাস করে রেখেও মন উঠছে না। আরো চাই। তাই এই ললিতা হতচ্ছাড়ীকে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দিয়ে শূন্য বাড়িতে ইচ্ছে মতন রাসলীলার সুবিধে হবে।… ও কি, উঠে যাচ্ছ কেন গো বড়গিন্নী, শোন সবটা। শুনে যাও! বুঝে যাও চিরকাল শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। সব চালাকি ধরে ফেলেছি।…আমার টিকিটে ললিতা

বেড়াতে যাক। আহা! কি উদারতা! সব ষড়যন্ত্র। পেয়ারের ন্যাওর-ভাজে তলে তলে ষড়যন্ত্র। আহা মরি মরি, আবার কান চাপা দিয়ে ছুটে পালানো হচ্ছে। কতো ঢং। চিরকাল সবাইকে বোকা বানিয়ে এসেছ বড়গিন্নী, এবার সব ফাঁস করে দিচ্ছি, রোসো!

উন্মাদিনীর ভান করতে করতে কোন ক্লেদাক্ত অবচেতন থেকে বেরিয়ে আসে ক্লেদাক্ত সব ভাষা।

বলি, হ্যাজব্যাণ্ড কি আর শুধু শুধু চিরটাকাল মেসে পড়ে থাকে গো? মনের ঘেন্নায় থাকে। ঘরের কেলেঙ্কারী প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে বলে, 'দেশ-গাঁ' আমার ভাল্লাগে না। এ সংসারে ওই একটা মানুষই ভদ্দর, তাই কেলেঙ্কারী আরো গড়াবার আগে ভাইকে বলতে এসেছিল, 'তুই যা! আমি থাকি। ···ভাই তাই শুনবে যে? ছোটলোক, ইতর, নষ্ট চরিত্তির! সে যাবে দাদার অনুরোধ রাখতে? হি-হি-হি! এতো বোকা নাকি? সাধের ষড়যন্ত্র ভেস্তে যাবে না?

বেপরোয়া বেহেড হওয়ারও একটা নেশা আছে। আর যতই সেটার মজাটা উপ-ভোগ করা যায়, ততই বেড়ে যায়। বাড়তে বাড়তে কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তার ঠিক নেই। চিরদিনের সম্প্রীতি নিয়ে একত্রে বাস করা ভাড়াটে-বাড়িওয়ালার মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব বাধে, তার নীচতা আর নোংরামি অবিশ্বাস্য। জ্ঞাতির সঙ্গে যখন মামলা বাধে? নীচতা আর নোংরামির নেশায় পেয়ে যায়। এ দৃশ্য তো অহরহই।

ললিতা নামের মেয়েটা তার চিরদিনের পুষে রাখা আক্রোশটাকে হঠাৎ একদিন বার করে ছড়িয়ে ফেলার পরই বেপরোয়া হতে পারার সুখস্বাদ পেয়ে গিয়ে সে সুখ বাড়তে বাড়াতে চরমে তুলেছে, খেয়াল করছে না তার নিজের ছেলে-মেয়েরা রয়েছে ধারে-পাশে।

না, এমন অদ্ভুত নাটকের কথা মহিম ভাবতেও পারছেন না, তাই তিনি শুধু একটু বিষণ্ণ হচ্ছেন। তিনি দেখতে পারছেন না, তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছোটভাই প্রতাপকে তার ওই জন্মরুগ্ন বৌটা হঠাৎ কী জব্দ করে ফেলেছে। দেখতে পাচ্ছেন না, প্রতাপ যখন তেড়ে এসে বৌকে বলেছে, তুমি থামবে?

তখন বৌ চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল, 'ওগো মাগো! মেরে ফেলল গো। ন্যাওর-ভাজে মিলে আমায় শেষ করলো গো! ওই সর্বনাশী আমার স্বামী-পুত্তুর সব আমার 'নয়' করে দিয়ে নিজের করে ফেলেছে গো। এবার আমায় জানে মেরে দেবার তালে আছে।

এরপরও কি আর খুদুর মার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায়?

পাড়া-পড়শী সামনে এসে সকলেই একবাক্যে একথায় সায় দিয়ে যায় বটে, তবে

আড়ালে গিয়ে একটু জটিল-কুটিল হাসি হাসবে না এ তো আর হয় না।

আহা, কথাটা তো ঠিকই। ওর ছেলেমেয়েরা সব ক'টাই তো জ্যেঠির অনুগত। জ্যেঠি-অন্ত প্রাণ। মা বলে পোছেই না। আর স্বামী? তাই-বা নয় কেন? উঠতে-বসতে হা বৌদি হো বৌদি। বৌদি নইলে চোখে অন্ধকার। সংসার-সুখের সবটাই তো বড়গিন্নীর ভাগে। তার নির্দেশে সব। ওই ছোট বো বেচারী যেন কেউ নয়। জীবনে সংসার করতে পেল না। ভেতরে কী রহস্য কে জানে। হঠাৎই গ্রামশুদ্ধ সকলের সহানুভূতির ঢল নামে ছোট বৌয়ের ওপর।

অথচ এঁরাই এযাবৎ হালদারবাড়ির বড়গিন্নীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা, অসীম কর্তব্য-পরায়ণতা, আর সর্বকর্মে অনায়াস-পটুত্ব দেখে দেখে ধন্যি ধন্যি করে এসেছেন, তাদের চোখের সামনে থেকে ভুল ধারণার পর্দা সরে গিয়ে 'সত্যের আলোক' ফুটে উঠছে।

অর্থাৎ হালদারবাড়ির বড়গিন্নাব আজীবন সাধনায় গড়া 'গৌরব-সৌধ'টি হুড়-মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ল। পাড়ার প্রধান প্রসঙ্গ এখন হালদার বাড়ির বড়গিন্নী। চিরকাল তো আর লোকে চোখে ঠুলি এঁটে বসে থাকে না।

মহিম আসামাত্রই সতীশ ঘোষ বলে উঠলেন, আচ্ছা এব মজা হয়েছে মশাই। যেদিনটি আপনি বাসায় থাকবেন না, বুঝে বুঝে সেই দিনটিই আপনার বোনাই এসে আপনার খোঁজ করবেন।

মহিম অবশ্য এ খবরে বিশেষ বিচলিত হলেন না। স্বদেশরঞ্জন যা বলতে এসে-ছিল, তা তিনি তন্টুর কাছে শুনে এসেছেন। স্বদেশ যেতে পারবে না। মহিমের বিষণ্ণতার এও একটা কাবণ। ওই অত্যন্ত বুদ্ধিমান আর জলি ছেলেটা পবিবেশকে উজ্জ্বল করে রাখতে পারে।

মহিম তো এখন নীচের তলার একটা ঘরে থাকেন। তাই সেখানেই বিছানার ধারের চেয়ারটায় বসে পড়ে অলস গলায় বললেন, কী বলল?

বলেননি কিছু। লিখে রেখে গেছেন। ওই যে আপনার টেবিলে বইচাপা দিয়ে।

আচ্ছা দেখছি।

হাই তুললেন একটা। এটা সতাশ ঘোষকে বিদায় নেওয়াবার ইঙ্গিত। কিন্তু ঘোষের পো ইঙ্গিত বুঝল না। একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আপনার মেয়ে-জামাইয়ের কথা উনি জানেন না, নাকি বলুন তো? আপনার পুরনো ঘরটাকে সেপারেট ফ্ল্যাট মত করে মেয়ে-জামাইকে থাকতে দিয়েছেন শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

মহিম পাঞ্জাবীর বোতাম খুলতে খুলতে তেমনি অলসভাবে বললেন, খুবই

স্বাভাবিক। মেয়ে-জামাইও আকাশ থেকে পড়া কিনা। কুড়িয়ে পেয়ে ঘরে আনা।

ঝুনো সতীশ ঘোষ এইরকমই অনুমান করে রেখেছেন। আসলে উদারমন লোকটার মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে ছোঁড়া-ছুঁড়ি দুটো। তবু অবোধের ভঙ্গীতে বলেন, তার মানে? পাতানো সম্পর্ক না কি?

এতদিন আপনার সন্দেহ ছিল নাকি তাতে?

সতীশ ঘোষ অপ্রতিভ হয়ে বলেন, না মানে ভেবেছিলাম, কোনদিন মেয়ে শুনলাম না, একেবারে মেয়ে-জামাই! তো অবাক হবার কী আছে? ব্যাচিলার তো নয়। ছিল হয়তো দেশে-ঘরে। অবাক হচ্ছি বরং এখন। পাতানো সম্পর্ক তার জন্যে এতো খরচাপাতি, এতে ইয়ে—

পাতানো সম্পর্ক! মহিম হেসে উঠে বলেন, পাতানো সম্পর্ক কি ফ্যালনা নাকি মশাই? দুনিয়ার সব থেকে নিকট সম্পর্কই তো পাতানো সম্পর্ক।

সবথেকে—নি-কট!

কী ব্যাপার! মাথায় ঢুকছে না? আরে মশাই 'স্বামী-স্ত্রী' সম্পর্কটি কী? সব থেকে নিকট কিনা? আর সে সম্পর্কটি নেহাৎই পাতানো সম্পর্ক কিনা?

হেসে ফেলেন সতীশ ঘোষ।

আপনি মশাই এমন মজাদার কথা বলেন। সত্যি বটে, এটা তো কোনদিন মনে পড়েনি। আচ্ছা চলি।

মহিম বললেন, ওরা কি রান্না-টান্না করছে নাকি? না আপনার 'নবতারা'র কিচেন থেকে সংগ্রহ করছে?

'নবতারার কিচেন?' না না। দু'জনে মিলে হৈ-হৈ করে বাজার করে আনা! দু'জনে মিলে হুল্লোড় করে রান্না। ছাতে রান্নাঘর তো, হাসিটাসি সবই শোনা যায়। দু'জনেই খুব জলি।

দু'জনেই খুব জলি!

মহিমের চোখের সামনে ভেসে উঠল দুখানি হতাশ-বিষণ্ণ দুঃখী মুখ। ফুটে উঠল দু'খানি কৃতজ্ঞতায় বিগলিত-প্রায় অশ্রুভারাবনত মুখ।.....এদের সঙ্গে জলি শব্দটা খাপ খাওয়ানো যায়?

মহিমের বিষণ্ণ মনটা একবার খুশীতে ভরে উঠে আবার বিষণ্ণতায় ডুবে গেল।

মানুষের নিজের হাতের মুঠোয় অগাধ ঐশ্বর্য, তবু সে দীন-দরিদ্রের ভূমিকায় ঘুরে বেড়ায়।

বাসায় আছে না কি?

না না। এইতো সন্ধ্যে হতেই যে যার কাজ সেরে ফিরে এখন মিস্টার নিজের ট্যাক্সি চেপে বেরোলেন।

তাই বুঝি?

তাই তো। কাল-পরশু দু'দিনও তাই। অচ্ছা হালদার মশাই, কিছু মনে না করেন তো শুধোই, এই যে ট্যাক্সি চেপে বেড়াতে যাওয়া, এতে কার লাভ কার লোকসান?

এবার অবাক হবার পালা মহিমের।

কার লাভ কার লোকসান মানে? লাভ তো দু'জনারই। এর মধ্যে আবার লোকসান আসছে কোথ থেকে?

সতীশ ততোধিক অবোধ।

মানে ট্যাক্সি তো আর ওনার নিজের নয়। মালিকের। নিয়মমাফিক ডেলি টাকা মিটিয়ে দিতে হয়। অথচ এরা নিজেরা চাপছেন।

মহিম বলেন, আমি ওসব বুঝি না ঘোষমশাই। তবে মনে হচ্ছে—যেভাবেই যা হোক, লোকসান কোনদিক থেকেই নেই।

নাঃ। লোকসান কোন দিক থেকেই নেই। আর্থিক লোকসান যদি কিছু ঘটে, সেটা পুষিয়ে যাবে একটি পারমার্থিক প্রাপ্তিতে।

ভাবলেন মহিম

মহিমের মিঠুর বাড়িটার কথা মনে পড়ল। সুখ আহরণের জন্য একটা ক্ষমতা থাকা চাই আবার সুখ-উপভোগেরও থাকা চাই কিছু ক্ষমতা

হঠাৎ কী হলো।

নীরুর কথা মনে পড়ে গেল।

তুলোর বালিশের মত হয়ে গেছে নীরু? তা হোক। ওটা তো বহিরঙ্গ।

অবাক হয়ে যাওয়া নীরু বলে উঠল, কী ভাগ্যি আমার মহিমদা! তুমি! তা এতো রাত্তিরে—

ভয় পাসনে বাবা! খেতে শুতে চাইব না।

আহা, আমি যেন তাই বলেছি। চাও না দেখো, ভয় পাই কিনা। বল কত খাবে, আর কী খাবে?

ওটা ভবিষ্যতের জন্যে থাক।

তা ব্যাপারটি কী মশাই? হঠাৎ—

ব্যাপার আবার কী? আসতে নেই?

নীলুর গালের গড়ন ডাবরের মত হয়ে গেছে। তবু নীরুর চোখ আজও নাচটা ভুলে যায়নি।

নীরু সেই না-ভুলে-যাওয়া বিদ্যেটা প্রয়োগ করে বলে উঠল, আছে বুঝি? তার প্রমাণ তো পাইনি কখনো। এই কাছাকাছি পাড়াতেই তো থাকলে চিরকাল। তুমি একটা অদ্ভুত।

যাক, তুই আমার সঠিক নামকরণ করে ফেলেছিস। আমার দিকে কোন সাফাই নেই।

তুমি একদিন মিঠুর বাসায় গিয়েছিলে। কী খুশী যে সে। কত গল্প করলো। কাজিল মেয়েটা আবার বলে কিনা, ও মা, তোমার জামাই তার মামাশ্বশুরের প্রেমে পড়ে গেছে।

মহিম হেসে ওঠেন, কাজিল বটে। তা বলতে গেলে শ্বশুরও। খাসা ছেলে।

নীরু একটু গম্ভীর গলায় বলে, আমি কিন্তু আশা করেছিলাম, ওদের দেখে তোমার হয়তো নীরুকে মনে পড়ে যাবে।

মহিম কৌতুকের গলায় বলেন, বিশ্বাস কর, মনে পড়েছিল। দারুণভাবে মনে পড়েছিল। কিন্তু তোর ফটো দেখে ভাবনা ধরে গেল।

ফটো দেখে ভাবনা ধরে গেল মানে?

মানে, ভয় হলো এই তুলোর বস্তাটির মধ্যে থেকে কি আর সেই বেতের ডগা-টিকে খুঁজে পাওয়া যাবে?

তুলোর বস্তা!

নীরু হেসে গড়িয়ে পড়ে।

ওঃ মহিমদা! তুমি একদম একরকম আছো। ভেতরে ও বাইরেও। তা তোমার মত কে আর চেহারাটি চিরতরুণ রাখবার জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন করতে চিরকাল মেসের ভাত খেয়ে কাটিয়ে দেবে? আমার মতে, খাবার জন্যেই তো জগৎ-সংসারের এতো কাণ্ড-কারখানা। তো জুটলে খাবো না? না খেয়ে মরার থেকে খেয়ে মুটোনো অনেক আনন্দের। মুটিয়ে গেলাম তো বয়েই গেল। নতুন করে তো আর কেউ আমার প্রেমে পড়তে আসছে না?

মহিম ওর হাসি ছড়ানো, অথবা হাসিতে কোঁচকানো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বলে ওঠেন, কাজিল একা মিঠুই নয়। তা নতুন করে কেউ না আসুক, চির পুরাতনটি গেলেন কোথায়?

সেটি।

হি হি করে হেসে ওঠে নীরু। সেটি বাড়িতে থাকলে কি আর তার গিন্নীর কাছাকাছি হঠাৎ পুরুষ-কণ্ঠ শুনতে পেলে ঘরে বসে থাকতো নিশ্চিন্ত হয়ে? ছুটে এসে হাজির হতো না? বাড়ি নেই। সে আজ তার ভাইঝির শ্বশুরবাড়ি গেছে।

ভাইঝির শ্বশুরবাড়িতে? কোথায়?

বেশিদরে নয়। বারাসতে। কালই ফিরবে। এদের বাড়িতে যে আবার নিজের মেয়ে আর ভাইয়ের মেয়ের কিছু তফাৎ করা চলে না।

ভালোই তো। তা আজ উঠি।

বাঃ। চমৎকার। একটু চাও খাবে না?

আচ্ছা শুধু এককাপ চা! ব্যাস্!

কেন, একটু টা যোগ করলেই সিগার নষ্ট হয়ে যাবে? ঠিক আছে। ছোট বৌ, এই ছোট বৌ, এককাপ চা নিয়ে আয়। চটজলদি।

'ছোট বৌ' নামের মেয়েটি এককাপ চা এবং তার সঙ্গে কিছু কুচো নিমকি নিয়ে এসে ধরে দিয়ে প্রণাম করে।

মহিম বলে ওঠেন, বাঃ, এক্ষুনি হয়ে গেল?

বৌটি লজ্জায় জড়োসড়ো নয়। হেসে ফেলে বলে, না হলে রক্ষে আছে? একটু দেরি হলেই তো দিদির কাছে ফাঁসির হুকুম। গরম জল মজুতই রাখতে হয়।

বটে রে। আমার দাদার কাছে আমার নিন্দে? খুব সাহস দেখছি যে। আচ্ছা হচ্ছে তোমার।

মেয়েটা হাসতে হাসতে চলে যায়।

মহিম হঠাৎ যেন কেমন অভিভূত হয়ে যান।

এমন একটা হালকা হাওয়ার বাড়িতে মহিম কেনই যে আসেন নি কখনো! খারাপ হয়ে যাওয়া মন ভাল হয়ে যায় এমন হাওয়ায়।

তার মানে সকলেই আমরা সুখের সঞ্চয় ভরা হাতের মুঠোটাকে না খুলে সুখ-টাকে পিষে চেপে রেখে, সুখ সুখ করে খুঁজে বেড়াই।

চলে আসার সময় নীরু বলল, তুমি এসেছিলে শুনে ও খুব রেগে যাবে। বলবে 'শালা, আর আসবার দিন পেল না।'

বিষণ্ণ ভারা মনটা 'ভাল' হয়ে গেল যেন।

ভাবেন সত্যি, মানিকতলা থেকে আমহার্স্ট স্ট্রীট কতটুকুই বা! অথচ সাতজন্মে আসা হয় না।

বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু কে জানতো নীরুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাণিকতলার মোড়ের কাছে, মহিম এমন একখানা নাটকীয় দৃশ্যের মুখোমুখি হবেন।

বাসের জন্যে অপেক্ষা করছেন, হঠাৎই দৃশ্যটি চোখে পড়ল। ওপারের ভাঙ্গা-চোরা ফুটপাতে একটা দোতলা বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে দুটো নরনারী পাশাপাশি বসে।

না, রাস্তায় দুটো নরনারীকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখা, নাটকীয় দৃশ্যের পর্যায়ে পড়ে না। দৃশ্যটির বিশেষত্ব এই, দুজনের সামনে বিছোনো রয়েছে একখানা ময়লামতো খবরের কাগজ, আর তার থেকে দু'জনে একই সঙ্গে থাবা থাবা কী তুলে নিয়ে খাচ্ছে। মুড়িও হতে পারে, ভাত হওয়াও আশ্চর্য নয়। কাগজের পাশের দিকে একটা মাটির ভাঁড, খুব সম্ভব জলের গেলাসের কাজ করছে।

এতটি নিখুঁত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, রাস্তার আলোটা একেবারে তাদের সামনা-সামনি বলে।

মহিম কী ওদের দিকে এগিয়ে যাবেন?

মহিম কি চেঁচিয়ে ডাকবেন? রাস্তা তো বেশি কিছু চওড়া নয়, ডাকলে শুনতে পাবে বোধহয়।

নাঃ, এগোবার আর দরকার নেই। দুটো প্রাণীর মধ্যে একজনই পরিচিত, অন্যজন তো একদম অচেনা।

দূর, কেনই বা ডাকব।

ভাবলেন মহিম। দেখতেই তো পাওয়া যাচ্ছে ব্যাপারটি।

তবু আশ্চর্য, মহিমের দৃষ্টিটা ওদের দিকে নিবদ্ধই রয়ে গেল। চোখের সামনে দিয়ে তাঁর প্রার্থিত নম্বরের বাসটি এলো, ক্ষণকাল দাঁড়াল, এবং পেটের থেকে কিছু উগরে দিয়ে আর কিছু আবার পেটে ভরে নিয়ে বেরিয়েও গেল। সচকিত হলেন তখন, যখন বেরিয়ে গেল।

আর তখনই দেখা গেল ওই নরনারীযুগল সামনের পাতা কাগজখানা (বস্তুগুলো বোধহয় নিঃশেষ করে) দলামোচড়া করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহনিয়ে রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে আসছে।

বড়বাবু, আপনি! ওরে আজ আমার কী ভাগ্যি। এই ক্ষেপু, শীগ্‌গির সাষ্টাঙ্গ হ'। এই আমাদের সেই বড়বাবু। আমার বড়মার স্বামী!

শেষ ভাষ্যটি শুনে মহিমের ভিতরে একটা হাসির গ্যাস-বেলুন ফেঁপে উঠতে চাইল। ব্যাটার বাচনভঙ্গীটি তো আচ্ছা। ইনট্রোডিউস করে দেবার ভাষা বটে

একখান.।

মহিম বললেন, থাক থাক!

কিন্তু থাক বললেই হলো? দীনু কুমোরের পো বীরবিক্রমে বলে উঠল, থাক মানে? আপনার চরণধূলি আর পাচ্ছে কবে? গতোজন্মের পুণ্যফলে এমন আচমকা ছাখা!

অতএব 'থাক থাক'কে নস্যাৎ করে দিয়ে আজ্ঞাপালন।

সাষ্টাঙ্গ শেষে উঠে দাঁড়াতেই সাষ্টাঙ্গকারিণীর দিকে তাকিয়ে মহিম হালদার নামের ব্যক্তিটি প্রায় হতবাক হয়ে গেলেন। এই নিধিটিকে পেলো কোথায় মোনা? তবে 'পেয়েছে' যে তা ওর মুখ দেখেই মালুম হচ্ছে।

মহিম হালদারের অতি শৈশবে দেখা একটি 'মজার ছবির বই' এর একখানি ছবির চেহারা চোখের সামনে ফুটে উঠল। যে ছবির নীচের ক্যাপ্‌শান ছিল— 'ন্যাওড়াগাছের আসনদেবী খোনা খোনা রা। সুমুখদিকে গুড়মুড়ো তার পিছন দিকে পা!'

ভয়ে ভয়ে আর ওর পায়ের দিকে তাকালেন না মহিম। তাকিয়ে রইলেন তার একসারি মূলোর মত দন্তপংক্তির দিকে। কুচকুচে কালো মুখে উদ্ধত এই শ্বেতশুভ্র দাঁতের সারি যেন চোখকে বিদ্ধ করার মতই শুভ্র।

মহিম অতঃপর মোনার সাষ্টাঙ্গ থেকে আত্মরক্ষা করে মৃদু হেসে বললেন, তা কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলি, পেয়ে গেছিস তাহলে?

মোনা লজ্জা লজ্জা মুখে একগাল হেসে বলে, তো বড়বাবু আপনার আশীর্বাদে। কেঁদুলের মেলায় গেছি, সেখেনেই মিলে গেল। তো গোড়ায় নিযাস লাগছিল না, কোতায় যেন একটা ধন্দ। তো গুরু বলল, ছাক একেবারে নিজোস্বো ভাবভাবনা মতোন কি ষোলোআনা পাওয়া যায়? ও বস্তু ভগবানের থেকেও দুর্লভ। বারো আনা চোদ্দ আনা জুটলেই মেনে নিতি হয়। বাকি দুআনা চার আনার ঘাটতিতে কি জেবনটা বরবাদ দিবি? ও তোর নতুন কাপড়টা বাসনটাও প্রেথম প্রেথম খটোমটো। ঘষা খেতে খেতে মোলায়েম! তো এখন দেখতেচি গুরুর বাকিই খাঁটি বাকি।

মহিম হেসে ফেলে বলেন, বুঝে গেছিস তাহলে?

মোনা ঘাড় চুলকে বলে, আজ্ঞে, তা বুজচি। তো তদবদিই ভাবতেচি একবার বড়োমায়ের কাচে ছুটে যাই যুগলে। তাঁর চরণে প্রণিপাত করে আসি। তো বলব কি মেয়েছেলের মরণ, বলে কি না এই 'ট্যানা' পরে আমি শোউরবাড়ির দেশে যাব? আগে একখানা আস্ত কাপড় কিনে দে। প্রাণে শক বিস্তর। বলে, 'শোউর ঘরটাও

দেকে আসবো।'

মহিম তাকিয়ে দেখলেন।

যদিও তাকানো শক্ত। এতো কালো রং হয়?

তবে হ্যাঁ, টানিই বটে।

ওই মেয়েটার পরণের শাড়িখানার একদা হয়তো কিছু রং ছিল, আপাতত স্রেফ গঙ্গামাটির রং। তবে মনে হচ্ছে বোধহয় ডুরেও ছিল ওর গায়ে।

জামা একটা আছে বটে গায়ে, তা সেও প্রায় জালিকাটা।

চুলে জীবনে তেল পড়েছে বলে মনে হয় না।

শাড়িটা কোমর জড়িয়ে আঁটো করে পরা বাবদ হাঁটুর ওপর উঠে পড়েছে। কাজেই তার নীচের পা দুটো অনেকখানি উন্মুক্ত। এবং তাই ধুলোর আস্তরণ দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরিচয় বহনকারী।

মহিম বললেন, বেশ বেশ! তা তোর তো প্রায় ভগবান পাওয়া হলো আর এর?

এর?

মোনার মুখে হঠাৎ নবোঢ়ার লজ্জা।

এর কতা একেই শুদোন।

থাক থাক, আর শুদোতে হবে না। বুঝেছি। আচ্ছা।

পকেটে হাত ঢোকালেন, বললেন, আমাদের গ্রামের বৌ, আমার তো একটু আশীর্বাদ করা দরকার। এখন যা সামান্য সঙ্গে আছে। এরপর তো তোর বড়মা'র কাছেই যাচ্ছিস।

খান পাঁচছয় দশ টাকার নোট বার করে বললেন, এই নাও গো বাছা! ধরো।

যাকে বললেন, সে অবিশ্যি হাত বাড়াল না, 'ধেৎ' বলে ইঞ্চিচারেক জিভ বার করে মোনার পিছনে মুখটা লুকোল।

মোনা হতভম্ব হয়ে বলল, এতো কী হবে বড়বাবু?

এতো কী রে? ছাখ এতে একখানা লাল ডুরে শাড়িই হয় কিনা। পকেটে যা সামান্য ছিল। জানতাম না তো হঠাৎ তোর কনেবৌকে মুখ দেখতে হবে। তা তোর বড়মার কাছে পাবি সোনাদানা কিছু। তোর যে একটা হিল্লে হলো, এতেই—

হঠাৎ মোনার পিঠের আড়াল থেকে একটি প্রায় পিলে চমকে দেওয়া খোনা খোনা রা-ই বেরিয়ে আসে, ওর আবার কী! হিল্লেটা তো এই ক্ষেপীরই হলো।

অ্যাঁ। তাই বুঝি।

পথের মাঝখানেই হা হা করে হেসে উঠলেন মহিম।

ওরা আবার নাছোড় হয়ে যুগলে সাষ্টাঙ্গ হলো।

নেহাৎ না কি রাত হয়ে গেছে, পথ ততটা জনারণ্য নয়, তাই বাঁচোয়া।

কিন্তু মহিমের জন্যে যে আরো 'নাটক প্রস্তুত হচ্ছিল, তা কী স্বপ্নেও ভেবেছেন মহিম? মহিম সারারাত স্বপ্নে জাগরণে ভেবে চলেছিলেন তাঁর পরবর্তী কর্মপন্থা। দেবযানীর বদলে প্রতাপের স্ত্রী। তীর্থভ্রমণে কে কীভাবে দিদিকে ম্যানেজ করবে। দেবযানী আছে মানেই একখানি পরম নিশ্চিন্ততা আছে। যেদিকে দেবযানী সেদিকে যে আর তাকিয়ে দেখবার দরকার নেই, এটা মহিমের বিবাহিত আজীবনই জানা হয়ে গেছে।

আবার মাঝে মাঝে আজকের মাণিকতলার মোড়ের সেই অভিজ্ঞতাটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ওই উদ্ধত বিশাল আর অতি শুভ্র দাতের পাটিটি একবার দেখলে ভুলে যাওয়া শক্ত। ব্যাটা মোনা কুমোরকে বেশ ভালই একখানা কামড় বসিয়েছে।

কিন্তু গোপীচন্দনপুরের দীনুকুমোরের পো ব্যাটা মোনা কুমোর কি আমার গুরু হবে না কি, ব্যাটা এমন সব এক একখানা কথা বলে। গুরুবাক্য আউড়ে বলে কিনা, নিছক নিজ মনোমত নিজস্বো রমোণী একখানা পাওয়া ভগোমান পাওয়ার থেকে দুর্লভ। এ যে সেই চিরকেলে আক্ষেপের সুর— 'আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।'

ওইসব বাউল-টাউলদের কাছে ঘোরাঘুরি করে করে নিরক্ষর লোকগুলো বেশ ভালো ভালো কিছু কথা শিখে যায়। দামাদামী কথাই।

বলে কিনা গুরু বলেছে, 'ষোলোআনা মিলল না' বলে মান করে বসে থেকে জীবনটা বরবাদ দিবি তুই? বারো আনা চোদ্দ আনা যা পাস তাতেই সন্তোষ হতে হবে।

হঠাৎ খুব হাসিও পেয়ে গেল, মোনা হে, তোমার বড়মার পদপ্রান্তে পৌঁছে তুমি যুগলে সাষ্টাঙ্গ হতে যাবে, তখন তোমার বড়মা ভির্মি যাবেন না তো?

এই নাচের তলায় বসবাস শুরু করা পর্যন্ত ঘুমটা যেন কেমন পাতলা হয়ে গেছে। বড্ড শব্দ। আর কতরকম যে শব্দ। খুটখাট, টুকটাক, খসখস। পরদিনের জন্যে প্রস্তুতি। যেটা ধরা পড়ে গোপীচন্দনপুরের বাড়িতে।

আশ্চর্য। তুচ্ছ একটু আহার-আয়োজনে এতও লাগে।

কিন্তু পরদিন সকালে মহিম হালদারকে যে অন্য আর এক শব্দতাড়িত হয়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে হবে, তা কে ভেবেছিল।

নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আজকাল ঘটছেই মাঝে মাঝে। চিরনিয়মী মহিম হালদারের। দীর্ঘদিনের অভ্যস্থ আস্তানাটা ছেড়ে এসে কিছু কিঞ্চিৎ অসুবিধেও।

ভোরবেলা ব্যায়াম করা চির অভ্যাস, আগে আগে কেউ টেরই পেত না কতক্ষণ হালদার মশাইয়ের ঘর বন্ধ থাকে। দোতলায় একটেরে ঘর, সেদিকটা চলাচলের পথ নয়। এখানে ঘর খুললেই জনলোক। এবং এটাই একমাত্র পথ।

প্রায়ই ব্যায়ামরত হালদার মশাইয়ের কানে পৌছায়, হালদার মশাইয়ের দরজা যে দেখছি এখনো বন্ধ।

আজ আবার ঘুম-ভাঙতে একটু বেলাই হয়ে গেছে।

হঠাৎ দরজায় খটাখট টোকা।

খুব বিরক্ত গলায় সাড়া দিলেন মহিম, কে?

বটুর গলা পাওয়া গেল, বাবু আমি বটু। আপনার কে এসেছে, আপনাকে খুঁজছে।

আমার কে এসেছে? আমায় খুজছে!

ঘড়ির দিকে তাকালেন মহিম, রাগে হাড় জলে গেল। সকাল সাতটার সময় আবার কার মহিম হালদারকে খোঁজার দরকার পড়ল!

গায়ে বড় তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন দরজা খুলে, দেখলেন শশাঙ্কর সেই 'হীরো' মার্কা ছেলেটা। সম্প্রতি কিছুদিন আগে দেখেছেন এবং কথা বলেছেন তাই চিনতে পারলেন।

অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার?

ছেলেটা চটপট বলে উঠল, ব্যাপার পরে শুনবেন, তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনার এই ন্যারো গলিতে তো ট্যাক্সি ঢোকে না, বাইরে বড় রাস্তায় ট্যাক্সিতে আপনার ওয়াইফ একা গাড়িতে বসে আছেন!

মহিমের ইচ্ছে হল ছেলেটার ওই দুপাশের চুল ঝোলানো গালটায় ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেন। নেশা-টেশা করে এসেছে না কি হতভাগা এই সকালবেলা।

কড়া গলায় বলে ওঠেন, আমার ওয়াইফ!

ছেলেটা একটু সমঝে ঘাড় চুলকে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। ও-বাড়ির ইয়ে 'বড়বৌদি।' আমার সঙ্গে পাঁচটার বাসে চলে এসেছেন। আসুন, আমি এগোচ্ছি। আমায় বললেন, আমায় নিয়ে যেতে পারবি? শুধু পৌছে দিলেই তোর ছুটি। তা ভাড়া পেলে আর 'ঠিকানা' পেলে পারবো না কেন বলুন?

মহিমকে পথে দাঁড়ানো ট্যাক্সিটার কাছে আসতে দেখেই ঝপ করে গাড়ির পিছনে সরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। পেট ফুলে যাচ্ছিল তার। ওই মহিলাটির সামনে ধূমপানের সাহস হয়নি। কয়েক টান টেনেই পা চালিয়ে এগিয়ে গেল।

মহিম দেখতে পেলেন জানলার ধারে দেবযানীর ছাঁটাকাটা মুখটা ভাবশূন্য ধাতু-মূর্তির মত। সকালের রোদটা গালের একপাশে এসে পড়েছে।

মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়ে থেকে গাড়ির দরজাটা খুলে বলে উঠলেন, দেবী!

দেবযানী একটু হাসির মত গলায় বলল, অনেকবার ডেকেছ আসিনি। এবার নিজেই চলে এলাম। কোথায় তোমার সেই একখানা ঘরের সংসার, যেখানে আমায় প্রতিষ্ঠা করবে বলে চিরকাল তপস্যা করেছ বসে বসে, নিয়ে চল আমায় সেইখানে। পারলাম না। হেরে গেলাম।

মহিম গাড়িতে উঠে এসে বসলেন।

দেবযানীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে, মহিম একটু হেসে বলেন, হেরে গেলে, কি জিতে গেলে সে হিসেবটা পরে কষে দেখতে হবে। তবে এখন তোমার কথায় আমার কষে হাসতে ইচ্ছে করছে দেবী! ওই আকাশটাকে ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছে করছে।

হাসতে ইচ্ছে করছে!

বাঃ। করবে না? সারা জীবন ধূপধুনো জ্বালিয়ে বসে থেকে থেকে মন্দিরে দেবা প্রতিষ্ঠায় হতাশ হয়ে যেই সেটাকে বিলিয়ে দিলাম, তখন দেবী বর দিতে এলেন।

দেবযানী অবাক আর খাপছাড়া গলায় বলে, বিলিয়ে দিলে!

দিলাম দেবী। হঠাৎ যখন একদিন দেখলাম দু'দুটো জীবন শুধু একটুকরো ঘরের অভাবে ঘর বাঁধতে পাচ্ছে না, ছন্নছাড়া হয়ে বেড়াচ্ছে, তখন ভারী মায়া আর ধিক্কার এল। মনে হল, একজনের ফেলে দেওয়া জিনিসে যদি অপর একজনের জীবন রক্ষা হয় তো সেটা আগলে রেখে দেওয়া অপরাধের সামিল। দেখতে চাও তো দেখাতে পারি, কী একখানা সুখস্বর্গ রচনা করে ফেলেছে।

দেবযানী হতাশ গলায় বলে, তাহলে? আমার কী হবে?

মহিম ওর হাতের ওপর একটা হাত রেখে বলেন, তা'হলে আর কী? অবস্থাটা পালটে যাবে। তুমি এতদিন যে ঘর-সংসার নিয়ে চিরকাল আমায় সেধেছ, আমিই যাই সেখানে তোমার আশ্রিত প্রজা হয়ে থেকে যেতে।

দেবযানী প্রায় ঠিকরে উঠে বলে, আমি—আমি আর সেখানে ফিরবো না!

হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ভেঙে পড়ে বলে, তুমি জানো না, তুমি বুঝতে পারবে না সেখানে আমি কী অপমানিত-

মহিম আস্তে বললেন, হয়তো সবটা জানি না, তবু একটু জেনেছি দেবী, আর অনেকটা বুঝেছি। আর সেই জন্যেই বলছি সেইখানেই তো ফিরতে হবে তোমায়—

ট্যাক্সি ড্রাইভারটাও এতক্ষণ নেমে দাঁড়িয়েছিল। যখন লক্ষ্য করল মহিলার নামার নাম নেই, এসে বলল, আমায় মিটিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিন।

মহিম বিনয় বচনে বললেন, এক্ষুণি ছাড়া যাচ্ছে না ভাই, আপনাকে আর একটু কষ্ট দেব। আমায় হাওড়া ছাড়িয়ে আরো একটু যেতে হবে। আর ট্রেনে চাপাচাপির ঝামেলায় যেতে চাই না, প্লীজ একটু পৌঁছে দিন।

লোকটা গম্ভীর ভাবে বলে, ডবল ভাড়া লাগবে।

ঠিক আছে। যা লাগবার লাগবে। দরকারটা যখন আমারই। এবং জরুরি। এক কাজ করুন, আপনি বরং ততক্ষণ একটু চা খেয়ে আসুন। দেবী, তোমার কাছে অবশ্যই কিছু আছে। দিয়ে দাও ওকে। আমায় তো একবার আমার ভাঙাবাসায় ঢুকে বলে যেতে হবে। আর টাকাপত্তর কিছু নিয়ে যেতে হবে।

ড্রাইভার নোটটা নিয়ে এগিয়ে যায়।

দেবযানী রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, আমি আর কিছুতেই সেখানে ফিরবো না। ফিরতে পারবো না! তুমি ভাবতে পারবে না আমায় কী বলেছে। রেলের টিকিটগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, আমাকে আমাকে—না না সেখানে আর আমি মুখ দেখাতে যেতে পারবো না। আমার মাথা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে—

মহিম গাঢ় গভীর গলায় বলেন, তাহলে তো আরোই সেখানে যেতে হবে দেবী! হালদারবাড়ির বড়গিন্নী হালদারবাড়ি থেকে চিরতরে গায়ে ধুলো মেখে মাথা নীচু করে বেরিয়ে আসবে, আর ফিরবে না এটা আবার সম্ভব না কি, হালদারবাড়ির বড় কর্তার একটা মান-সম্ভ্রম নেই? আর তুমি তো ফিরে যাচ্ছ না, হালদারবাড়ির রিটায়ার্ড বড় কর্তা এবার দেশের মাটিতে ভিটে বাড়িতে গিয়ে চেপে বসে গিন্নীকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করতে যাচ্ছে।

তুমি জানো ওরা সবাই একটা পাগলের কথায় বিশ্বাস করে—

দেবযানী আবার দু-হাতে মুখ ঢাকে।

মহিম ঈষৎ হেসে বলেন, আবার দেখো এখনি যেই দেখবে গোপীচন্দনপুরের হালদারবাড়ির বড় গিন্নী তার কর্তার সঙ্গে গাড়ি থেকে মাথা উঁচু করে নামছে। তখনই শাঁখ বাজিয়ে ঘরে তুলবে। আহ্লাদের বান বইবে। তাছাড়া—

হাসলেন একটু।

বললেন, তাছাড়া তোমার সাধের পুত্তুর কুমোরের বেটা মোনা যে তার নতুন কনেকে নিয়ে তার বড়োমায়ের চরণে প্রণিপাত করতে হয়তো রওনা দিয়েছে।

মোনা!

হ্যাঁ গো বড়গিন্নী, সে তার 'নিজোস্বো রমোণী' খুঁজে পেয়েছে। পেতেই তো হবে। জেবনটা তো আর বরবাদ দিতে পারে না। জেবন এতো সস্তা না কি?

দেবযানী আস্তে বলে, আর যার জীবনটা বরবাদ হয়েই গেছে?

হলেই হলো! মহিম হেসে উঠে বলেন, চলো না, এবার দেখতেই পাবে মহিম হালদারের কতটি মহিমা। দেখতে পাবে কাকে বলে ঘর-সংসার করা। বরাবর তো একটি ঘর-সংসারের স্বপ্নই দেখে এসেছি দেবী। শুধু তার ছাঁচটা ছিল আলাদা। তা সে ছাঁচটা যখন কাজেই লাগানো গেল না, হেরে যাব না কি? নতুন ছাঁচ গড়তে কতক্ষণ?

॥ সমাপ্ত ॥